শপ-লিফটার

দিগন্ত রায়

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৭

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মুদ্রাকর

শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ

দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৯-এ বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

প্রণব শূর

যার আদর্শ ও প্রেরণা আমার মূলধন,
যিনি সতত আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
আমার সেই কল্যাণকামী
শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই
শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়কে

দু-একটি কথা

যে বিষয় নিয়ে কলম ধরেছি, যতদূর জানি বাংলা সাহিত্যে সেটি নতুন প্রসঙ্গ—ভার্জিন সয়েল। শপ-লিফটার অর্থাৎ বিপণন কেন্দ্র থেকে জিনিস চুরি করতে গিয়ে যাঁরা ধরা পড়েন, তাঁদের কাহিনী। যে বিষয়গুলো সাহিত্যক্ষেত্রের ছিটমহল বলে গণ্য, সেই একদা-অন্ত্যজ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে সম্প্রতি সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। গাঁই-গোত্র মিলিয়ে দেখলে, এটিও সেই শ্রেণীর।

শপ-লিফটারদের বিষয়ে সাধারণের আগ্রহ কম। তবু অপরাধ জগতে এঁরা সংখ্যালঘু নন। অনেকেই সমাজে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সঙ্গতি-সম্পন্ন। তবু কেন তাঁরা বিপণন কেন্দ্র থেকে জিনিস তুলতে গিয়ে ধরা পড়েন, সেটা রহস্যময়। এঁদের মধ্যে কিছু Kleptomaniac অথবা Schizopherenic অবশ্যই আছেন। আমার ধারণা, এঁরা ছাড়াও এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা বহু জিনিসের সম্ভার চোখের সামনে দেখলে, তার মধ্য থেকে সকলের অগোচরে দু-একটি বেমালুম তুলে নিতে দ্বিধা করেন না। বিচিত্র পণ্যদ্রব্য সাজানো বিক্রয়কেন্দ্রকে তাঁদের মনে হয় একটি Tom Tiddler's Ground—যাকে বাংলায় 'সব পেয়েছির দেশ' না-বলে, বলা যায় 'সব নিয়েছির দেশ'। এমন একটি কল্পরাজ্য যেখানে কোনো জিনিস তুলে নিলেই সেটা আমার। আমার এই ধারণাটি কতোখানি বিজ্ঞানসম্মত, তার বিচার করবেন, সেই শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক, যিনি একই সঙ্গে সাহিত্যের মর্মজ্ঞ।

আমার এই লেখাটিকে রম্যরচনা বলাই ভালো। কিন্তু নিছক রসসৃষ্টি ছাড়া Criminolozyর একটি অজ্ঞাত দিকে, যতো আংশিকভাবেই হোক, একটু আলোকসম্পাতও আমার উদ্দেশ্য। জনসাধারণের দৃষ্টি বদলানোর প্রয়োজন আছে। অন্ততপক্ষে একজন শপ-লিফটার এবং একজন পকেটমার যে এক পালকের পাখি নয়, এ-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। তবে আমি দায়িত্বের প্রসঙ্গে একেবারেই যেতে চাই নে।

এর দায়ভাগ সমাজ, শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং আরো অনেক কিছু ছড়ানো। কিন্তু কোনো একটি জায়গায় দায়িত্বের ভার চাপাতে একটি লম্বা পথ ধরে অনেকখানি পিছনে চলে যেতে হবে। সেই 'কেনি রে ন'টে মুড়োলী'র মতো, যার নাম Infinite Recession.

আমার এ-রচনার স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী এবং ঘটনাবলী সবই কাল্পনিক। কারোর সঙ্গে কোথাও মিল দেখা দিলে, তা নিতান্তই আকস্মিক।

আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের সকলকে, যাঁরা আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে নানাভাবে সাহায্য এবং উৎসাহিত করেছেন বইটি প্রকাশের ব্যাপারে। সুলেখক পরীক্ষিৎ (রণজিৎ সেন)-এর সহযোগিতা না পেলে কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ায় আমার প্রবেশ সম্ভব হতো না। নিদারুণ বিদ্যুৎসংকটের মধ্যে বসুশ্রী প্রেসের পরিমল বসু, দিলীপ বসু এবং প্রেসের কর্মীগণের সহযোগিতা ভোলবার নয়।

পরিশেষে একটি কথা, সুদূর দিল্লী থেকে কলকাতায় বই প্রকাশের তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে। তবু তার মধ্যে মারাত্মক কয়েকটি ভুল ঠিক করে দিলাম। ২২ পাতার ৪র্থ লাইনে 'ট্রেটার'-এর জায়গায় "টারটার", ৩১ পাতার ২১তম লাইনে 'ইউ কুড ডু উইথ লিটল'-এর জায়গায় "ইউ কুড ডু উইথ এ", ৩৩ পাতার ৮ম লাইনে 'আই থ্রু'-এর জায়গায় "আই থ্রো", ১৩দশ লাইনে 'স্ট্রাক ডামবু ইট'-এর জায়গায় "স্ট্রাক ডামবু, এহ্!" এবং 'হোয়াই নট প্লে গ্যালেণ্ট'-এর জায়গায় "হোয়াই নট প্লে গ্যালানট্" পড়তে হবে। পরবর্তী সংস্করণে বাকিগুলো সংশোধন করতে সচেষ্ট থাকবো।

—লেখক

আমার পাঞ্জাবী বন্ধুরা অযাচিতভাবে আমাকে একটি উপাধি দিয়েছে,—'ভাড়ে কা টাট্টু'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ হেন টাট্টুর হাতেও মাঝে মাঝে যখন এক-আধ ঘণ্টা অখণ্ড অবসর এসে যায়, তখন ভাবতে হয়, সেটা কি অকাজে লাগালে সব চেয়ে বেশি ডিভিডেণ্ড মিলবে। এই যেমন এখন, সামনের দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁই-ছুঁই করছে। লাঞ্চ টাইমের এখনো অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের মতো দেরি, কাজও তেমন নেই। সকলকে বলে দিয়েছি, এমার্জেন্সি ছাড়া কেউ যেন আমাকে না-ডাকে। শিল্পকেন্দ্রে আমি আছি, কিন্তু ম্যানেজার হিসেবে নয়। আমার একটি বাংলা ডায়েরী আছে, সেটি অফিসঘরের ব্যক্তিগত ড্রয়ারেই থাকে। অনেকদিন তাতে কোনো এনট্রি হয় নি। ভাবছি আজ তারই দু-একটা শাদা পাতায় কলম ফোটাবো; আর সেই সঙ্গে পরখ হয়ে যাবে বাংলা ভাষাটা দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে একেবারে নাগালের বাইরে চলে গেল কি না!

কিন্তু ওই যে কথায় আছে, 'আমি যাই বঙ্গে, তো কপাল যায় সঙ্গে।' ডায়েরীটা সবে বের করে নিয়ে ধুলো ঝাড়ার পর্বটি শেষ করেছি, এমন সময় হঠাৎ সজোরে দরজা ঠেলে ওসমান আমার কামরায় ঢুকলো, যাকে বলে একেবারে গেট ক্র্যাশিং। রেগে উঠবো ভাবছিলাম, কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম। ওর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ আতঙ্কের ছায়া। কোনোমতে সে বলে উঠলো, "স্যার,

বিষম বিপদ! যে মহিলা টেলিভিশনে খুব প্রোগ্রাম করেন, কি যেন তাঁর নাম ?”

এ-নাম ওসমানের ভুল হবার কথা নয়। বুঝলাম উত্তেজনাই বিস্মৃতির কারণ। বললাম, “হ্যাঁ ; ভালভাবে চিনি। মিসেস ললিতা গুপ্তা। কি হয়েছে তাঁর ?”

“হ্যাঁ স্যার, তাঁর কথাই বলছি। মিসেস গুপ্তাকে একটি সিল্কের টুকরো শাড়ীর তলায় লুকিয়ে রাখতে দেখেছি। মিস বাসুকে একথা বলতে, তিনি লেডিজ ট্রাইরুমে নিয়ে গিয়ে মিসেস গুপ্তার সার্চ নিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। মিসেস গুপ্তার সঙ্গে একজন মহিলা ও একজন ভদ্রলোকও আছেন। তাঁরা এবং খদ্দেররাও বিষম বিরক্তিতে হট্টগোল করছেন। আপনাকে এখনি একবার যেতে হবে, স্যার। মিস বাসুও বিষম বিপদে পড়েছেন।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, “তোমার কোনোরকম ভুল হয়নি তো? তুমি ঠিক দেখেছো মিসেস গুপ্তাকে সিল্কের টুকরো লুকোতে ? ভেবে উত্তর দাও। তোমার জবাবের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। বুঝতেই পারছো ব্যাপারটার গুরুত্ব। ভুল হলে আমরা শুধু বিপদেই পড়বো না, সেই সঙ্গে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের অপবাদও হবে।”

ও আমাকে আশ্বস্ত করলো। নিজের চোখেই নাকি সবকিছু দেখেছে। কিন্তু মিস বাসু যে কেন খুঁজে পেলেন না, সেইটাই শুধু বুঝতে পারছে না।

প্রশ্ন করলাম, “মিসেস গুপ্তা কোথায় ?”

“লেডিজ ক্লোকরুমে।”

আমি একটু আশ্চর্য হলাম। যেখানে তাঁকে ঘিরে চলেছে প্রচণ্ড হট্টগোল সেখানে উপস্থিত না থেকে, এ-সময় ক্লোকরুমে কেন? বিদ্যুৎগতিতে একটি সম্ভাবনা মনে দেখা দিলো। তখুনি ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে সোজা হাজির হলাম লেডিজ ক্লোকরুমের সামনে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে ক্লোকরুমের পরিচারিকাকে প্রশ্ন করে বুঝলাম, ভিতরে

একটি মহিলা আছেন এবং তিনিই মিসেস ললিতা গুপ্তা। তাঁর মুখোমুখি হবার জন্য এখন হয়তো দুদণ্ড প্রতীক্ষা করতে হবে আমাদের। তা হোক। যাঁকে আমরা খুঁজছি, ইতিমধ্যে তাঁর একটু বায়ো-ডাটা দেওয়া প্রয়োজন।

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পপতি শারদাপ্রসাদের কন্যা, রাজধানীর অপেশাদার হিন্দি রঙ্গমঞ্চের মুকুটবিহীন রানী, ললিতা কলাজগতে সুপ্রসিদ্ধা এবং জনসাধারণে সুপরিচিতা। ললিতাকে দূরে রেখে কোনো হিন্দি নাটক রাজধানীতে মঞ্চস্থ করা কল্পনাতীত। এক রসিক ব্যক্তির মন্তব্য শুনেছি: 'ললিতা ইজ ললিতকলা'। কেবল রঙ্গমঞ্চেই নয়, বেতার এবং টেলিভিশনে প্রচারিত নাটকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন তিনি। তাঁর জনপ্রিয়তা তর্কের বাইরে। এছাড়া বেতার এবং টেলিভিশনে ধারা-বিবরণীর প্রসারণের সুবাদে এবং ভাষ্যকার হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। বিবাহিতা। স্বামী বার-এ্যাট-ল। ললিতার সুললিত কণ্ঠস্বর যেমন সুপরিচিত তেমনি বহু-আলোচিত তাঁর মনোরম চোখের কোলে পুরু কাজলরেখা আর কপালের মাঝখানে সদ্য-ওঠা সূর্যের মতো সিন্দুর বিন্দু। নিয়মিত পৃষ্ঠপোষিকা হিসেবে তিনি শিল্পকেন্দ্রে রীতিমতো চেনামুখ। তবু তাঁর আসা-যাওয়া চলে নিঃশব্দে, কারণ ফ্যানদের তিনি প্রশ্রয় দেন না, আর কারো অটোগ্রাফ খাতায় তাঁর সই নেই।

ভূতে-ঢেলা-মারা দুপুরের দিকে শিল্পকেন্দ্রে খদ্দেরের সমাগম কিছুটা কম হয়ে যায়, ফলে আবহাওয়া হয় শিথিল। কর্মীরা নিজেদের মধ্যে একটু-আধটু গালগল্প করার এই সুযোগটুকু ছাড়ে না।

এবার ললিতা গুপ্তা শিল্পকেন্দ্রে একা আসেন নি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক দম্পতি। এখানে দাঁড়িয়ে, ওখানে থেমে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে, এটা-ওটা দেখতে দেখতে সকলে মিলে একসময় হাজির হলেন ড্রেস-ফ্যাবরিক বিভাগে,—যেখানে গজ হিসেবে বিক্রি হয় সুতি আর সিল্কের কাপড়। সকলে মিলে পছন্দ করলেন কয়েকটি

ছাপা সুতির কাপড়। আসলে ললিতার পছন্দই সকলের পছন্দ। রঙের সাথে মিলিয়ে কাপড়ের ডিজাইন ঠিক করলেন তিনিই। পছন্দ শেষ হতে, বিভাগীয় কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো ললিতার সাথীদের কথামত কাপড় কেটে বিল তৈরী করতে। ললিতা নিঃশব্দে একপাশে কাউন্টারে হেলান দিয়ে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিলেন। একসময় তাঁর সঙ্গী মেয়েটিকে বললেন, "যমুনা, আমার তো কাজ শেষ। বাকী যা রইলো, তোমরা দুজনে সেরে নাও। আমি ততক্ষণ ওদিকে একটু সিল্ক দেখি।"

"ফাইন। কিন্তু বেশী দেরী কোরো না যেন।"

"এক্ষুনি এসে যাবো।" ললিতা দলছুট হয়ে এগোলেন সিল্ক দেখতে। শাদা ধবধবে রঙ-করা কাঠের শেলফে রঙবেরঙের বেনারস, কাঞ্চীপুরম, মুর্শিদাবাদ, আসাম, ব্যাঙ্গালোর, কাশ্মীর সিল্কের থান পরিপাটি সাজানো একের পর এক। থানের পর থান নাড়তে নাড়তে ললিতা এসে হাজির হলেন জমির উপর রাখা ঢাকাবিহীন গোলাপগন্ধী কাঠের বিরাট বাক্সের সামনে, যেখানে রাখা আছে অগুনতি সিল্কের টুকরো—কাট্ পীস। অদূরে দাঁড়িয়েছিলো ওসমান, একটি থামের পাশে। ওসমান লক্ষ্য করলো ললিতা সিল্কের টুকরোগুলি একটির পর একটি তুলে ধরে দেখে চলেছেন। লালকালো ছাপা একটি সিল্কের টুকরো তুলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর রেখে দিলেন বাক্সে। তারপর এদিকে-ওদিকে থেমে থেমে, কখনো জরীর কাজ করা বেনারসের মূল্যবান ব্রোকেট, কখনো হায়দ্রাবাদের হিমরু, কখনো বা সুরাটের শাড়ীর পাড় দেখতে দেখতে প্রায় সারা বিভাগটিকে ধীরেসুস্থে চক্কর কেটে, ফিরে এলেন সেই কাট্ পীস রাখা গোলাপগন্ধী বাক্সের কাছ-বরাবর।

আর, আশ্চর্য, এবার প্রায় আপনা থেকেই তাঁর হাতে চলে এলো সেই লালকালো ছাপা সিল্কের টুকরোটি। ধীরগতিতে পরিপাটি করে, কয়েকবার আশেপাশে দেখে নিয়ে, আচমকা দেয়ালের দিকে ফিরে মুহূর্তের মধ্যে শাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন সিল্কের টুকরোটি।

তাঁর ধারণা কেউ তাঁকে দেখেনি, কিন্তু ওসমানের নজর ছিলো তাঁর উপর; শুধু শরীরের ঠিক কোন অংশে তিনি জিনিসটি লুকোলেন, ওসমান তা ঠাহর করতে পারলো না।

তারপর আরো কিছুক্ষণ এটা-ওটা নাড়াচাড়া করার পর যমুনাদের কাছে ফিরে এসে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। হাতের ইশারায় ললিতাকে অপেক্ষা করতে বলে, যমুনা স্বামীর সঙ্গে গেলেন দাম চুকিয়ে জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে। ললিতা দাঁড়িয়ে রইলেন একাকী। সবকিছু ঘটে গেল একেবারে ওসমানের চোখের সামনেই। নইলে ব্যাপারটি তো একেবারেই অবিশ্বাস্য! ভাবতে গেলে অবাক লাগে। কোথায় ললিতা, আর কোথায়—! কিন্তু ভাববার তখন সময় ছিল না, তক্ষুনি সরে গিয়ে ড্রেস-ফ্যাবরিক বিভাগের সুপারভাইজার মিস তন্দ্রা বাসুকে জানিয়ে দিলো ললিতার কথা। তন্দ্রা তার কাজ জানে, মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলো। ললিতার কাছে এসে হাসিমুখে অভিবাদন জানালো। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর তার প্রশ্ন, "আজ কি কিনলেন?"

"আজ কিছু কিনতে আসিনি, ভাই। আমার এক বান্ধবী আর তার স্বামী ধরে এনেছে তাদের বাচ্চাদের জন্যে কিছু সুতির ছাপা-কাপড় পছন্দ করে দেবার জন্যে। ওদের ধারণা আমার নাকি পছন্দর চোখ আছে।"

তন্দ্রা মাথা নেড়ে সমর্থনসূচক কণ্ঠে জবাব দিলো, "তাদের ধারণার দোষ দিতে পারিনে। আপনার নিজের সাজসজ্জাই তার জলজ্যান্ত বিজ্ঞাপন। টিভিতে আপনাকে কী সুন্দর যে লাগে! আচ্ছা, টিভিতে আপনাকে আবার কবে দেখা যাবে?"

"আশাকরি খুব শিগগিরই। সম্প্রতি বেগম আখতারের সঙ্গে একটি আধঘণ্টার ফিচার করেছি। মনে হয় ভালোই হয়েছে। অন্ততঃ তাঁর গানের খাতিরে ফিচারটি দেখবেন। আমার কাজ আর কি! তাঁকে তুলে ধরা, সূর্যের সামনে প্রদীপের আলো দেখানো বৈ তো নয়।"

ললিতার বিনয় উপেক্ষা করে তন্দ্রা বলল, "আপনি যখন আছেন,

নিশ্চয়ই দেখবো। আচ্ছা, আপনি তো নানা বিষয়ে ফিচার করেন। আমি একটি সাজেশান দিতে পারি ?"

"হোয়াই নট ? এতো সংকোচের কি আছে ?"

"না, থাক। আপনি হাসবেন।"

"বলেই দেখুন না। শুনি তো আগে।"

সলজ্জভাবে তন্দ্রা বলল, "তাহলে বলি। রাজধানীর বড়ো বড়ো বিভাগীয় বিপণীগুলিতে যে শপ-লিফটিং হয় তার ওপর একটি ফিচার করুন না। আমার বিশ্বাস খুব ভালো হবে। আমাদের ম্যানেজার সাহেবের কাছে এ বিষয়ে অনেক রসদ পাবেন।"

তন্দ্রার টোন ক্যাজুয়াল। কিন্তু তার দৃষ্টি ললিতার উপর স্থির হয়ে আছে। লক্ষ্য করলো ললিতার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা যেন মিলিয়ে যাবার মুখে। মুখ সামান্য ফ্যাকাশে আর কপালের স্বতঃসিদ্ধ নিভাঁজ মসৃণতা আর নেই। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে অস্বাভাবিক রকম উৎসাহ দেখিয়ে ললিতা বলে উঠলেন, "হাউ ইন্টারেস্টিং! থ্যাংক ইউ ফর ইওর ব্রেইন ওয়েভ।" তারপর একটু থেমে, "আপনাদের এখানে খুব শপ-লিফটিং হয় বুঝি ?"

হাতমুখ নেড়ে আগ্রহভরা কণ্ঠে তন্দ্রা বলল, "না বলতে পারলেই খুশী হতাম, মিসেস গুপ্তা। কিন্তু আপনার ধারণা ষোল-আনা সত্যি। আর আশ্চর্য কি জানেন ? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে স্বচ্ছল অবস্থার বড়ো ঘরের লোকেরা। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। সত্যি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে, যদি প্রকৃত দরদ দিয়ে ফিচারটি তৈরী করা যায় তাহলে খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। আর সেই সঙ্গে ইনফরমেটিভ এ্যাণ্ড এডুকেটিভ। সমাজ সংস্কারের কথাও বাদ দেওয়া যায় না। রাজধানীর বিভাগীয় বিপণীগুলির একটি দুষ্টক্ষতের ওপর অস্ত্রোপচারের কাজ করবে।"

তন্দ্রা জানে কোথায় কতটা কথার ফুল ফোটাতে হয়। এতে তার অনায়াস-দক্ষতা। তাঁর নিপুণভাবে গাঁথা শব্দের মালা ললিতার গলায় যেন ফাঁসির দড়ি হয়ে দেখা দিলো। ললিতা অনুভব করছেন নিদারুণ

অস্বস্তি, তাঁর কথা বলার প্রকৃতিদত্ত শক্তির মুখে কেউ যেন বাঁধ তুলে দিয়েছে। তন্দ্রা বুঝলো, আর বাজিয়ে দেখার কিছু নেই। এবার সরাসরি শপ-লিফটিংয়ের অপরাধে ললিতাকে অভিযুক্ত করা চলে। কিন্তু এযাত্রায় রক্ষা করলেন যমুনা ও তাঁর স্বামী। দাম চুকিয়ে কাপড়ের প্যাকেটগুলি হাতে, ললিতার কাছে এসে হাজির হলেন তাঁরা।

তাঁদের দেখামাত্র ললিতা বলে উঠলেন, "তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে? এবার তাহলে যাওয়া যাক, কি বলো?" একটু থেমে, "আমার আবার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।" তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তন্দ্রাকে বললেন, "আজ চলি ভাই। আপনার বিষয়টি সত্যিই খুব চমৎকার। নিশ্চয়ই ভেবে দেখবো কিছু করা যায় কিনা। আপনাদের সাহায্য ছাড়া কিন্তু পেরে উঠবো না। আচ্ছা, নমস্কার।"

এরপর তন্দ্রাকে তার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নমস্কার জানাতেই হলো। কিন্তু ললিতা, যমুনা এবং তার স্বামী সেখান থেকে বেরোতেই তন্দ্রা গলার পর্দা নামিয়ে বলে উঠলো, "মিসেস গুপ্তা, দয়া করে একটু দাঁড়াবেন কি? একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি।"

ললিতাকে যেন একটি চমৎকার ফ্রীজ শটের মতো দেখালো। কিন্তু তা এক মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে তন্দ্রার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "বলুন।"

তন্দ্রা অন্তরঙ্গভাবে ললিতার হাত ধরে এক পাশে গিয়ে অত্যন্ত মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "যে সিল্কের টুকরোটি আপনি শাড়ীর তলায় লুকিয়ে রেখেছেন, আমাকে দিয়ে দিন, মিসেস গুপ্তা! সকলের চোখের ওপর ওটিকে বের করতে বলে আপনাকে লজ্জায় ফেলতে চাই না। আমরা লেডিজ ট্রাইরুমে যেতে পারি। কেউ কিছু জানতেও পারবে না। আসুন।"

মুহূর্তে খসে পড়লো ললিতার সামাজিকতার মুখোশ। তাঁকে দেখালো কোণঠাসা বাঘিনীর মতো। চিৎকার করতে গিয়ে সামলে নিলেন নিজেকে। পুরু কাজলটানা চোখে ঝিলিক হেনে শ্লেষ মেশানো বিস্ময়ের সুরে টেনে টেনে বললেন, "তাই নাকি? আমি চুরি

করেছি ? তাও আবার সামান্য এক টুকরো সিল্ক ! হাউ ক্যান ইউ বী সো চিকি ?”

যমুনা, তাঁর স্বামী এবং আশেপাশে উপস্থিত খদ্দেরদের শ্রুতিগোচর করার মাপে ললিতার গলা একটু উঁচুপর্দায় উঠলো। তন্দ্রা দেখলো উপস্থিত সকলের উৎসুক দৃষ্টি তাদের দিকে ফেরানো। কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মীও তাকিয়ে আছে তাদের দিকে, সকলের চোখেই বিস্ময়। ললিতা গুপ্তা শপ-লিফটিং করেছেন ! এ একটা জবর খবর। কয়েকজন খদ্দের ললিতার কাছে এসে প্রশ্ন করলো, “ব্যাপার কি ?”

এবার ললিতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-প্রতিভা কাজে লাগালেন। উপস্থিত সকলের সমবেদনা লাভের প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে তন্দ্রার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, থেমে থেমে অসহায় অশ্রুভেজা কণ্ঠে বললেন, “দেখুন না আপনারা, উনি বলছেন আমি নাকি সিল্কের একটি টুকরো চুরি করেছি।”

যেন ঘটনার অভাবনীয়তায় অভিভূত ললিতা, হাতের ব্যাগ খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। খদ্দেরদের মুখে কথা নেই। যমুনা এবং তাঁর স্বামীও ছবিতে-আঁকা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। অভিযোগের অবিশ্বাস্যতায় নিস্পন্দ খদ্দেরদের অনেকেই নিশ্চয় ললিতার ফ্যান। শুধু সহানুভূতি নয়, তাদের চোখে মুখে দেখা দিলো রাইটাস ইনডিগনেন্সেস্‌-এর তাপ। মুহূর্তে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে, ললিতা এই অনুকূল পরিস্থিতির পুরোপুরি সুযোগ নিলেন। নাটকীয়-ভাবে একহাতে নিজের ব্যাগ শূন্যে তুলে ধরে বলে উঠলেন, “আমার কাছে এই হ্যাণ্ড ব্যাগ ছাড়া আর কিছু যে নেই, তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যে-কেউ এটি খুলে দেখতে পারেন।” এই কথা বলে তাঁর দামি চামড়ার হ্যাণ্ড ব্যাগ প্রায় ছুড়ে দিলেন খদ্দেরদের মাঝ-খানে। চ্যালেঞ্জ-জানানোর দস্তানার মতো তা ছিটকে পড়লো জমির উপর, আর চাবুকের ঘায়ে খদ্দেরদের করে তুললো উত্তেজিত। শুরু হলো গুঞ্জন। এক ভদ্রলোক ব্যাগটি তুলে ফেরৎ দিতে যেতেই, ললিতা দ্রুতগতিতে দুহাত নেড়ে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “আমাকে নয়,

আমাকে নয়। দিন ওই মহিলাকে, যিনি আমাকে চোর সাজাতে চাইছেন।”

বিনা প্রতিবাদে সবকিছু শুনে চলেছে তন্দ্রা। প্রতিবাদ করলেও লাভ হতো না। ললিতা খদ্দেরদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে, টেবিল উল্টে দেয়ার নীতি নিয়েছেন। তন্দ্রাকে ভয় পেলে চলবে না। সে শান্তভাবে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় রইলো। সিল্কের টুকরোটি যে ব্যাগের মধ্যে নেই, আছে ললিতার অন্তর্বাসের কোনো নিরাপদ জায়গায় এ-কথা বলার প্রলোভন আপাততঃ সে সংবরণ করলো। প্রথমে অসহায়-ভাব তারপর ললিতার রণমূর্তি দেখে, তন্দ্রা যা বোঝবার তা বুঝে নিয়েছে। মহূর্তের জন্য অদূরে দাঁড়ানো ওসমানের কাছে দৃষ্টি বিনিময় হতে, মনে হলো সে ললিতার নাটক পুরোপুরি উপভোগ করছে। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির রেখা।

খদ্দেররা তখন রীতিমতো ক্ষিপ্ত। চারিদিক থেকে বর্ষিত হতে শুরু করেছে তাদের অসন্তোষের কলধ্বনি। যত জন তত কথা, যত লোক তত মন্তব্য। শুধু টুকরো-টুকরো কথাই শোনা যাচ্ছিলো, কিন্তু হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, তা বুঝতে সেটুকুই যথেষ্ট। ‘চোর বলেছে······দেখাচ্ছি মজা·····মেয়েমানুষ বলে রেহাই পাবে না····· অ্যাপলজি চাইতে হবে······ভদ্রঘরের মহিলাকে এত লোকের সামনে অপমান······এরা নিজেদের ভাবে কি···আমাদের পয়সায় এরা মাইনে পায়···চাকরী করে মাথা কিনেছে···’

এইসব বিরূপ মন্তব্য এবং মারমুখী খদ্দেরদের আস্ফালন তন্দ্রাকে যেন স্পর্শই করলো না। তুরুপের তাস যে তার হাতে। এবার সে হাত তুলে সকলকে শান্ত এবং স্তব্ধ হবার ইঙ্গিত করলো। এতে কাজ হলো। তন্দ্রা যেন কি আশ্চর্য কথা শোনাবে, সকলে কান পাতলো তার প্রতীক্ষায়। কণ্ঠস্বরে শান্ত দৃঢ়তা এনে তন্দ্রা বলল, “আপনাদের সব কথা আমি শুনেছি বিনা প্রতিবাদে। সহ্য করেছি সব অপবাদ, অপমান আর কটূক্তি। ভুলের জন্যে ভিক্ষায় যেমন আমার আপত্তি নেই, তেমনি অন্যায়ের জন্যে শাস্তি নিতেও আমি প্রস্তুত। আমাকে

কেবল একটি সুযোগ দিন। আমি এঁকে একবার লেডি ট্রাইরুমে নিয়ে গিয়ে সার্চ নেবো। ফিরে এলে আপনাদের যা ইচ্ছে করতে পারেন।"

উত্তরের অপেক্ষা না-করে তন্দ্রা বলল, "চলুন আমার সঙ্গে, মিসেস গুপ্তা।"

তারপরই সোজাসুজি ললিতার হাত ধরে একরকম টেনে নিয়ে ট্রাইরুমে গিয়ে ঢুকলো তন্দ্রা। সজোরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়ালো ললিতার মুখোমুখি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ললিতা, দুহাতে শক্ত করে ধরা হ্যাণ্ডব্যাগ। অপলক দৃষ্টি তন্দ্রার দিকেই ফেরানো, কিন্তু চোখদুটি যেন প্রাণহীন। আপন মনে কি যেন ভাবছেন গভীরভাবে। হয়তো পরিস্থিতির তাৎপর্য যাচাই করে নিচ্ছেন। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই ললিতা যেন কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে দোলাতে লাগলেন তাঁর শরীর, আর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির অস্পষ্ট ঝিলিক। যেন ডুবতে ডুবতে পেয়ে গেছেন তাঁর পায়ের তলায় শক্ত মাটির নির্ভরতা।

এবার তন্দ্রার আত্মবিশ্বাস একটু নড়ে উঠলো। কিছুক্ষণ আগে যে চোখ দেখে মনে হয়েছিলো প্রাণহীন, ললিতার সেই পুরু কাজলটানা চোখে এখন জ্বলছে প্রতিহিংসার চাপা আগুন। তবে কি ললিতার কাছে সিল্কের টুকরোটি নেই! তন্দ্রা কি উদ্ধার করতে পারবে না ঐ সিল্কের টুকরোটি! একটি শীতল শিহরণ বয়ে গেলো তন্দ্রার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে আর তার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি হয়ে উঠলো অত্যন্ত দ্রুত। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যখন ঠাণ্ডার দিনে থার্মোমিটারের পারার মতো ধাপে-ধাপে নীচে নেমে যাচ্ছে, তখন সে যেন শুনতে পেলো ওসমানের কণ্ঠস্বর, 'মিসেস গুপ্তাকে আমি এক টুকরো লাল-কালো ছাপা সিল্ক-টুকরো শাড়ীর তলায় লুকিয়ে রাখতে দেখেছি, দিদি।' ওসমান ভুল করে না, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে। পাখী-পড়ানোর মতো ওসমানদের মনে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে সম্পূর্ণ সংশয়হীন না-হলে কোনো মানুষের উপর শপ-লিফটিংয়ের অভিযোগ যেন না-আনা হয়। একজন নিরপরাধীকে শাস্তি দেয়ার চেয়ে শতজন অপরাধী শাস্তি এড়িয়ে

যায়—সেও ভালো। ললিতা রহস্যময়ী, তার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়, তবু তন্দ্রা স্থির করলো সে আত্মবিশ্বাস হারাবে না। সে ললিতার ভাবান্তর উপেক্ষা করে বলল, "জিনিসটি এবার বের করে দিন, মিসেস গুপ্তা।"

"বা, রে! বের করবেন তো আপনি।" সেই সঙ্গে একটি বেপরোয়া শ্রাগ। যেন এর পর আর কিছু বলা কওয়ার নেই।

তন্দ্রা তবু আগের মতোই নিঃসংশয় কণ্ঠে বলল, "এখনো বাঁচার আশা আছে, যদি জিনিসটি আমাকে দিয়ে দেন।"

"আপনার ওই এক কথা। বলেছি তো নেই।" একটু বিরতি। তারপর নিতান্ত তাচ্ছিলের সুরে ঠোঁট উল্টে সংযোজন করলেন ললিতা, "কি যেন বললেন আপনি? আমাকে বাঁচাবেন! হা, হা, আই লাইক ইট, আই ডু।"

মুখের পেশীগুলি কঠিন হয়ে উঠলো তন্দ্রার। ললিতার কথা এবং কথা বলার ঢং তার আত্মসম্মানে আঘাত করেছে। ছটফটিয়ে উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন? আপনার শাড়ীর তলায় যা লুকিয়ে রেখেছেন, সেটি নিজের থেকেই আমার হাতে তুলে দিন, মিসেস গুপ্তা।"

"থামুন তো। ডোণ্ট বী চিকি। একবার বলে দিয়েছি, কোনো কিছু আমি লুকিয়ে রাখিনি।"

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো তন্দ্রার। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো, "ভেবেছিলাম আপনার সহযোগিতা পাবো। সার্চ নেবার দরকার হবে না। কিন্তু এখন বুঝছি তা হবার নয়। অবশেষে আপনাকে সার্চ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।"

কথা শেষ করে তন্দ্রা এগিয়ে গেলো ললিতার দিকে। হাত ছুঁতে না-ছুঁতেই এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে, ললিতা ছিটকে দু'পা সরে গিয়ে বলে উঠলেন, "বলছি তো, শাড়ীর তলায় কোনো কিছু আমি লুকিয়ে রাখিনি। আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হলো না! বেশ, তাহলে দেখুন।"

চোখের পলকে তাঁর পরনের শাড়ী খুলে ফেললেন ললিতা। তারপর তড়িৎগতিতে হুকগুলি একের পর এক আলগা করে, গায়ের চোলি খুলে সজোরে মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে বলে উঠলেন, "করুন সার্চ। দেখুন কি পান।" মুখে বিজয়িনীর হাসি। যেন দক্ষ যাদুকর তার শোম্যানশিপের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন।

কথা বলবে কি তন্দ্রা! ঘটনার আকস্মিকতায় সম্পূর্ণ হতবাক। এতো সহজে এবং নিঃসঙ্কোচে একজন শিক্ষিতা মহিলা নিজেকে প্রায় নিরাবরণ করতে পারেন অপরের উপস্থিতিতে—হোক না সেও মহিলা, —তন্দ্রার কাছে তা স্বপ্নাতীত। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উর্দ্ধবাহু ললিতার দিকে। কিছুক্ষণ পর ললিতা হাত নামিয়ে নিলেন। শরীরের ভারসাম্য এক পায়ের উপর রেখে, কোমর বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটি হাত ঝুলে আছে শরীরের সমান্তরালে। অপরটি বাঁকা কোমরের উপর রাখা। শরীরের নিম্নাঙ্গ অল্প-অল্প দুলছে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। তুষারশুভ্র অন্তর্বাসের আড়ালে পরিপুষ্ট উদ্ধত দুটি স্তন গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ওঠা-নামা করছে। নিরাভরণ ক্ষীণ কটিদেশের মধ্যস্থলে সুস্পষ্ট গভীর নাভি। নিম্নাঙ্গ জড়িয়ে আছে পুরু স্যাটিনের গাঢ় নীল পেটিকোট। মসৃণ অনাবৃত দেহ চিকচিক করছে নিয়নের আলোয়। এ-দৃশ্যে হয়তো কোনো শিল্পসম্মত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে ; কিন্তু এর তর্কাতীত অশালীনতা তন্দ্রার শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রচণ্ড আঘাত করলো। অজান্তে বন্ধ হয়ে গেলো তার দু'চোখ।

সম্বিত ফিরে পেলো যখন উপলব্ধি করলো, সে ললিতার আলিঙ্গনবদ্ধা। জানতে পারে নি কখন তিনি সামনে এসে দুবাহু দিয়ে তাকে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছেন সজোরে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ তন্দ্রার শরীর ছুঁয়ে আছে। এই অস্বাভাবিক আলিঙ্গনে তন্দ্রার শ্বাস রুদ্ধপ্রায়। নিজেকে মুক্ত করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। সারা শরীর অবশ। ললিতা নিজের গাল তন্দ্রার গলায় ধরে মধুর আবেশময় কণ্ঠে প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "এখনো যদি

বিশ্বাস না-হয় ভাই, তাহলে বলুন। আমি ব্রাসিয়ার আর পেটিকোটও খুলে ফেলতে পারি।"

কণ্ঠস্বর নয়, তন্দ্রা যেন শুনতে পেলো বিষাক্ত নাগিনীর হিস-হিস শব্দ। কোনোমতে মাথা নেড়ে মানা করতে, ললিতা বলে উঠলেন, "বেশ, তাহলে আপনি ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখুন, কোথাও কিছু লুকানো আছে কি না।"

ললিতা তাঁর বাঁধনে সামান্য শিথিলতা এনে, তন্দ্রার ডান হাত চেপে ধরে ব্রাসিয়ারের খাঁজে প্রবেশ করাতে উদ্যত হতেই, তন্দ্রার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠলো। যেন এক হিলহিলে সাপ ছোবল মারার ভঙ্গীতে ফণা নাচাচ্ছে। শেষ চেষ্টায় একটি জোরালো ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে দু'পা পিছিয়ে গেলো হাঁফাতে লাগলো প্রবল উত্তেজনায়।

ললিতা হেসে বললেন, "কি হলো? ভয় পেয়ে গেলেন! আমি তো আপনাকে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত করতেই চাইছিলাম।" উত্তর দেবার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তন্দ্রা। ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডল শাড়ীর আঁচলে মুছে, নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

এবার ট্রাইরুমের মধ্যে শুরু হলো ললিতার পদচারণা। ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করে চলেছেন সারা কামরা। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিতম্বও যেন অধিক মাত্রায় দুলছে। তন্দ্রার মনে হলো এটি ললিতার ইচ্ছাকৃত। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছেন নিজের প্রতিচ্ছবি। দেখতে দেখতে একসময় হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন। হাসি যেন থামতেই চায় না। তন্দ্রার মনে হলো, তাঁর অপ্রস্তুতিকে লক্ষ্য করেই ললিতার এই অট্টহাসি। সিল্কের টুকরোটি তন্দ্রা উদ্ধার করতে পারে নি ; এর ভয়াবহ অর্থ তার অজানা নয়। হঠাৎ হাসি থামিয়ে তন্দ্রার সামনে এসে দাঁড়ালেন ললিতা। কোমরে হাত রেখে, একটু ঝুঁকে পড়ে, দাঁতের ওপর দাঁত চেপে হিংস্র বাঘিনীর মতো গর্জে উঠলেন, "আমি আপনাকে ছাড়বো না। সেই সঙ্গে আপনাদের কেন্দ্রকেও রেহাই দেবো না। একঘর লোকের সামনে আপনি আমার মান, সম্ভ্রম, সুনাম মাটির

সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। এর প্রতিশোধ আমি নেবোই। আমি আমার স্বামী এবং পুলিশকে এখানে ডেকে পাঠাবো। আইনতঃ সম্ভব হলে আপনাকে গ্রেফতার করতেও দ্বিধা করবো না। ইউ উইল স্যুন নো দ্যাট ইউ কট এ ট্রেটার। আপনাদের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রুজু হবে ফৌজদারী আর মানহানির মামলা। পুরো পাঁচ লাখ টাকার খেসারত দিতে দাবী করবো। আমার বান্ধবীর স্বামী একজন জার্নালিস্ট। উনিও প্রত্যক্ষদর্শী। আপনার অপকর্মের কাহিনী ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থাও করাবো।"

এক নাগাড়ে এতোগুলি কথা বলে হাঁফাতে লাগলেন ললিতা। অবস্থার গুরুত্ব এতোই বেশী যে তন্দ্রার মুখে কথা সরছে না। মনে দেখা দিয়েছে নিদারুণ আতঙ্ক। অপরাধীকে ধরতে গিয়ে নিজেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। বোধ হয় একেই বলে আয়রনি অফ ফেট্। শাদা বাংলায় অদৃষ্টের পরিহাস।

তবুও কে যেন বারবার তন্দ্রাকে বলে চললো, তার ভুল হয় নি। বরং অনুসন্ধানেই কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে। কিন্তু গেলো কোথায়? কর্পূরের মতো উবে যেতে পারে না! কোথায় যেন থেকে গেছে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র, যে ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ললিতা করে নিয়েছেন মুক্তির পথ। কিন্তু আপাততঃ তন্দ্রাকে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে। দিস্ আর হ্যাজারডস অব দি জব্। যে বিশেষ ধরনের চাকরী সে করে, তাতে বিপদের ঝুঁকি তো আছেই। তন্দ্রার মনোবল ফিরে এলো। সে ধরে নিলো ঘটনার শেষ হতে এখনো অনেক বাকি, আর ললিতাকে বাইরে যাবার জন্য তৈরী হতে বলল।

বিজয় উল্লাসে যেন নেচে উঠলেন ললিতা। কোমর দুলিয়ে ছড়ানো-ছিটানো শাড়ী চোলি তুলে নিয়ে পরিধান-পর্ব সাঙ্গ করলেন অলস গতিতে। যেন কোনো তাড়া নেই। ব্যাগ খুলে প্রসাধন সামগ্রী বের করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষ করলেন মেক-আপ। শেষবারের মতো নিজেকে একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়নাতে দেখে নিয়ে, তন্দ্রার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন, "অ্যাট

ইয়োর ডিসপোসাল ম্যাডাম। আশাকরি আসল অপরাধীর নাম আপনার কাছ থেকেই শুনতে পাওয়া যাবে। তারপর বিচার, তাই না ?”

ট্রাইরুমের দরজা খুলে কয়েক পা এগিয়েই তারা এসে পড়লো একেবারে কৌতূহলী খদ্দেরদের মুখোমুখি। কেন্দ্রের কিছু কর্মীও উপস্থিত। নিঃশব্দে সকলে উন্মুখ হয়ে আছে তল্লাসীর পরিণাম জানার আশায়। ক্ষণিকের জন্য দুজনেই থমকে দাঁড়ালেন। পরমুহূর্তেই ললিতা এগিয়ে গিয়ে সকলের পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর বান্ধবী যমুনার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সকলের দৃষ্টি সাইন ক্যামেরার মতো তাঁকে প্যান করছে। যমুনা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। হাত তুলে তাঁকে বাধা দিয়ে, তন্দ্রার দিকে হাত বাড়ালেন ললিতা। হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, “মিস বাসু, এবার বলুন এঁদের, কি পেয়েছেন আমার কাছে।”

খদ্দেরদের দলও অধীর। এক্ষুনি যেন এক আশ্চর্য রহস্যের উপর থেকে পর্দা উঠে যাবে। তারা আর দেরী করতে নারাজ। অথচ বলার তো কিছু নেই তন্দ্রার। ললিতার 'যুদ্ধং দেহী' ভাব আর কথার মধ্যেই খদ্দেরদের প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট। তবুও মাথা উঁচু করে স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলো তন্দ্রা, “ওঁর কাছে কিছু আছে বলে আমি দেখিনি।”

হয়তো নিজের অপরাধের কথাও কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু শেষ করতে পারলো না তার বক্তব্য। শুরু হলো প্রচণ্ড চেঁচামেচি আর হৈ-হুল্লোড়। খদ্দেররা বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো এগোতে লাগলো তন্দ্রার দিকে। তাদের শান্ত করবে কে? নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘটনার স্রোত কোন দিকে বইছে দেখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না তন্দ্রার। ইতিমধ্যে ললিতার বান্ধবীপতি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। হাতমুখ নেড়ে কঠিনকণ্ঠে বললেন, “আমার নাম আর. কে. মেনন। আমি জার্নালিস্ট। আগামীকাল রাজধানীর সবগুলি সংবাদপত্রে আপনার এই অপকীর্তির কাহিনী প্রকাশিত হবে। মিসেস গুপ্তা আমাদের বিশেষ বন্ধু। তাঁর সম্মানরক্ষার দায়িত্ব আমাদের।”

খদ্দেরদের হট্টগোলের ফাঁকে-ফাঁকে মেননের কথা শোনা যাচ্ছিলো।

ওদিকে যমুনাও আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। স্বভাবতই তাঁর সব রাগ আর আক্রোশ গিয়ে পড়ল তন্দ্রার উপর।

মেনন থামতেই তিনি সকলকে ঠেলে এগিয়ে এসে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে অত্যন্ত অভদ্রভাবে ব'লে উঠলেন তন্দ্রাকে, "অশিক্ষিত, ইতর। ছ'পয়সার চাকরী করে নিজেকে যা-না-তাই ভাবতে শুরু করেছো। ভেবেছো শস্তা সেনসেশন ক্রিয়েট করে হাততালি পাবে? তুমি যেমন বুনো ওল, আমরাও তেমনি বাঘা তেঁতুল।"

মেনন দম্পতি তন্দ্রার খুব কাছ-ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের আচরণে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলো তন্দ্রা। দূরে একবার চোখ তুলে তাকাতেই লক্ষ্য করলো, সকলের পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ললিতা উপভোগ করছেন তার সঙ্গীন অবস্থা। যমুনার কথা শেষ হতেই আবার শুরু হলো হৈ-হুল্লোড় আর চেঁচামেচি। তন্দ্রার কানে বাজতে লাগলো নানাজনের কাটাকাটা অশালীন বক্তব্য, কটূক্তি আর ভয় প্রদর্শন, "আরও নাও সার্চ······এবার নির্ঘাত শ্রীঘর······চাকরীও খতম······শ্লা ম্যানেজার কোথায় ······শ্লার মাথা ফাটিয়ে দেবো······ আমরা থাকতে থানা-পুলিশ কেন······ডাইরেক্ট এ্যাকশন······দমদম দাওয়াই দিতে হবে······।" যেন মৌচাকে ঢিল ছুড়েছে কেউ, আর তারই প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ মৌমাছিদের ভন্‌ভনানি।

পরিস্থিতি প্রায় আয়ত্তের বাইরে! তন্দ্রার অসহায় দৃষ্টি যেন খুঁজে ফিরছে সমস্যা সমাধানের পথ। শিল্পকেন্দ্রের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কোনো-দিন এ-ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি। কর্মীরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে, মুখে কোনো ভাষা নেই। অজানা এক সম্মোহনী শক্তি সকলকে যেন করে দিয়েছে স্থানু অচল বাক্যহীন। যেন সকলেই অপরাধী। নিঃশব্দে শুনে চলেছে সকলের সকল অভিযোগ, কটূক্তি আর ভদ্রতার সীমা-পেরোনো মন্তব্য। অদূরে খদ্দেরদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওসমান। তন্দ্রার অবস্থা দেখে অপরাধবোধে সে জর্জরিত। যদি আসামীর কথা ওঠে, আসল আসামী তো সেই-ই।

ওসমানের আমাকে খবর দেয়ার কথা মনে হলেও ললিতাকে নজরবন্দী রাখা তার একান্ত কর্তব্য। তার সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি ললিতাকে অনুসরণ করে চলেছে। খদ্দেররা চেনে না ওসমানকে, ললিতা জানেন না তার পরিচয়। তাই খদ্দেরদের মধ্যে অতি সহজে মিশে যেতে পেরেছে ওসমান।

সকলের দৃষ্টি তন্দ্রার উপর নিবদ্ধ। ওসমান দেখলো সকলের থেকে ললিতা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পৃথক হয়ে গেলেন; আর সকলের অজান্তে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে দ্রুতগতিতে প্রবেশ করলেন কিছু দূরে অবস্থিত লেডিজ ক্লোকরুমে। সকলের চোখে ধূলো দিলেন ললিতা, কিন্তু জানতে পারলেন না ওসমান তাঁর অনুসরণরত। ললিতা ক্লোকরুমে প্রবেশ করা-মাত্র ওসমান আমাকে খবর দেওয়ার সুযোগ পেলো। দ্রুতগতিতে আমার কামরায় হাজির হয়ে জানালো ললিতা-সংবাদ! তন্দ্রা বিপদগ্রস্তা জেনেও সেদিকে পা বাড়ালাম না। সোজা হাজির হলাম লেডিজ ক্লোকরুমের বাইরে। ললিতার সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হলে, তন্দ্রা আপনা হতেই হবে বিপদমুক্ত। লেডিজ ক্লোকরুমের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম চোখে পুরু কাজলটানা মিসেস ললিতা গুপ্তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

ক্লোকরুমের বাইরে এসে আমাকে সামনে দেখামাত্র চমকে উঠলেন ললিতা। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলেন নিজেকে। মুখে হাসি ফুটিয়ে দু'হাত একত্রিত করে অত্যন্ত আন্তরিক কণ্ঠে বলে উঠলেন, "নমস্কার, মিঃ সরকার। কেমন আছেন? আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?"

"নমস্কার। আপনার কি খবর?"

"খুব ভাল। আজ কিন্তু আমাকে ক্ষমা করতে হবে, মিঃ সরকার। আজ একেবারে সময় নেই কথা বলার। বিশেষ তাড়া আছে। আর-একদিন দেখা হবে। একটু পথ দেবেন যাবার?"

ক্লোকরুমের সংকীর্ণ প্রবেশ পথের মাঝখানে ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে-

ছিলাম। পথরোধ এবং সেইসঙ্গে ললিতাকে অবাক করাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। তাঁর আমাকে দেখে চমকে ওঠা এবং যাবার তাড়া, এ সবই আমার প্রত্যাশিত। কোনো ভাব প্রকাশ না করে দেওয়ালের দিকে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে সামান্য বাও করে হেসে বললাম, "আই অ্যাম সো স্যরি মিসেস গুপ্তা।" যেন ক্লোকরুমের প্রবেশ পথের সংকীর্ণতার জন্যই আমার এই বিনীত দুঃখ প্রকাশ। তাঁকে দু'পা এগোবার সুযোগ দিয়েই, গলার স্বর পালটে, মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, "দাঁড়ান, মিসেস গুপ্তা।"

ললিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আর এগোলেন না। বিনা প্রতিবাদে তাঁকে দাড়াতে দেখে, আমি মোটেই অবাক হলাম না। এমনটাই আশা করছিলাম। অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "আপনি আমার সঙ্গে একবার ক্লোকরুমে চলুন, মিসেস গুপ্তা।" উত্তরের অপেক্ষা না-করে পরিচারিকাকেও সঙ্গে আসতে নির্দেশ দিলাম।

ললিতা প্রতিবাদ করলেন না, কিন্তু চললেন যেন যন্ত্রচালিতের মতো। সকলে একে একে ক্লোকরুমে এসে ঢুকলাম। প্রথমে ললিতা, তারপর পরিচারিকা এবং সবশেষে আমি। চারদিক ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্লোকরুম, কোথাও কিছু ছড়ানো নেই। মুহূর্তে একটি আশঙ্কা আমাকে চেপে ধরলো। আর সেই সঙ্গে গলা শুকিয়ে হয়ে গেলো কাঠ। ললিতা কি তবে সিল্কের টুকরোটি ক্লজেটে ফেলে দিয়ে ফাঁস টেনে দিয়েছেন! যদি তা করে থাকেন, তাহলে তন্দ্রাকে বিপদমুক্ত করা দূরের কথা, ওসমান আর আমিও জড়িয়ে পড়বো চরম বিপদে। সে বিপদ কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। ললিতা সুপ্রসিদ্ধ শিল্পপতির কন্যা আর ব্যারিষ্টার-পত্নী। ধনকুবের পিতা আর চৌকস ব্যারিষ্টারের সহযোগিতায় নিঃসন্দেহে আমাদের অতল-তলে তলিয়ে দেবে। জটিল মামলার ফাঁসে জড়িয়ে পড়বো, হয়তো ফৌজদারী পর্যন্ত গড়াবে। একেবারে নাস্তানাবুদ অবস্থা। অন্ধকারময় সম্ভাবনাগুলো একের-পর-এক মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। ডুবন্ত মানুষের শেষ খড়কুটো ধরবার আপ্রাণ চেষ্টার

মতো, কিছু একটা আবিষ্কারের আশায় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ ক্লোকরুমের কোণায় প্লাস্টিকের বালতিটি আমার নজরে পড়লো। আপনা থেকেই ললিতার দিকে দৃষ্টি ঘুরে এলো ; লক্ষ্য করলাম তিনি শাড়ীর আঁচলের প্রান্ত আঙ্গুলে জড়াচ্ছেন আর খুলছেন। মুখে ভয়ের ছায়া। 'ইউরেকা' কথাটি মুখে আসছিলো, কিন্তু চেপে গিয়ে পরিচারিকাকে বললাম, "শান্তি, বালতির ঢাকনাটা খুলে দেখোতো ওর মধ্যে কোনো জিনিস আছে কি না।"

ঢাকা খুলে শান্তিই বের করে দিলো একটি সিল্কের টুকরো। হ্যাঁ ; নির্ভুলভাবে সেই লাল-কালো ছাপা সিল্ক, যার পিছনে এতোক্ষণ ধরে আমাদের এতো ছুটোছুটি, এতো হয়রানি। আর, তারপরই আমার মনের সব আশঙ্কা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কর্পূরের মতো উবে গেলো। তার জায়গায় দেখা দিলো তীব্র ঘৃণামিশ্রিত প্রবল ক্রোধ। ফিরে দেখি অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ললিতা আমার দিকে। যাকে বলে ক্রেস্টফল্‌ন্‌। দু হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা শাড়ীর আঁচলের প্রান্ত দাঁত দিয়ে কাটছেন। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন ললিতা গুপ্তা। বোধহয় একেই বলে, টু ক্লেভার বাই হাফ। আমাদের শাদামাটা ভাষায়, অতি চালাকের গলায় দড়ি। ললিতার মুখে স্নায়ু-দুর্বলতার চিহ্ন। আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল। কী যে ইচ্ছে হচ্ছিলো, তা মনে করলেও লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকে না। উত্তেজিত হলেও উত্তেজনা দমন করে কাজ করতে হয় আমাদের। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিজেকে সংযত করে ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলে উঠলাম, "ছিঃ, আপনি চুরি করেছেন ! এই আপনার ভেতরকার চেহারা !"

নিরুত্তর ললিতা আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন বাঁধ-না-মানা কান্না রোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। শান্তিকে বললাম, "ওসমানকে ডাকো।"

ডাকতে হলো না। ওসমান যেন তৈরী হয়েই ছিলো। সাড়া দিলো, "আমি হাজির, স্তার।" দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে না-পেরে কখন যে দরজার বাইরে এসে হাজির হয়েছে ওসমান, জানতে

পারি নি। এবার যেন বন্যাস্রোতের মতো ভেতরে ঢুকে এসে বলল, "আমি আপনাকে বলেছিলাম স্যার, সিল্ক ওঁর কাছে নিশ্চয়ই আছে। এবার দেখলেন তো?"

বুঝলাম ওসমান কিছু প্রশংসা চায়। আর ওর প্রাপ্যও সেটা। কাঁধে হাত রেখে বললাম, "সাবাস! এবার তুমি এক কাজ করো, ওসমান। একটু পরে মিসেস গুপ্তাকে আমার অফিসে নিয়ে এসো।" পা বাড়ালাম অফিসের দিকে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ক্রোধ এবং ঘৃণার জ্বলুনি কিছুটা শান্ত করার তাগিদেই একটু বিষোদগার না-করে পারলাম না। ঘাড় ফিরিয়ে বিদ্রূপ করলাম, "কিন্তু খুব সাবধান, ওসমান। মহিলাটি পাঁকাল মাছের মতো। দেখো, যেন তোমাকে বোকা বানিয়ে, চোখে ধুলো দিয়ে, পালিয়ে না যান।"

লজ্জায় ললিতা মাথা নীচু করলেন। হাতে সিল্কের টুকরোটি নিয়ে এগোলাম। অফিসের বাইরে বেশ কিছু খদ্দেরের ভীড় জমে উঠেছে। কামরার দরজা একটু খুলে ধরতেই, কানে এলো পুরুষের উচ্চকণ্ঠ। হাতে-ধরা সিল্কের টুকরোটি ট্রাউজারের পকেটে পুরে ক্ষণিকের জন্য কামরার দরজা অল্প-খোলা রেখে, কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কামরার মধ্যে কেউই জানতে পারলো না আমার উপস্থিতি। শুনতে পেলাম ভদ্রলোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, "বলুন কোথায় ললিতা? লজ্জায়, অপমানে ও যদি সাংঘাতিক কিছু করে বসে, তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী হবেন আপনি। আমাদের না-জানিয়ে, সকলের অজান্তে মেয়েটা একেবারে উধাও হয়ে গেলো! বলছিলেন না, নিশ্চয়ই ম্যানেজারের কামরায় পাওয়া যাবে? কিন্তু এখানেও নেই। আপনাদের ম্যানেজারটিও ঠিক সময়বুঝে বেপাত্তা হয়ে গেলেন। ভ্যানিস ইন্ টু থিন এয়ার।"

ইংরজি উচ্চারণ নিখুঁত দক্ষিণদেশীয়। এঁরাই তাহলে ললিতার সাথী, যাদের কথা ওসমান বলেছিলো। আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ামাত্র দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকে বললাম, "নো, ব্রাদার; ম্যানেজার কোথাও বেপাত্তা হয় নি। আপনাদের সেবায় হাজির। বলুন আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?"

চকিতে সকলে ফিরে তাকালেন দরজার দিকে। কেউই কোনো কথা বললেন না। আচম্বিতে আমার এই কামরায় প্রবেশ তাঁরা আশা করেন নি। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন টেবিলের ধার-ঘেঁষে। একপাশে তাঁর স্ত্রী এবং সামনে তন্দ্রা। চোখমুখ দেখে মনে হলো তন্দ্রা অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছে। আর কোনো কথা না-বলে, সোজা এসে দাঁড়ালাম আমার চেয়ারের কাছে। ভদ্রলোক আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওঃ, আপনিই তাহলে মিঃ সরকার। আমার নাম আর. কে. মেনন আর ইনি আমার স্ত্রী যমুনা। আপনাদের বিরুদ্ধে আমার সাংঘাতিক অভিযোগ আছে।"

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ এবং আক্রমণাত্মক। একে মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে ললিতার উপর ক্রোধ আর ঘৃণা, তার উপর মেননের কর্কশতা প্রায় উন্মাদ করে তুললো আমাকে। কিন্তু নিজেকে প্রাণপণে সংযত রেখে, মুখে ফুটিয়ে তুললাম সৌজন্যের হাসি। যেন আমি কিছুই জানি না। করজোড়ে আন্তরিকতার সুরে বললাম, "নমস্কার, মিঃ মেনন। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ প্রীত হলাম। আপনারা সকলে প্রথমে দয়া করে বসুন, তারপর শুনবো আপনাদের অভিযোগ। ইট ইজ মাই জব টু লিসেন টু কাস্টমার কমপ্লেইনস্। আই অ্যাম পেইড ফর ইট।"

কথা শেষ হওয়া মাত্র ললিতা ও ওসমান কামরায় প্রবেশ করলো। মেননের আর উত্তর দেয়া হলো না। সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হতে, আমি নিঃশব্দে সকলের অজান্তে সিল্কের টুকরোটি, যেটি এতক্ষণ আমার ট্রাউজারের পকেটে ছিলো, টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলাম। ললিতাকে দেখে কেবল মেনন দম্পতি নয়, তন্দ্রাও অবাক। কাছে গিয়ে ললিতাকে জড়িয়ে ধরে যমুনা বললেন, "এতোক্ষণ কোথায় ছিলে, ললিতা?"

"ক্লোকরুমে।"

"কখন যে চলে গেলে টের পেলাম না। আমাকে একবার বলে গেলে পারতে! তোমার জন্যে যা দুর্ভাবনা হচ্ছিলো!" যমুনার কণ্ঠে

অভিমানের সুর। ললিতা কোনো উত্তর দেবার আগেই, মেনন আমার কথার রেশ টেনে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, "না না, মিঃ সরকার, বসার জন্যে আমরা এখানে আসিনি। এসেছি কৈফিয়ৎ তলব করতে। ললিতা আমাদের পরম বন্ধু। কেন আপনারা ওঁকে মিথ্যে চুরির অপবাদ দিয়েছেন, তার কৈফিয়ৎ চাই। এর শাস্তি আপনাদের কিভাবে দিতে হয়, আমার ভালোভাবে জানা আছে। আপনারা ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছেন।"

এর পর তিনি আমার মতো অভাজনকে আলোকিত করতে ললিতার বংশলতিকার একটি বিরাট ফিরিস্তি দাখিল করলেন। তাঁর নাটকীয় ভাষা বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না; কথা শেষে মেনন একদৃষ্টিতে ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাতদুটি তাঁর কোমরের উপর রাখা। কোঁচকানো জোড়া ভুরুর নীচে দু'চোখ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের হলকা। নিজেকে সংযত করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি একটি সিগারেট ধরালাম। আমাকে উত্তেজিত হলে চলবে না। মেননরা জানেন না ইতিমধ্যে কি ঘটে গেছে। এখনো ভাবছেন ললিতা নির্দোষ। একবার ভাবলাম বৃথা সময় নষ্ট না-করে সব কথা ফাঁস করে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, না। মেনন দম্পতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছেন আমাদের সঙ্গে। তন্দ্রাকে সহ্য করতে হয়েছে নিদারুণ অপমান। কিছুটা তার রিটার্ণ দিতে হবে। তাচ্ছিল্যভরে একগাল ধোঁয়া সজোরে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে তিক্তকণ্ঠে যা বললাম তাতে মেননের ক্রোধাগ্নিতে যেন আহুতি দেয়া হলো বিশুদ্ধ উদ্দীপক ঘৃত। "হ্যাঁ; আপনি যা বললেন সবই আমার জানা। নতুন কোনো তথ্য শোনান নি। কিন্তু আমি আরো কিছু জানি যা আপনাদের অজানা। আপনাদের প্রিয় বান্ধবীটি রঙ্গমঞ্চের বাইরে বাস্তব জীবনেও একজন পাকা অভিনেত্রী। তাঁর শাদা পোষাকের রূপও আমার জানা আছে। যাইহোক, বসার জন্যে যখন আমার কামরায় আসেন নি, তখন আপনারা যেতে পারেন। এর পরের ব্যাপারে আপনাদের না-হলেও আমার চলবে। ধন্যবাদ।"

ক্রোধে ফেটে পড়লেন মেনন। কাঁপতে কাঁপতে দাঁতের উপর দাঁত চেপে সজোরে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে বিকৃতকণ্ঠে বলে উঠলেন, "জানেন আমি একজন সাংবাদিক। আপনার এরকম ব্যবহারের জন্যে আপনাকে আজীবন অনুতপ্ত হতে হবে।"

উনি যেমনভাবে বারে-বারে 'জানেন' বলছিলেন তা দস্তুরমতো হাস্যকর। কিন্তু তাঁর ক্রোধের আগুন তখন শত-শিখায় জ্বলে উঠেছে ; হেসে ফেলে তাতে ঘৃতাহুতি দেবার আগ্রহ আমার হলো না। এবার ললিতার মুখোশ খোলার পালা। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে শুরু করলাম, "দেখুন মিঃ মেনন তাড়িয়ে আমি কাউকে দিচ্ছি না। তবে বসতে যখন আপনারা আসেন নি, অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার এলেমও নেই, তখন কেন নিজের এবং আমার সময় বৃথা নষ্ট করবেন ? আপনারা আসতে পারেন।"

মেননকে মুখ খুলতে উদ্যত হতে দেখামাত্র বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলাম, "এনাফ মিঃ মেনন। অনেক কথা আপনার শুনেছি, অনেক দুর্ব্যবহার সহ্য করেছি আপনার। কিন্তু আর নয়, এবার আমার পালা। চুপচাপ আমার কথাগুলি আগে শুনুন, তারপর যদি বলার কিছু থাকে বলবেন।" মেনন সামান্য ইতস্তত করলেন। তারপর কি ভেবে আর মুখ খুললেন না। মনে হলো আমার বক্তব্য শোনার জন্য তৈরী। শুরু করলাম, "আপনি কোন সংবাদপত্রের সাংবাদিক জানি না ! আর, জানবার কোনো আগ্রহও আপাততঃ নেই। কিন্তু সাংবাদিক হলেই কারো সাত খুন মাফ হয় না। ইউ কুড ডু উইথ লিটল মোর ম্যানারস।" মেনন আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। হাত তুলে বাধা দিয়ে বললাম, "আমার কাজে আর যদি বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন, তাহলে, মন দিয়ে শুনুন, যে অপরাধের দায়ে, আপনাদের প্রিয়বান্ধবী, শিল্পপতি শারদাপ্রসাদের দুলারী, শ্রীমতী ললিতা গুপ্তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চলেছি, সেই অপরাধের সহযোগী, এ্যাকমপ্লিস হিসেবে, আপনাদের নামও জুড়ে দিতে বাধ্য হবো। ইজ ছাট ক্লিয়ার টু ইউ মিঃ মেনন ?"

হঠাৎ হাতের আঙ্গুলে জ্বলুনি অনুভব হতে, তাকিয়ে দেখি ছাইদানে সজোরে চেপে আছি জ্বলন্ত সিগারেটের অবশিষ্ট অংশ। দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে গেছে আঙ্গুলের চাপে। মুখ তুলতেই দেখি মেননের বিস্ফারিত চোখদুটি যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে। আতঙ্কে ঝুলে পড়েছে তাঁর চোয়াল। যমুনার শরীর কাঁপছে। চেয়ারের পিঠ ধরে যেন নিজেকে সামলাতে চাইছেন। তন্দ্রার চোখে সবকিছু গোলকধাঁধাঁ। কেবল ওসমানের চোখে মুখে পরিতৃপ্তির চিহ্ন। আর ললিতা? মাথা নীচু করে হয়তো ভাবছেন নিজের বিধিলিপির কথা। তীরে এসে ডুবে গেল তাঁর তরী।

আর কোনো কথা না বলে মেননের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এতোক্ষণে বোধকরি মেনন সম্বিত ফিরে পেয়েছেন। একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "আমাদেরও পুলিশে দেবেন, মিঃ সরকার!"

"আপনি নিঃসন্দেহে একজন বিচক্ষণ সাংবাদিক, মিঃ মেনন আমার বক্তব্য সঠিক আঁচ করতে পেরেছেন।"

টেবিলের ড্রয়ার খুলে লাল-কালো ছাপা সিল্কের টুকরোটি তুলে ধরে ধীরে ধীরে শূন্যে দোলাতে লাগলাম। একসঙ্গেই আঁতকে উঠলেন মেনন দম্পতি। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তন্দ্রা, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেননের চোখ ললিতার দিকে। ললিতা তখনো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হলো মেনন কিছু বলতে চান কিন্তু ইতস্তত করছেন। মনে হয়তো দেখা দিয়েছে কোনো দ্বন্দ্ব। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে টেবিলের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন, "বিশ্বাস করুন, মিঃ সরকার, এসব আমরা কিছুই জানতাম না।"

সে কথার কোনো জবাব না-দিয়ে আমার সাবধান বাণী শুনিয়ে দিলাম, "তবে আসুন। কল ইউ এ ডে।" কথা শেষ করেই টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে তন্দ্রাকে নির্দেশ দিলাম, "মিস. বাসু, পুলিশ সেণ্ট্রাল রুম, ওয়ান-ডাবল-জিরো।"

এ-পর্যন্ত তন্দ্রা কোনো কথা বলার সুযোগ পায় নি। তার পঞ্চেন্দ্রিয় আমাদের কথাবার্তার উপর ছিলো কেন্দ্রীভূত। হঠাৎ আমার নির্দেশ কানে যেতে সম্বিত ফিরে পেলো। তাড়াতাড়ি কোনো-মতে বলল, "ইয়েস স্যার।"

ললিতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিশে টেলিফোন করার নির্দেশ শোনামাত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন। টেলিফোনের দিকে তন্দ্রাকে এগোতে দেখে আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "না, না, প্লিজ পুলিশে খবর দেবেন না। আই থ্রো মাইসেলফ আপন ইয়োর মারসি।"

তন্দ্রা দ্বিধান্বিত হয়ে থেমে গেলো। মেনন দম্পতি তখনো দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ললিতার আচরণ, শুনছিলেন তাঁর আর্তকণ্ঠের অনুনয়। তাঁদের মুখ সাদা, রক্তহীন। চোখের ইশারায় তন্দ্রাকে টেলিফোন করতে মানা করে মেননকে বললাম, "কি হলো জার্ণালিস্ট সাহেব! স্ট্রাক ডামব ইট? হোয়াই নট প্লে গ্যালেণ্ট অ্যাণ্ড কাম টু দি রেসকিউ অফ দি লেডি ইন ডিস্ট্রেস?"

তন্দ্রাকে ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ যমুনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ললিতা। দু'হাত ধরে অনুনয় জানালেন, "প্লিজ, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। দেরী করো না। গাড়ীতে গিয়ে বসো।"

যমুনার মুখে কোনো কথা এলো না। ললিতার দিকে একটি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, মেনন দম্পতি বিনাবাক্যব্যয়ে ধীরগতিতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। খোলা দরজা দিয়ে কানে এলো খদ্দেরদের কোলাহল। তাদের ঠাণ্ডা করার দায় ওসমানের; সে সহস্র প্রশ্নের সম্মুখীন। ওসমান ঘোষণা করলো, ভদ্রমহিলা চুরির দায়ে ধরা পড়েছেন এবং পুলিশ আসছে। পুলিশের নাম শোনা মাত্র, জনতার মধ্যে নেমে এলো স্তব্ধতা, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীড় হালকা হয়ে গেলো। ওসমান বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলো, যেন পুলিশের অপেক্ষায়।

ললিতার উপর আমার রুদ্ধ ক্রোধ কিন্তু তখনো শান্ত হয় নি। কোনো কথা না-বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে ধুমপানের পর, চোখ মেলে তাকাতে, ললিতাকে টেবিলের বিপরীত দিকে তেমনি

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মাথা এতোই নীচু যে থুতনি বুকের উপর অংশে এসে ঠেকেছে। মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। পরনের মূল্যবান মুর্শিদাবাদের ছাপা সিল্ক শাড়ী আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তাঁর সর্বাঙ্গ। দেখা যাচ্ছে কেবল ব্যাগ ধরা দুটি হাত। ভয়ে একেবারে জড়সড়। পিতা যাঁর ধনকুবের এবং স্বামী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, তাঁর এ ভূমিকার তাৎপর্য সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। জাগতিক কার্যকারণ-সূত্রে একে যেন ধরা যায় না। তবু এর একটা কারণ তো আছেই। যদি বলি লোভ সামলাতে না পারাই এর কারণ, তবে যা জটিল তাকে অতি সরল ক'রে দেখানো হয়। আমি মনস্তাত্ত্বিক নই। মানুষের মনের গভীরে যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সেখানে প্রবেশের কোনো পথ-দেখানো বাতি আমার হাতে নেই। যেটা আমাকে আঘাত করলো সেটা হচ্ছে ললিতার হীন চাতুরী, তাঁর অপরাধ গোপনের অপপ্রয়াস। তাঁর এই আচরণকে কোনোমতেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারলাম না। ললিতা কেবল শপ-লিফটিং অস্বীকার করেন নি, যা আরো গুরুতর, তিনি সকলের চোখে ধূলো দিয়ে, নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে গিয়ে অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর প্রতিশোধের আস্ফালন থেকে বোঝা যায়, পারলে তন্দ্রাকে ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করাতেও দ্বিধা করতেন না। অন্যের ক্ষেত্রে এ এ আস্ফালন কিভাবে গ্রহণ করতাম বলা কঠিন। কিন্তু ললিতা ধনকুবের-কন্যা, ব্যারিষ্টারের পত্নী, সমাজ-শিরোমণিদের অন্যতমা। শেষ পর্যন্ত ক্লোকরুমে যদি ধরা না পড়তেন, তাহলে অপরাধী হিসেবে আমাদেরও বিনা-দ্বিধায় উপস্থিত করাতেন আসামীর কাঠগড়ায়। পরিণতিতে শিল্প কেন্দ্রের সুনাম হতো নষ্ট, আমাদের অদৃষ্টে অপরাধের দণ্ডভোগ তো ছিলোই। সেই সঙ্গে জার্ণালিস্ট আর. কে. মেননের তাল-ঠোকা যেন গোদের উপর বিষফোড়া। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। এ-সব কথা মনে হতে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। ললিতাকে রেহাই দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শী মাস্ট ক্যাচ ইউ। তাঁর নীচ মনোবৃত্তি এবং হীন প্রয়াসের

জন্য আইনে শাস্তির ব্যবস্থা নেই; কিন্তু শপ-লিফটিংয়ের জন্য তো ইণ্ডিয়ান পিনল কোড আছে। সেই আইনের হাতেই তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে, না-হলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হবে না। মনে মনে এ-টুকু এঁচে নিয়ে আমার উপক্রমণিকা শুরু করলাম, "আপনি তো একটু আগে আপনার স্বামী এবং পুলিশকে ডেকে পাঠাবেন বলেছিলেন! সে-কাজটা এখন আমাকেই করতে হচ্ছে। আশাকরি এর অর্থ জানেন? প্রথমে পুলিশ আসবে, তারপর ব্যারিষ্টার সাহেবকে খবর দিলে, নিশ্চয়ই তিনি হাজত থেকে আপনাকে জামিনে মুক্ত করিয়ে আনবেন। সংবাদপত্রগুলো কয়েকদিনের মতো কাদাঘাটার বিষয়বস্তু পেয়ে যাবে, আর তাদের মারফৎ জনসাধারণ পাবে একটি মুখরোচক কাহিনী। এ্যাট ইয়োর কস্ট্, ইয়েস, বাট ইউ হ্যাড আসকড্ ফর ইট অল।"

টেলিফোনের রিসিভার তোলামাত্র, ললিতা বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো দু'হাতে টেলিফোন চেপে ধরে মিনতি জানালেন, "প্লিজ পুলিশকে খবর দেবেন না।" ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে বুকের মধ্যে টেলিফোন চেপে ধরলেন, আর আশ্চর্য, জলের ধারা প্লাবনের উদ্বেল গতিতে ঝরে পড়লো তাঁর দু'চোখ দিয়ে। থর থর করে কাঁপছে তাঁর সারা শরীর। মনে হলো তিনি কী যেন বলতে চান, কিন্তু তাঁর ঠোঁট দুটোই শুধু নড়লো, শব্দস্ফুট হলো না।

কিন্তু ললিতার চোখের জল আমার মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করলো না। আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল। তন্দ্রাকে বললাম, "ওঁকে টেলিফোনের কাছ থেকে সরিয়ে নাও।"

কাজটা সহজ নয়। তন্দ্রা ভারী নরম মনের মেয়ে। ইতিমধ্যেই তার মন করুণারসে ভিজে গেছে। ললিতা আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় কৃতসংকল্প। তিনি অস্ফুটস্বরে যা বললেন তার অর্থ, লোক জানাজানি হলে তাঁকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হতে পারে। মনে হলো তিনি যেন বেশ হিস্টিরিক হয়ে পড়েছেন। এবার আমাকে থমকে যেতে হলো। আর একবার ভেবে দেখতে হবে।

রিসিভার টেবিলের উপর রেখে, আবার একটি সিগারেট ধরিয়ে

চেয়ারে হেলান দিলাম। সাবধানে দু'হাতে ধরে ললিতাকে ধীরে ধীরে সরিয়ে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালো তন্দ্রা। টেবিলের উপর নিজের দু'বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ললিতা বসে রইলেন।

তখন আর তিনি কাঁদছেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা খিঁচুনীর মতো কেঁপে উঠছে সারা শরীর। বেশ কিছু সময় পরে তিনি যখন মুখ তুললেন, দেখলাম চোখের জলে ধুয়ে গেছে পুরু কাজলরেখা। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে কাজলের কালিমা। মনে হলো ললিতা কেবল ভীত নয়। কৃতকর্মের জন্য হয়তো অনুতপ্ত। কিন্তু এ-কথা কি সঠিক-ভাবে, বলা যায়! ধরা-পড়া মহিলাদের চোখের জল, কাকুতি-মিনতি দেখতে আমি অভ্যস্ত। তাই একে চেঞ্জ অফ হার্ট মনে করতে দ্বিধা জাগে। বিশেষতঃ ললিতার বিরুদ্ধে আমি দস্তুর মতো প্রেজুডাইসড হয়ে পড়েছিলাম। কোনো ভদ্রমহিলার প্রতি রুক্ষ মনোভাব আমার স্বভাব থেকে বহু যোজন দূরে, বলা যায় দুই মেরুর মধ্যবর্তী এই দূরত্ব। কিন্তু ললিতা আমাকে করে তুলেছিলেন পাষাণ-কঠিন ; আমার মধ্যে শিভলরির ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট ছিলো না। তাই ললিতা যখন হঠাৎ মাথাতুলে করজোড়ে কাঁপা-গলায় আবেদন জানালেন, "আমাকে একটা চান্স দিন অন্তত ;" তখন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, "অসম্ভব। আপনি চুরি করে যদি ক্ষান্ত হতেন, তাহলে হয়তো আপনার আবেদন বিচার করতাম। কিন্তু আপনি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আমার নিরপরাধ কর্তব্যপরায়ণ সহকর্মীদের চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। আপনার মুখ চেয়ে ব্যাপারটা চাপা দিলে, তাদের প্রতি অবিচার করা হয় না কি? আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিসেস গুপ্তা, কিন্তু আই হিয়ার রিয়ালি নো আদার অলটারনেটিভ।"

ললিতা প্রায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এলো, কিন্তু এবার তা আর গাল বেয়ে নীচে নেমে এলো না। যেন কান্নার উৎসও শুকিয়ে গেছে। আমি একটু নড়ে-চড়ে বসলাম। এ-মেলোড্রামার এখানেই যবনিকাপাত করতে হবে। হঠাৎ উঠে এসে ললিতা আমার হাত ধরে বললেন, "আপনার কোনো কথার প্রতিবাদ জানাবো এমন

বিশ্বাসযোগ্যতা নিজের দোষে হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আপনি যা করতে যাচ্ছেন, তাতে যে আমার বাঁচার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। আমাকে বেঁচে থাকার কেবল একটিমাত্র সুযোগ দেবেন না? খুনের আসামীকেও তো অনেক সময় ক্ষমা করা হয়।"

হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, "ক্ষমা! ধরা পড়ে ওরকম ক্ষমাভিক্ষা সকলেই করেন, মিসেস গুপ্তা। কিন্তু ঘটনার স্রোত আপনার অনুকূলে গেলে আপনি কি করতেন? সেখানেও কি উপস্থিত হতো না অনেকের জীবন-মরণের সমস্যা? সেখানেও থাকতো একটা কোর্ট-সীন, যেখান থেকে আপনি ফিরে যেতেন গোলাপ ছড়ানো পথে। আপনার পক্ষে ইটস রোজেস্, রোজেস্ অল্ দ্য ওয়ে। কিন্তু এর আর একটা দিক থাকতো। এদিকে যতো আলো, ওদিকে ততো অন্ধকার। না, মিসেস গুপ্তা, আমাকে আর কোনো অনুরোধ করবেন না।"

ললিতা আর কোনো কথা বললেন না। ফাঁসির আসামীর মতো থমথমে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার পুলিশে খবর দিলেই আমার এই অপ্রীতিকর কাজটুকু শেষ হয়। কিন্তু তখনো অনেক কিছুই জানতাম না। কাজ আমার শেষ হলো না। বরং সেদিনকার কাজের যেটা সব থেকে উল্লেখযোগ্য পর্যায় তা এখান থেকেই হলো শুরু। ললিতাকে শুনিয়ে দিলাম আমার বিধান, কিন্তু দৈবের বিধান তখনো যে আমার শোনা বাকী!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ললিতা এবার তন্দ্রাকে বললেন, "আপনাদের অনুমানে কোনো ত্রুটি নেই মিস বাসু। যদি ক্লোকরুমে ধরা না-পড়তাম, তাহলে আপনাদের নিশ্চয়ই ক্ষতি করতাম। কিন্তু ঈশ্বর আমার শঠতা ক্ষমা করলেন না। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলাম মিঃ সরকারের কাছে। আমার সব অহঙ্কার, সব দম্ভ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, মিস বাসু।" বলতে বলতে ললিতা তন্দ্রার পায়ের কাছে ঝপাং করে বসে পড়লেন।

পায়ের কাছে মাটিতে বসা ললিতার মুখ ঝাপসা হয়ে গেলো তন্দ্রার চোখে। কানে বাজতে লাগলো ললিতার মিনতি। এভাবে কতোক্ষণ তন্দ্রা স্থির হয়ে বসেছিলো জানে না। হঠাৎ ললিতার কণ্ঠস্বর কানে যেতে জেগে উঠলো। দেখতে পেলো ললিতার সজল চোখ প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে ফেরানো। ললিতা হয়তো কিছু বলেছিলেন কিন্তু তন্দ্রা কিছু শোনে নি। আর, শোনবার ছিলোই বা কী! সে আলতো-ভাবে নিজের দু'হাতের মধ্যে ললিতার মুখ ধরে নীচু হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। আগ্রহভরে কি যেন অনুসন্ধান করছে। তারপর হাত সরিয়ে ধীর গতিতে আমার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো। তখনো মাটিতে বসা ললিতার দৃষ্টি তন্দ্রার দিকেই ফেরানো। হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে এলো তন্দ্রার কণ্ঠস্বর, "আমার কিছু করার নেই, মিসেস গুপ্তা।"

দেখতে পেলাম না তন্দ্রার মুখের অভিব্যক্তি। কেবল শুনতে পেলাম তার আবেগভরা আর্দ্র কণ্ঠস্বর। আমার দৃষ্টি এড়াবার জন্যই বোধহয় চেয়ারের পিছনে নিয়েছে আশ্রয়। তাই আর ফিরে তাকালাম না। তন্দ্রার ব্যবহার এবং তার কণ্ঠস্বর আমাকে অবাক করে দিলো। ললিতাকে ক্ষমা করছে তন্দ্রা! যাঁর হাতে সহ্য করেছে অমানুষিক নির্যাতন, যিনি তাকে কারাগারের অন্তরালে ঠেলে দিতে উদ্যত হয়ে-ছিলেন। বিনা-দ্বিধায় ক্ষমা করলো তাঁকে তন্দ্রা! কিন্তু তন্দ্রার ব্যবহার এবং কণ্ঠস্বরের অন্তর্নিহিত সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বোধগম্য হলো না ললিতার। বুঝতে পারলেন না তাঁর চোখে কিসের অনুসন্ধান করছিলো তন্দ্রা। তন্দ্রার দূরে সরে যাওয়ার ফলে ললিতার মনে দেখা দিলো বিপরীত প্রতিক্রিয়া। তন্দ্রার ব্যবহার এবং বক্তব্য বিশ্লেষণ্ করার মতো মানসিক শক্তি অবশিষ্ট ছিলো না তাঁর মনে। ভাবলেন, ক্ষমার অযোগ্যা তিনি। এই প্রথম তাঁর মধ্যে দেখলাম একটা আত্মবিলাপী নিস্পৃহতা। তাঁর মন যেন দূরদূরান্তরে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়ালেন। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। খেয়াল নেই তাঁর শাড়ীর আঁচল স্থানচ্যুত হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। কামরার মধ্যে শুরু করলেন

পদচারণা। তন্দ্রা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে শাড়ীর আঁচল যথাস্থানে তুলে দিয়ে, আঁচলের একটি প্রান্ত গুঁজে দিলো ললিতার কোমরে। তারপর একরকম জোর করে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, টেবিলে-রাখা গ্লাসের জল খাইয়ে দিলো। এক নিঃশ্বাসে সবটুকু জল শেষ করে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এবার তাঁকে যেন কিছুটা আত্মস্থ মনে হলো। তাঁর মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় দিলাম। পুলিশ ডাকার আগে তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর এক সময় দৃষ্টি ফিরিয়ে একটি হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শান্ত-কণ্ঠে ললিতা বললেন, "আপনাদের সিদ্ধান্ত আমি মাথা পেতে নিলাম। আমি তৈরী। দিন, আমাকে পুলিশের হাতেই তুলেই দিন।"

কিন্তু বললে কি হয়, বোঝা গেলো মনকে তিনি তৈরী করতে পারেন নি। থর থর করে কাঁপতে লাগলো তাঁর ঠোঁট। বিশ্বাস-ঘাতকতা করলো মুখমণ্ডলের পেশীগুলি। হঠাৎ যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, "আমার মিন্টু, আমার বাবু! আমার বাচ্চাদের কি হবে! ত্যদের মাথায় অকারণে সারাজীবনের জন্যে তুলে দিলাম কলঙ্কের বোঝা। তাদের কাছে কোনো দিনই আর এ-পোড়ামুখ দেখাতে পারবো না। আমাকে সরে যেতে হবে।"

ললিতার কথাগুলি কানে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। জানতাম না ললিতা দুটি সন্তানের জননী। অন্তরে অনুভব করতে লাগলাম প্রবল অস্বস্তি। কানের মধ্যে ক্রমান্বয়ে দামামার মতো বাজতে লাগলো ললিতার কণ্ঠস্বর, "আমার বাচ্চাদের কি হবে?" কিন্তু এর জবাবদিহির দায়িত্ব কি আমার? স্থির হয়ে আর বসে থাকতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে উঠলাম; আর তারপরই কামরার মধ্যে শুরু হলো আমার অস্থির পদচারণা। মনের মধ্যে দেখা দিলো প্রবল দ্বন্দ্বের পোলা-রাইজেশন—দুই মেরুতে বিভজিত হয়ে গেলো চিন্তাধারা। একপ্রান্তে সন্ত অপরাধের ছাপলাগা ললিতা, অন্যপ্রান্তে নিষ্পাপ কোমল দুটি শিশু। একদিকে আইন কানুন কর্তব্য, অন্যদিকে মানবিক

ব্যবহারের দাবী। এই দুই মেরুকে মেলাই কী করে! এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে, ললিতা যেন এক নূতন আলোয় ধরা দিলেন আমার কাছে। এ-ললিতা নন চুরির কলঙ্কে লাঞ্ছিতা কপট ছলনাময়ী। সন্তানের বিপদাশংকায় ব্যাকুল জননীর আর্জি নিয়ে দাঁড়ানো এই ললিতার উদ্দেশ্যে কোনো পরুষভাষণ চলে না, বিদ্রূপবাণী স্তব্ধ হয়ে যায়। তাঁর প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে আমাকে নয়। কামরার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় জানলার নিকটবর্তী হয়ে বাইরের দিকে তাকালাম।

আর, সেই সময় দেখতে পেলাম একটি দৃশ্য, যা অন্য সময়ে হয়তো আমার নজরে পড়তো না। দূরে—বহুদূরে শীতের শেষে বসন্তের নীল আকাশের গায়ে অলসগতিতে ভেসে চলেছে একঝাঁক পাখী। কামরার লাগোয়া শিল্পকেন্দ্রের অনতিদীর্ঘ মালঞ্চের দিকেও একবার তাকালাম। সযত্নে রক্ষিত মালঞ্চটি যে কতো সুন্দর এর আগে সে-কথা কোনোদিন মনে আসেনি। ছোটোবড়ো গাছগুলি বসন্তের নতুন সবুজ পাতায় এবং রঙবেরঙের ফুলে পরিপাটি সাজানো। শুনতে পেলাম নব-জীবনের জয়গান। ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম যে মালঞ্চের এই নবরূপ কোনোদিন চোখ মেলে দেখিনি। কে যেন কবির ভাষায় বলছে ঃ

> 'দেখনি কি শীতের শেষে যেমনি আসে বসন্ত,
> ফুলে এবং পাতায় কানন পরে নূতন বসন তো!'

কাছের জিনিসও যে কতো দূরে, সে কথা এমন করে আর কোনোদিন উপলব্ধি করিনি। ছাত্রজীবনে পড়া দু-একটা ইংরিজি-বাংলা কবিতা পর পর মনে পড়ে গেলো। মনে পড়লো বিশ্বকবির সেই অবিস্মরণীয় পংক্তি ঃ

> 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,
> ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
> একটি ধানের শীষের উপরে
> একটি শিশির বিন্দু।'

সেই সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর :

'The World is too much with us, early or late,

We lay waste our Power......'.

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে দেখা দিলো একটি সলজ্জ স্বীকৃতি : তুনিয়া-দারীর কারাগারে আটকা পড়েই দেখার চোখ হারিয়ে ফেলেছি। এখানে যে লোকসান হলো তার হিসেবটা কোন জাবদা-খাতায় তোলা হবে ?

ইতিমধ্যে ললিতার যে প্রশ্নটি দামামার প্রচণ্ড আওয়াজের মতো কানে বাজছিলো, তা কখন থেমে গেছে জানতে পারি নি। ভুলে গেলাম কামরার মধ্যে ললিতা এবং তন্দ্রার অবস্থিতি। মনে হলো না, বৃথা সময় নষ্ট করে কর্তব্য-পালনে করছি গাফিলতি। ললিতাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া তখনও বাকী। আপন মনে উপভোগ করতে লাগলাম মালঞ্চের চোখ-জুড়োনো, মন-মাতানো অপূর্ব শোভা।

হঠাৎ যেন ফুলবনের মধ্যে তুটি শিশুকে লুকোচুরি খেলতে দেখলাম। বড়োটি মেয়ে, যে তার অনুসরণরত ছোট্টো ভাইয়ের নাগাল থেকে বারে বারে নিজেকে লুকিয়ে ফেলছে। আমাকে কে যেন বলে দিলো, এরাই ললিতার মিনু আর বাবু। আমি সিদ্ধপুরুষ নই, আমার তৃতীয় নেত্র খোলা নয়, অতীন্দ্রিয় দর্শন কি করে হবে ? বুঝলাম এ সমস্তই উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কারসাজি। কিন্তু একটা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসলো। এই শিশু তুটি এখন তো নিশ্চিন্তভাবে খেলা করছে, কিন্তু আর একটু পরে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে, তখন তারা কি তাদের মাকে খুঁজবে না ? তখন তাদের ব্যাকুল জিজ্ঞাস্যার কী উত্তর দেবেন তাদের বাবা ? তাদের এই জিজ্ঞাসাই যেন দূরের অন্ধকার থেকে ভেসে আসতে শুনলাম। এ-প্রশ্ন যেন আমাকেও। এর উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব যেন আমারও। একটা শিরশিরে ভয়ে আমার মনের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। মিনু আর বাবুকে ঘিরে যে কালো অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কি গ্রাস করে নেবে তাদের ? অন্ধকারের গ্রাস থেকে তাড়াতাড়ি

তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে যেতেই হোঁচট খেলাম টেবিলের গায়ে। মুখ তুলে দেখি তন্দ্রার চোখে প্রহেলিকার ঝিকিমিকি। ললিতা তখনো তন্দ্রার হাতের উপর কপাল রেখে চিত্রার্পিতের মতো পড়ে আছে। ততক্ষণে স্থির করে ফেলেছি মিন্নু ও বাবুকে বাঁচাতেই হবে। কখন যেন নিজের অজান্তেই তাদের ভালোবেসে ফেলেছি।

আমার চিন্তাধারা উজানে বইতে লাগলো। মুহূর্তে ভুলে গেলাম আইন-কানুনের প্রশ্ন, ভুলে গেলাম বিচার-অবিচারের কথা, মনে এলো না দায়িত্ব-দায়িত্বহীনতার সমস্যা। মায়ের অপরাধে নিষ্পাপ দুটি শিশুর মাথায় আজীবনের জন্য কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারি না। আমি পুলিশ বিভাগের অধিকর্তা নই, নই আইনের মর্যাদা-রক্ষায় সমর্পিতপ্রাণ বিচারক। এভিডেনস্ অন্ রেকর্ড-এর উপর নির্ভর করে চোখ বুঁজে বিধান দিতে পারি না। মনুষ্যত্বের ডাক শুনতে পেয়েছি, তার নির্দেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ধীরে ধীরে চেয়ারে ফিরে এসে তন্দ্রার দিকে হাসিমুখে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। তন্দ্রার চোখে প্রহেলিকা তখনও মিলিয়ে যায় নি। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললাম, "দেখি কি করা যায়।"

ললিতার আধ-বোজা চোখের দিকে চেয়ে এই প্রথম আমার মন বেদনায় ভরে উঠলো। মিন্নু ও বাবুকে অন্ধকারের গ্রাস থেকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত তো নিয়েই ছিলাম। এখন মনে হলো, ললিতার যত দোষই থাক, সে-অনুপাতে কম শাস্তি তো পেলেন না। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত স্নেহশীল কণ্ঠে বললাম, "মিসেস গুপ্তা, কিছুই হবে না আপনার মিন্নু-বাবুর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মিন্নু-বাবুর মা ফিরে যাবেন তাদের কাছে।"

শোনামাত্র ললিতার অশ্রুসিক্ত চোখে ফুটে উঠলো পরম বিস্ময়। মনে হলো বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের কানকে। নিতান্ত ভয়ে ভয়ে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি বললেন?"

"আপনি ঠিকই শুনেছেন, মিসেস গুপ্তা। কোনো ক্ষতি হবে না আপনার মিন্নু-বাবুর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি বাড়ি ফিরে

যাবেন। আচ্ছা, বলুন দেখি আপনার বাড়ির টেলিফোন নম্বর? এখনি তাদের সঙ্গে আপনার কথা বলিয়ে দিচ্ছি।”

টেবিলের উপর দু'হাত রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ললিতা। তাঁর চোখের জল বাধা মানলো না। বাধাও দিলাম না। ধুয়ে যাক মনের মলিনতা। জেগে উঠুক একজন নতুন মানুষ! তন্দ্রার চোখও জলে ভেজা, কিন্তু ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে হাসি। এই হাসি-কান্নার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করার সময় ছিলো না সেই মুহূর্তে। অনেক কাজ তখনো বাকী। ললিতাকে বললাম, “আর কান্নাব কি আছে? যে কোনো সময় ছেড়ে দেওয়া পাখীর মতো উড়ে যেতে পারেন বাচ্চাদের কাছে। তবে একটি শর্ত আছে।”

ললিতা মাথা-নীচু করে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, “বলুন আপনার শর্ত।”

শর্তের কথা শুনে আবার যেন একটু ভয় পেয়েছেন মনে হলো। তাড়াতাড়ি বললাম, “চিন্তিত হবার মতো কিছু নয়। সংক্ষেপে লিখে দিন আপনার কৃতকর্মের একটি স্বীকারোক্তি। আপনি বুদ্ধিমতী, কারণ বুঝিয়ে বলার নিশ্চয়ই দরকার হবে না। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মিস বাসু আর আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানতে পারবে না এ-কথা।”

“বেশ তাই হোক। আপনাদের করুণা. মহানুভবতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারবো না।”

তারপর প্রয়োজনীয় সব কাজ শেষ করে তিনজনে স্থির হয়ে বসলাম। টেবিলের এদিকে নিজ-আসনে আমি, বিপরীত দিকে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে ললিতা এবং তন্দ্রা। সকলের মুখে মানসিক শিথিলতা সুস্পষ্ট। ললিতার দিকে তাকিয়ে বললাম, “আমার একটি প্রশ্ন আছে, মিসেস গুপ্তা। কৌতূহলও বলতে পারেন। মিস বাসু আপনাকে সার্চ করেও জিনিসটি উদ্ধার করতে পারলো না কেন? কি ভাবে আপনি ওর চোখে ধুলো দিলেন?”

লজ্জায় ললিতার সারা মুখে লাল রং ছড়িয়ে পড়লো। মাথা

নীচু করে কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর তন্দ্রার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তার দু'হাত ধরে বললেন, "ট্রাইরুমে আপনি যখন আমাকে নিয়ে গেলেন, তখন ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। কেন জানেন? কারণ, জানতাম সার্চ করলেই ধরা পড়ে যাবো। তখনই ঠিক করে ফেললাম কোনোমতেই সার্চ করতে দেবো না আপনাকে। তাই ট্রাইরুমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলাম, যার ফলে আপনার মানসিক অবস্থা একেবারে অকেজো হয়ে গেলো। আপনি সম্পূর্ণ হাই-প্রোটাইজড। ফলে আমাকে আর সার্চ করতে পারলেন না।"

মাথা নেড়ে ললিতা ক্ষণিকের জন্য থামলেন। তন্দ্রার চোখে ভেসে উঠলো ট্রাইরুমের দৃশ্য, আর শুনতে পেলো ললিতার কণ্ঠস্বর, "আপনি ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখুন কোথাও কিছু লুকোনো আছে কি না।" পরক্ষণেই ললিতার অকপট স্বীকারোক্তি শুরু হলো, "আপনি জানতেও পারলেন না, মিস বাসু, যে আমার পেটিকোটের তলায় ইলাস্টিকের অ্যাবডোমিন্যাল বেল্ট বাঁধা আছে। আপনাদের অসাবধানতার ফাঁকে পরিপাটি ভাঁজকরা জিনিসটি মুহূর্তে পুরে দিয়েছিলাম বেল্টের নীচে। পেটিকোটের ওপর থেকে আপনি জিনিসটিকে দেখতে পান নি। এমনটাই আমি আশা করেছিলাম। এটা কিন্তু সারাক্ষণই আমার কাছে ছিলো। সত্যিই আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আপনি ট্রাইরুমে আমাকে বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে আমার বড়বেশী অহঙ্কার। বুদ্ধির খেলায় মাতলাম। আমার মধ্যে যে একটি লুকোনো অভিনেত্রী আছে, সে-ও যেন সুড়সুড়ি পেয়ে জেগে উঠলো। মানুষ এ-ভাবেই ভুল করে। আমি······"

নিদারুণ অনুশোচনায় কেঁপে স্তব্ধ হলো ললিতার কণ্ঠস্বর। একটু বিরতি। তারপর আবার বললেন, "আমি তখন মানুষ ছিলাম না, মিস বাসু। আমার দম্ভ, আমার অহঙ্কার, তখন আমাকে একটি হিংস্র পশুতে পরিণত করেছিলো। কি করেছি, কি বলেছি, সব এখন আমার মনে আসছে। কতো নীচে যে নেমে গিয়েছিলাম!"

তন্দ্রা কোনো উত্তর দিতে পারলো না। দু'হাতে ললিতাকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে। তন্দ্রা মেয়ে বলেই বোধহয় ললিতাকে বুঝতে পেরেছে আমার থেকে বেশী। তবুও বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। সসম্ভ্রমে তাকিয়ে রইলাম তার ক্ষমা-উজ্জ্বল মূর্তির দিকে।

কামরার মধ্যে অখণ্ড স্তব্ধতা। উপাসনাগৃহের মতো নিটোল আর পবিত্র। এই নির্মল, শান্ত স্তব্ধতার বিরল মুহূর্তটিকে ভেঙ্গে দিতে চাইছিলো না আমার মন। কিন্তু সময় যাদের তাড়া করে ফেরে, এ বিলাসিতা তাদের সাজে না। মনে হলো অনেক সময় কেটে গেছে ললিতার ব্যাপারে। আর দেরী করা চলে না। বললাম, "অনেক দেরী হয়ে গেছে, মিসেস গুপ্তা। আপনার বাচ্চারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছে। উঠে পড়ুন, আর দেরী করা ঠিক হবে না।"

শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছে, ললিতা উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু মুখের কি অবস্থা হয়ে থাকতে পারে, সেকথা ভাববার মতো সময় তিনি পান নি। তাই পরিহাসের ছলে তন্দ্রাকে বললাম, "আয়না খুলে একবার দেখিয়ে দাও না ভদ্রমহিলাকে তাঁর শ্রীমুখখানা। একটু দেখে নেওয়া ভালো।"

কথা শেষ হওয়ামাত্র আতঙ্কিত ললিতা মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ নব্বই ডিগ্রী ঘুরে গেলেন। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে তন্দ্রার সহায়তায় প্রসাধন শেষ করে, বেরোবার জন্য তৈরী হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমার মনের আতঙ্ক গেলো না। খদ্দেরদের চোখের উপর দিয়ে ইনি হেঁটে যাবেন কি ভাবে! কিছু অহেতুক কৌতূহলী খদ্দের এখনো নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে, ললিতার বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়। তাঁকে একা দেখে সোচ্চার হয়ে উঠবে তাদের বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। ললিতার মন এখন সদ্য-মুক্তিলাভের আনন্দে বিভোর। জানি, এ-সব চিন্তা তাঁর মনে ঠাঁই পাবে না। তাঁকে প্রবেশপথ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হবে আমাকেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ হৈ-চৈ করা গলায় বললাম, "চলুন, আপনাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।"

কিন্তু তাঁর চোখ যে এখনো জবাফুলের মতো লাল। এ জবাফুলটি

লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা যায় না। মাথা নীচু করে চলাও যেন বেমানান। কিন্তু আমি আছি কি করতে? আমি যে আজ মুস্কিল-আসানের ভূমিকা নিয়েছি। বললাম, "দুটি কাজ এখনও বাকী রয়ে গেছে, মিসেস গুপ্তা। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে রঙিন চশমাটা চোখে লাগিয়ে নিন। আর শাড়ীর আঁচলটা মাথায় বেশ-কিছুটা তুলে দিয়ে কোমরে গুঁজে নিন খুঁটটা।"

এ ইঙ্গিত ললিতার বুঝতে দেরী হলো না। বিনা বাক্যব্যয়ে আমার নির্দেশ পালন করলেন তিনি। সহাস্যে বললাম, "তৈরী? এবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। সাধারণ গতিতে আমরা হাসিমুখে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাবো। ওদের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই আমরা দরজার কাছে পৌঁছে যাবো। নাউ লেট আস স্টার্ট।"

কিন্তু ললিতা নড়লেন না। আমার পক্ষে নির্দেশ দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু সে নির্দেশ পালন করা ললিতার পক্ষে কতো কঠিন তা জানি। লোকচক্ষুর সম্মুখীন হবার কথায় মনের মধ্যে দেখা দিয়েছে তাঁর আতঙ্ক, কুণ্ঠা এবং লজ্জা। রঙিন চশমার আড়ালে দেখতে পেলাম না তাঁর চোখের অবস্থা, কিন্তু মুখ থমথমে। নিজেরই কষ্ট হলো। মাথা তুলে যিনি হাঁটেন, তাঁকে আজ হাঁটতে হবে মাথা নীচু করে। যে মুখ দেখার জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব, সেই মুখ ললিতা যেন আজ লুকিয়ে রাখতে চান। দুঃখ হলো, কিন্তু রসিকতা দিয়ে সে দুঃখ ঢাকবার জন্য বললাম, "আরে, এ করেছেন কি? একেবারে অসম্ভব। এমন গোমড়া মুখ পাশে নিয়ে হাঁটতে পারবো না। ইম্‌পসিব্‌ল্। সুন্দরী মহিলার সঙ্গে হাঁটার সময় অন্যের মনে যদি ঈর্ষাই না-জাগাতে পারলাম, তাহলে জীবন আমার বরবাদ হয়ে যাবে। আপনার ঠোঁটে ফুটে উঠুক টিভির সেই মিষ্টি হাসি।"

কাজ হলো। আমার হাত-মুখ নেড়ে কথা বলার হালকা ভঙ্গী দেখে তন্দ্রা চুপ করে থাকতে পারলো না। উৎসাহিত হয়ে উঠলো আমাকে সাহায্য করার জন্য। ললিতার কাছে এসে, হাসিমুখে তাঁর চিবুকের নীচে হাত রেখে, মুখ একটু তুলে ধরতেই, ললিতার মুখে ফুটে

উঠলো সলজ্জ মিষ্টি হাসি। সে হাসির রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই, আর কোনো কথা না-বলে, কামরার বাইরে এসে হাজির হলাম আমরা।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওসমান। তার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। ওসমানকে পেরিয়ে দুজনে হাসিমুখে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললাম। কি কথা বলেছিলাম, আজ আর মনে নেই। কেবল মনে আছে ললিতার হাসির রেশ ধরে রাখার জন্য করেছিলাম নির্দোষ রসিকতা। চলতে চলতে চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেলাম, সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের চলার পথে। সকলেই নিশ্চুপ। কোনো মন্তব্য কানে এলো না। প্রবেশ পথের কাছে এসে দাঁড়ালাম। দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে বললাম, "আবার দেখা হবে, মিসেস গুপ্তা। মিনু-বাবুকে নিশ্চয়ই একদিন আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নমস্কার।"

রঙিন চশমাটা খুলে হাতে নিলেন ললিতা। দু'চোখের কোলে টলটল করছে জল। হঠাৎ নিজের হাতে আমার ডান হাত বুকের কাছে টেনে নিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বললেন, "আপনাকে আমার বলার কিছু নেই, ভাই। ক্ষমা চেয়ে আপনাকে ছোটো করতে পারবো না। যাদের মুখ চেয়ে আজ আপনি আমাকে ক্ষমা করলেন, আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আমার সেই মিনু-বাবুকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারি।"

তারপর আর কোনোদিকে না-তাকিয়ে একেবারে পথে নেমে গেলেন ললিতা। তাকিয়ে দেখি, আমার হাতের তালুতে চকচক করছে সেই পুরু কাজলটানা চোখের একবিন্দু জল।

ফেরার পথে ওসমানকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, "সাবাস ওসমান। তুমহারা জবাব নেহি। যুগ-যুগ জীও।" আমার কথা শুনে ওসমান থ'। তাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না-দিয়ে দ্রুতগতিতে ফিরে চললাম নিজের কামরার দিকে। কিন্তু তখন কি জানতাম, আমার জীবনের এক পরম বিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে সেই কামরায়!

কামরায় ঢুকতেই দেখি তন্দ্রা তখনো দাঁড়িয়ে, তার চোখে জল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "চোখে জল কেন? তোমার আবার কি হলো?"

কোনো উত্তর দিলো না তন্দ্রা। শুধু সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো প্রসন্নতার হাসিতে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে দাড়ালো আমার সামনে। ভাবলাম হলো কি আজ মেয়েটার! হঠাৎ একেবারে কাছ ঘেঁসে দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, আমার দু'গালে তার ঠোঁটের লাল লিপস্টিক-চিহ্ন এঁকে দিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলো তন্দ্রা।

আমি অবাক হয়ে তার চলার পথে তাকিয়ে রইলাম।

শেষ কোথায় কেউ নাকি বলতে পারে না। আমার এ-কাহিনী শেষ হয়েও শেষ হলো না। একটু বাকী থেকে গেলো।

উপরের ঘটনার পরে মাস ছয়েক কেটে গেলো। ঘটনাটির যে একটি শিল্পসম্মত রূপ দিতে পেরেছিলাম, তার আত্মপ্রসাদের স্বাদগন্ধ এখনো মনে লেগে আছে। মাঝে মাঝে ভাবি, ভাগ্যিস প্রথম প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ করিনি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন:

"তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের হাতে
তুলিয়া দিয়াছ তুমি… …",

কিন্তু সেই তিনিই তো আবার বলেছেন,

"তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।"

আমি বিচার করার কে? আমার নিজের মধ্যেই কতো ত্রুটি বিচ্যুতি; নিতান্ত দৈবানুগ্রহেই এখনো কোনো অতলে তলিয়ে যাইনি। এ-কথা তো মিথ্যে নয়, " বাট ফর গডস্ গ্রেস দেযার গো আই।"

ললিতার কথা আবার নতুন করে মনে আসার কারণ আছে। যে ললিতার 'কাদার পা' সেদিন দেখেছিলাম, তারই অন্যরূপ সম্প্রতি দেখে এসেছি। বাবুর জন্মদিনে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খুব খুশী হয়েছিলাম। ওঁর ছেলেমেদের সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা সেদিন প্রকাশ

করেছিলাম, কিন্তু সে কথা নয়। আধুনিক বড়লোকের বাড়ীর পার্টিতে আমন্ত্রণ আমাকে বরাবরই উৎসাহিত করে। এ-বিষয়ে আমি আমাদের শ্রেণীর বেশীর ভাগ লোকের মতো শ্রেণী-সচেতন নই। তন্দ্রার কথাই ধরা যাক। ওরও নিমন্ত্রণ হয়েছিলো কিন্তু ও কিছুতেই যাবে না। ওর ভাষায়, 'বাবা, এতো বড়োলোকের বাড়ী।' শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করি। হ্যাঁ; সর্দার প্যাটেল মার্গের উপর ললিতাদের বাড়ীটা প্রাসাদের মতোই বটে। কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি? ওদের থেকে আমরা এক-আকাশ দূরের এলাকায় বাস করি বলেই তো ও-দিকটার আকর্ষণ এতো বেশী। আমার তো মনে হয়, সেকালে ছিলো জমিদারদের জলসাঘর, আর একালে এই বড়োলোকদের পার্টি। একবার গিয়ে ঘুরে এলে মনের হাওয়া-বদল হয়, আর অভিজ্ঞতার ঝুলিটি বেশ ভরে আনা যায়।

আমি ছুৎমার্গী নই। ককটেলের পার্টিও খুশী মনেই স্বীকার করি। নিজেরও দু'এক পেগ চলে না এমন নয়, কিন্তু নেহাৎই টু কিপ কোম্পানি। এইসব আসরে ছোটো ছোটো টুকরো কথা তাদের শত মামুলীয়ানা সত্ত্বেও কিংবা হয়তো সেই কারণেই আমাকে ভারি একটা আনন্দ দেয়। সুন্দরীরা আমার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। পুরুষদের অদ্ভুত গলা, মহিলাদের সযত্নে আয়ত্ব করা হাই সোসাইটি সোপ্রানো, মাঝে মাঝে হাউই বাজির মতো ছিটকে-বেরিয়ে-আসা উচ্ছ্বাস, 'হাউ ইন্টারেসটিং', 'লাভলি', 'ইজন্‌ট্ ইট?'—এ-সব যেন দেওয়ালি-রাতের আলোর ঝরণার মতো আমার চেতনায় ঝরে পড়ে।

এবারকার বিশেষ আকর্ষণ চ্যাটার্জি সাহেব ছিলেন আমার সহযাত্রী। এয়ার ইণ্ডিয়ার বড়ো অফিসার, সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। ভারি মজার মানুষ। তাঁরই মুখে শুনেছিলাম ওঁর সহকর্মী বোপদেব ভাদুড়ীর কথা। চ্যাটার্জি বলেন, "হি ইজ দি লাস্ট ওয়ার্ড ইন ড্রিংকস্। পার্টিতে এমন স্কয়্যাল করতে কেউ পারে না। ইউ শুড সি হিম হোয়েন হি ইজ টাইট। এ রিয়্যাল সা-নি ড্রিংকার, বাই জেমিনি।"

'সা-নি' কথাটা কেমন ধাঁধাঁর মতো লাগে। বলি, "ড্রিংক করতে-

করতে খুব হাসি খুশি হয়ে ওঠেন বুঝি?" আমার 'নেভেট' চ্যাটার্জিকে বিরক্ত করে। বলে ওঠেন, "হাসিখুশি বি ড্যামনড। আপনি না মশাই একটি আস্তো লাফিং জ্যাক-এ্যাস।" বলি, "গানের সা-রে-গা-মা বোঝেন? হি ড্রিংকস্ হিমসেলফ্ ফরম সা লো নি। শেষের ধাপে একেবারে টপ-ভুজঙ্গ। কিন্তু কখনো বেহেড হন না।" ওঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে বলেন, "বোপ, ইউ আব সিওর ইউ আর নট হ্যাভিং গুয়ান কাপ টু মেনি?" উনি কৃপামিশ্রিত দৃষ্টি দিয়ে স্ত্রীকে নস্যাৎ করে দেন। "ফুঃ! আই হ্যাড জাস্ট ওয়েটেড মাই ক্লে।" বুঝুন ব্যাপার।"

বুঝলাম। 'টপ-ভুজঙ্গ' কথাটা জানতাম না। অনুমান করলাম বেহেড অবস্থার নীচের ধাপ।

থাক্, এ-সব কথা। গুপ্তা সাহেবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য গিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েদের জন্য উপহারের সঙ্গে ললিতার জন্যও নিয়েছিলাম আমার সাধ্য মতো দামী একটি সিল্কের শাড়ী, লাল কালো রঙের। সেই যে-টুকরোটি তিনি সেদিন তুলেছিলেন, তারই কাছাকাছি প্যাটার্নের। জানতাম এটা দেখে তাঁর সেদিনের স্মৃতি মনে জাগবে, কিন্তু কোনো সংকোচ হয় নি। আর এতেই ব্যাপারটা ঘটলো।

ললিতার রসবোধের উপর আমার আস্থা ছিলো বলেই ভেবেছিলাম তিনি আমার এই উপহার পেয়ে খুব খুশী হবেন। কিন্তু যা হলো, তা যেমন বিস্ময়কর, আমার পক্ষে তেমনি অস্বস্তিকর। তিনি জিনিসটা দেখেই যেন আঁতকে উঠলেন, আর ছিটকে সরে গেলেন। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিনি কি মনে করলেন, আমি ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাঁকে অপমান করলাম? আমার মুখে কোনো কথা সরছিলো না, তবু কোনোরকমে বললাম, "আমি কিছু মনে করে এটা আনি নি। শুধু ভেবেছিলাম এটা আপনার পছন্দ হবে।"

ললিতার চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। কিন্তু আশ্বস্ত হলাম, এই দেখে যে তিনি আমার উপরে রাগ করেন নি। নইলে কেন বলবেন, "দয়া করে ওকথা বলবেন না, সরকার সাহেব। আপনার উপহারকে

আমিই তো অপমান করলাম। কিন্তু দোষ আমার নয়। ধরে নিন, আমাকে মাঝে মাঝে ভূতে পায়।”

ধরে নেয়া সহজ নয়, তবু ধরে নিতে হলো। সেদিন এই অপ্রত্যাশিত আচরণের উপরে এর চেয়ে বেশী আলোকপাত হলো না। দুঃখ করার মতো কিছু খুঁজেও পেলাম না, কেবল ভাবলাম অঘটন আজো ঘটে। ললিতা রহস্যময়ী, সে কথাটাই শুধু আর একবার মনে হলো।

কয়েকদিন পর ললিতার একটি চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে একটু ব্যাখ্যার চেষ্টা ছিলো, কিন্তু এহো বাহ্য। এর কেন্দ্রে নাকি তাঁর কুমারীকালের একটি ব্যর্থ প্রণয়। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কাছে হেরে যান। সেই দর্পিতা মেয়েটিই তাঁর ঘর বয়ে বিয়ের সংবাদ জানিয়ে গিয়েছিলো। ‘সেই মুহূর্তে তার পরনে ছিলো…’। না, ললিতা এখানে একটু রহস্য রেখে দিয়েছেন। ‘অনুমান করুন মিঃ সরকার, কি রঙের শাড়ী সেটা, কি তার প্যাটার্ন?’

রহস্য, তবু রহস্য নয়। অনুমান করেছি, এ-ও জানি ভুল অনুমান করিনি। কিন্তু তার পরের কথাটি কী? ললিতার চিঠি থেকে পাচ্ছি, ‘তারপর থেকেই কী যে হলো। ওরকম বা ওর কাছাকাছি কোনো কাপড় দেখলেই, সেটা আপনা থেকেই আমার হাতে উঠে আসে। মনে করবেন না যেন, ওটা সেদিন ম্যানেজ করতে পারলে, আমি নিজে পরতাম বা অন্য কাজে লাগাতাম। আমি ওটা পুড়িয়ে ফেলতাম, হ্যাঁ; আমার মনের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যেই এ-কাজ আমাকে করতে হতো। এ-সম্বন্ধে আপনাদের সাইকোলজি কি বলে জানি না।’

সাইকোলজিতে আমার দখল যৎসামান্য, তাই সাইকোলজি অন্তত ‘আমার’ হাত-ধরা নয়। তবু কোথায় যেন পড়েছিলাম, অন্ধকারময় মধ্যযুগে পশ্চিম দেশগুলোতে ডাইনীরা নাকি কারো ক্ষতি করতে হলে, তার মূর্তি তৈরী করে, তার গায়ে আলপিন ফোটাতো। একে বলে ‘ফেটিশ’। আজকাল যে বাস পোড়ানোর মতোই বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক নেতাদের ‘এফিজি’ অর্থাৎ কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়,

এটা কি নিছক অসন্তোষ প্রকাশ করবার জন্য ? এর পিছনেও কি এই জাতীয় বদমিত ডাকিনী-তান্ত্রিক মনোভাব নেই ? এক সময় য়ুং-এর মনস্তত্ব নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছিলাম। উনি আর্কেটাইপ নিয়ে কি বলেছিলেন, আজ ভালো মনে নেই, সেদিনও তেমন একটা বুঝি নি। তবু কেমন মনে হলো ললিতা গুপ্তার কেসটি আর্কে-টাইপ্যাল।

আমি বাণিজ্য পাড়ার মানুষ, হাটুরে মানুষ। মানুষের মনের অতলে যে রহস্যালোক লুকিয়ে আছে, সেটা আমার কাছে আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর জানবার চেষ্টার মতোই অধিকারচর্চা। তবু যখন মাঝে মাঝে এ-রকম ঘটনা ঘটে, তখন আমার চিন্তাধারাকে এমন একটি অতলস্পর্শী গহ্বরের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়, যেখানে প্রবেশের পথ জানি না। যেন কোন্ অধরা মায়ালোকের যবনিকা কম্পমান হয়ে ওঠে। ভাবি, মানুষ তার সাড়ে তিন হাত শরীরের মধ্যে যে বিচিত্র বিস্ময় বহন করে চলেছে, তার সন্ধান মানুষ কবে পাবে ? কোনো দিনই কি পাবে ?
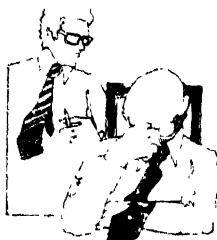
প্রত্যেক কাজেরই নাকি থাকে কিছু অকুপেশনাল হ্যাজার্ড। আমরা যারা শিল্প-কেন্দ্রে কাজ করি, তাদের বেশ কয়েকটি 'দুয়োরাণী'র সঙ্গে ঘর করতে হয়। ফরাসীরা বলে 'বাঁট নোয়ার' কালো পশু। আমার কাছে এমনি একটি কালো পশু হচ্ছে টেলিফোনের ক্রিং-ক্রিং শব্দ। সময় নেই অসময় নেই, কানের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে। তখন গ্রাহাম বেলকে মনে হয় পৃথিবীর এনিমি নম্বর ওয়ান। আমার তো মনে হয় কর্ণ যেমন জন্মেছিলেন তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে, আমিও তেমনি জন্মেছি দু'কানে দুটো টেলিফোন ঝুলিয়ে। তফাতের মধ্যে এই,—কর্ণের কবচকুণ্ডল ছিলো তাঁর প্রতিরক্ষার আশ্বাস, আর টেলিফোন যেমন কখনো-কখনো আমার জীয়ন-কাঠি, তেমনি অনেক সময় আমার মরণ-কাঠি। কতোবার যে এর কাছে মার খেয়েছি—'মরেছি হাজার মরণে।' যেমন এই সেদিন বছরের প্রথম দিনটিতে।

এবার ভনিতা ছেড়ে ঘটনাটি শুরু করি।

রাজধানীর হাড়কাঁপানো শীত। জানুয়ারী মাস। বছরের প্রথম দিন। বেলা গড়িয়ে বিকেলের কাছাকাছি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে অভিবাদন জানালাম, "নমস্কার। ভারতীয় শিল্পকেন্দ্র। নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।"

উত্তরে প্রত্যাশিত প্রাণের উত্তাপ পাওয়া গেলো না। ভাবলেশহীন

কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "নমস্কার। আমি কি মিঃ সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"সবকার বলছি।"

আগের অংশটি ছিলো ইংরেজীতে। আমার পরিচিতি সুস্পষ্ট হবার পর এবার বাংলায়, "মিঃ সরকার, আমার নববর্ষের প্রতি নমস্কার নিন। আমি ডাঃ কৃপাসিন্ধু দাশগুপ্ত, গ্রেটার কৈলাশ থেকে বলছি।"

গ্রেটার কৈলাশ থেকে ডাঃ কৃপাসিন্ধু দাশগুপ্ত! 'কৃপাসিন্ধু' নামটিতে অপরিচয়ের নূতনত্ব থাকলেও 'দাশগুপ্তজ ক্লিনিক' লেখা একটি সাইনবোর্ড হঠাৎ স্মৃতির পটে জেগে উঠলো। একটি বড়ো-রাস্তার উপর, দোতলা একটি বাড়ীর গায়ে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ডটি নেহাৎ দৈবক্রমেই পথ-চলতি আমার চোখে পড়েছিলো। বললাম, "গ্রেটার কৈলাশে আপনার কি কোনো ক্লিনিক আছে?"

"কারেক্ট।"

"বলুন ডাঃ দাশগুপ্ত, আপনার জন্যে কি করতে পারি?"

"ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন নিশ্চয়" সরাসরি উত্তর দিলেন না ডাঃ দাশগুপ্ত। হেঁয়ালী ঠেকলো। আমিও গা বাঁচানো-ভাবে বললাম, "ইচ্ছের অভাব নেই। সাধ্য হলে নিশ্চয়ই করবো। আজ বছরের প্রথম দিন। আজ আমাদের কোনো খদ্দেরের কোনো অনুরোধ সাধ্যমতো প্রত্যাখ্যান না করাই আমাদের নীতি।"

"না, না, তেমন কিছু নয়। আসল কথা কি জানেন, খদ্দের হিসেবে আমার কোনো অনুরোধই নেই। আমার ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। বলতে পারেন প্রফেসনাল।"

কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটু যেন রহস্যের আমেজ আছে। কৌতূহলী হয়ে বললাম, "বলুন কি ব্যাপার, ডাঃ দাশগুপ্ত।"

ক্ষণিকের বিরতি। তারপব তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "আপনি কি জানেন আমি একজন সাইকিয়্যাট্রিস্ট।"

জানতাম না। স্বীকার করলাম সে কথা। এবার ডাঃ দাশগুপ্ত যেন আর ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বলে উঠলেন, "মিঃ

চৌধুরী এখন আমার ক্লিনিকে। তিনি আপনার অফিস থেকে বেরিয়ে, গাড়ী চালিয়ে সোজা আমার এখানে এসেছেন। তিনি খুবই অসুস্থ। আই হ্যাভ পুট হিম আনডার সিডেটিভ।"

না-বোঝার ভান করা সম্ভব নয়। বুঝলাম তিনি শৈবাল চৌধুরীর কথা বলছেন। একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, "কিন্তু তিনি তো আমাকে তাঁর অসুস্থতার কথা কিছু বলেন নি। অবশ্যি যে ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়, তাতে তাঁকে ঠিক স্বাভাবিক মানুষ বলতে একটু অসুবিধে হয়েছে। তবু অসুস্থতার কথা কেন জানি না মনে আসেনি। সাইকিক কেস নাকি? কতোদিন আপনার চিকিৎসায় আছেন?"

মনে হলো ডাঃ দাশগুপ্ত রসিক লোক। বললেন, "না, তিনি আমার পুরোনো রোগী নন। বললাম যে আপনাদের ওখান থেকে সোজা আমার এখানে এসে পৌঁচেছেন। লাইক এ প্রপারলি অ্যাড্রেসড লেটার। আপনাদের তরফ থেকে রিমোট কন্ট্রোলের ব্যবস্থা ছিলো না তো? নইলে এই প্রথম দেখলাম একজন মানসিক রোগীকে আপনা থেকেই সাইকিয়াট্রিস্টের ক্লিনিকে ঢুকে পড়তে।"

ডাক্তারের রসিকতা কিন্তু আমার মর্মে প্রবেশ করলো না। শৈবাল চৌধুরীকে আমি অনেক কিছুই ভেবেছিলাম, কেবল এই সম্ভাবনার কথাটা একেবারেই মনে হয়নি। ভাবিনি, তিনি হয়তো নিউরসিসে ভুগছেন। চোখের উপর ভেসে উঠলো শৈবাল চৌধুরীর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চেহারাটা। দাঁড়িয়ে আছেন আমার মুখোমুখি টেবিলের বিপরীত দিকে। ধীর, গম্ভীর, সুশ্রী দীর্ঘদেহী পুরুষ। মাথায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। বয়স পঞ্চাশের আশে পাশে। এক মাথা ঘন কালো চুল, এখানে-ওখানে শাদার ছিটে ফোঁটা, বিশেষ করে কানের দু'পাশে। চোখে গাঢ় খয়েরী রঙের চশমা। খুঁটিয়ে দেখলে সুন্দর নয়; তবু কেন যে তাঁকে এক নজরে রূপবান পুরুষ বলে মনে হলো, কে জানে!

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রের ঘড়িতে দশটা বাজতেই কেন্দ্রের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হলো। দেশী, বিদেশী খদ্দেরদের

একটি বড়ো দল শিল্পকেন্দ্র খোলার অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিদিনের মতো প্রবেশ পথের একধারে দাঁড়িয়েছিলাম, প্রথম খেপে আগত খদ্দেরদের শুভেচ্ছা জানাতে। বছরের প্রথম দিন, পয়লা জানুয়ারী। আমাদের কাছে এটাই এখনো সরকারীভাবে নববর্ষ। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দনের জন্য, আর হাসিমুখে বলে চলেছি, "হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ, স্যার, কিংবা হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ ম্যাডাম।" কলের মতোই বলে চলেছি।

খদ্দেরদের প্রথম ঢেউ হালকা হতে দেখি, স্নেহলতা সিং তাঁর বিরাট ইম্পালা থেকে নামছেন। তাঁর কাছে গিয়ে স্মিতহাস্যে বললাম, "গুড মরনিং মিসেস সিং। এ্যাণ্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ।"

মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে স্নেহলতা তাঁর ধবধবে শাদা চামড়ার দস্তানায় ঢাকা ডান হাত এগিয়ে দিয়ে সামান্য ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "আপনাকেও, সরকার সাহেব।"

তাঁর হাত ধরে বললাম, "অনেকদিন আপনার দর্শন পাই নি, মিসেস সিং। কোথায় ছিলেন? কই, আপনার স্বামীকে তো দেখছি না?"

"তিনি বাড়ীতে। ইউরোপ এবং মিডিল ইষ্ট হয়ে এই তো আজকেই ভোরে আমরা তেহ্‌রান থেকে ফিরেছি। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত। গত দু সপ্তাহ যা ধকল গেছে! উদয়াস্ত কেবল মিটিং কনফারেন্স কিংবা নিগো-সিয়েশন। সেই সঙ্গে ককটেল কিংবা ডিনার। উই এণ্ট গেটিং এনি ইয়ংগার, আর উই, নাউ?"

স্নেহলতার স্বামী শিল্পপতি চন্দ্রপ্রকাশ সিং, আমদানি-রপ্তানী, বিশেষ করে রপ্তানীর ব্যবসায়ে একজন হোমরা-চোমরা লোক। চেম্বার অব কমার্সের সবাই এক ডাকে তাঁকে চেনে। ফরিদাবাদে দুটি কারখানার মালিক। ভারতে তৈরী ইনজিনিয়ারিং সামগ্রীর একটি মোটা অংশ ভারতের বাইরে রপ্তানী হয়। ব্যবসার খাতিরে চন্দ্রপ্রকাশকে প্রায়ই কাঁহা-কাঁহা মুল্লুকে পাড়ি দিতে হয়। কিন্তু স্ত্রীকে সঙ্গে না-নিয়ে তিনি এক'পা নড়েন না।

অনেকদিন আগে স্নেহলতার এই ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছিলো। তিনি বললেন, "এ-কথা যেন ভাববেন না, মিঃ সিং তাঁর স্ত্রীকে দেশ দেখাতে নিয়ে যান। বিদেশে আমাকে তাঁর কোম্পানীর বিনা-মাইনের পি. আর. ও-র কাজ করতে হয়। খাটিয়ে খাটিয়ে প্রায় আধমরা করে দেন। একটু যে শপিং করবো তারও ফুরসৎ নেই।" আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, "গুণ হৈয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। মিঃ সিংকে দোষ দিতে পারিনে। শিল্পপতির উপযুক্ত পি. আর. ও. হবার সব গুণই যে আপনার আছে।"

প্রকৃত সুন্দরী স্নেহলতা। ভারি মিষ্টি তাঁর চেহারা। সাজসজ্জায় রুচিসম্পন্না। সেদিন সকালে তাঁর পরনে ছিলো গাঢ় নীল কাঞ্চীপুরম সিল্ক শাড়ী। রঙ মেলানো দামী জামাওয়ার শাল আলতোভাবে গায়ে জড়ানো। যৌবন হয়তো অস্তাচলের পথে। যৌবনশ্রী অটুট। বিষয় পালটে বললাম, "আচ্ছা, মিসেস সিং, বছরের শেষ ক'টা দিন তো বিদেশে কাটলো। নববর্ষের প্রেজেণ্টেশনগুলি এখনো কেনা হয় নি নিশ্চয়ই?"

"কোথায় আর কেনা হলো! তাই তো আজ সাত সকালে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। মিঃ সিং গতকাল রাত্রে প্লেনে আমাকে সব নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন।"

আর-একবার মনে মনে তারিফ করলাম অভিজাত মহলের এই করিৎকর্মা মহিলাটিকে। প্রতি বছর স্নেহলতা নববর্ষের উপহার কিনতে শিল্পকেন্দ্রে হাজার কয়েক টাকা ব্যয় করে থাকেন। প্রতি-বারেই আমাদের মধ্যে একজন তাঁর সঙ্গে থাকি, তাঁর তালিকা অনুযায়ী উপহারগুলি কিনতে সাহায্য করার জন্য। অদূরে দেখলাম আমাদের সহকর্মী কল্পনা জৈন দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছে, বোধহয় স্নেহলতার সঙ্গে আমাকে এতোক্ষণ কথা বলতে দেখে। তাকে ইশারায় কাছে ডেকে বললাম, "কল্পনা, তুমি প্লিজ মিসেস সিং-এর সঙ্গে থেকে তাঁর নববর্ষের প্রেজেণ্টেশনগুলি পছন্দ করতে সাহায্য করো।"

কেন্দ্রের সকলেই স্নেহলতার পরিচিত। তাঁর মধুর ব্যবহার আর

মিষ্টি হাসি সকলের মন জয় করছে। স্নেহলতাকে অভিবাদন জানিয়ে কল্পনা বলল, "উইথ্ প্লেজার।"

"কিন্তু কাজ শেষ করে, তুমি মিসেস সিংকে আমার অফিসে নিয়ে আসতে ভুলে যেও না যেন।" তারপর স্নেহলতার দিকে ফিরে বললাম, "বছরের প্রথম দিনে আমাকে কফি অফার করার সুযোগ দেবেন না?"

কলকলিয়ে হেসে উঠে স্নেহলতা বললেন, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! চলো কল্পনা, আমরা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিই।" কল্পনার হাত ধরে কেন্দ্রের ভিতর দিকে চলে গেলেন স্নেহলতা। আমিও আর অপেক্ষা না করে অফিসের দিকে পা বাড়ালাম। ইতিমধ্যে বেলা বেশ কিছুটা গড়িয়ে গেছে।

কিন্তু অফিস-কামরায় পা-দিতেই মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াতে হলো। ওসমান এবং এক অপরিচিত ভদ্রলোককে কামরায় উপস্থিত দেখে বুঝে নিলাম এই যুগ্ম উপস্থিতির কারণ। দুয়ে দুয়ে চারের ব্যাপার। পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। ধোঁয়া দেখলেই বোঝা যায় পাহাড়ে আগুন লেগেছে। শপ-লিফটিং কেস না-হয়ে যায় না। বাইরের লোক এর মর্ম তেমন জানে না। যারা এর অর্থের সঙ্গে পরিচিত তাদের কাছেও এটা একটা বইয়ে অথবা খবরের কাগজে পড়া শব্দ: একটি ব্যতিক্রম, যার সঙ্গে যুক্ত সমাজের নীচু-স্তরের লোক অর্থাৎ রিফ-রাফ। কিন্তু আমাদের কাছে এটা মাথার উপরে ঝুলে-থাকা খড়্গের মতো সতত-উদ্যত একটা চ্যালেঞ্জ। আমার তো মনে হয়, 'দি সাইকোলজি অফ শপ-লিফটিং' একটি চমৎকার গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। ডক্টরেট-উচ্চাশী মনস্তত্ত্বের ছাত্রদের কাছে আমি এটি আগাম পেশ করে রাখলাম।

আমাদের জিনিস উইনডো ড্রেসিংয়ের মতো ছোটো ছোটো খোপে সুরক্ষিত দূরত্বে থাকে না। দর্শকদের হাতের নাগালের মধ্যে থরে থরে মেলে দেওয়া থাকে। ফুল দেখলেই যেমন কারো-কারো তুলে নেবার ইচ্ছা জাগে, তেমনি কোনো-কোনো দর্শক এদের অন্তহীন বৈচিত্র্যে

পথ হারিয়ে ফেলে,—ইচ্ছে হয় এদের মধ্যে কোনো একটিকে "হাফিজ" করে দিতে। কে জানে!

মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ভাবতে পারি নি, বছরের প্রথম দিন শুরু হবে একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একটি ক্লান্তিকর তিক্ততা এবং একঘেয়েমীর জন্য মনে মনে তৈরী হলাম। কোনো কথা না-বলে দ্রুতগতিতে এসে দাঁড়ালাম আমার চেয়ারের সামনে। টেবিলের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছেন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক ভদ্রলোক। কথা বলার আগে এক নজর দেখে নিলাম তাঁকে। ধীর, স্থির, দীর্ঘদেহী পুরুষ। এক মাথা ঘন কালো চুল, এখানে ওখানে শাদার ছিটেফোঁটা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখে গাঢ় খয়েরী রঙের মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে ধূসর দামি গরম স্যুট। কোটের বুক পকেট থেকে শাদা রুমাল এবং সোনালী কলমের মাথা উঁকি দিচ্ছে। দৃষ্টি মাটির উপর নিবদ্ধ। ভদ্রলোক চুপচাপ। পাশের শূন্য চেয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বললাম, "প্লিজ, বসুন স্যার।"

ভদ্রলোক কিন্তু বসলেন না। মুখ তুলে একবার কেবল আমার দিকে তাকালেন। চশমার কাঁচের পিছনে চোখ দুটি মনে হলো বড়ো মলিন, বিষাদাচ্ছন্ন। বসবার জন্য দ্বিতীয় অনুরোধেও তিনি সাড়া দিলেন না। ভাবটা—কে যেন কাকে কি বলছে! অথচ আমি তাঁর কথা শোনার জন্যই প্রতীক্ষা করে আছি। কিন্তু তিনি যেন মুখ খুলবেন না বলে পণ করেছেন। আমি অগত্যা ওসমানের শরণ নিলাম।

ওসমানের দায়িত্ব শিল্পকেন্দ্রে শপ-লিফটার ধরা। বিদেশের বিভাগীয় বিপণীগুলিতে ওসমানের মতো কর্মীদের বলা হয় স্টোর-ডিটেকটিভ। এ-কাজে ওসমানের যথেষ্ট সুনাম। অপরিসীম তার ধৈর্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে শপ-লিফটারদের, সকলের অজান্তে অনুসরণ করতে পারে। বঁড়শীর মাছ সুকৌশলে তুলতে জানে ডাঙ্গায়। কিন্তু তারপরই দেখা দেয় তার দুর্বলতা। শেষের দিককার নাটকীয়তায় তার বিশ্বাস নেই। কোদালকে সরাসরি কোদাল বলেই তার স্বস্তি।

এবারেও ধ্বনিত হলো তার চাছাছোলা বয়ান, "উনি ? উনি আবার কি কাজে আসবেন, স্যার! চুরি করেছেন, তাই ধরে এনেছি। পুরুষের সাজ পোষাক বিভাগ থেকে একটি টাই চুরি করে কোটের ডান দিকের পকেটে লুকিয়ে রেখেছেন।"

চুরি যে করেছেন জানাই ছিলো। তবুও ওসমানের উত্তর শুনে আমার মুখে যে বিস্ময়ের ভাব দেখা দিলো, তার পুরোটাই ভান নয়। ওসমানকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা অনাবশ্যক। এবার ভদ্রলোকের একটি স্টেটমেণ্ট-এর দরকার। তাঁকে বিনীত অনুরোধ জানালাম।

ভদ্রলোক যথাপূর্বম। তিনি বসলেন না, মুখও খুললেন না। ওসমান রেগে গেলে কাউকে রেয়াৎ করে না। আমার খাতিরদারি তার পছন্দ নয়। "আপনি না স্যার, জজ হলে ভালো করতেন। এ লাইন আপনার নয়। নইলে ওসমানের ধরে-আনা লোককে, 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলে কথা বলছেন! শুনুন তাহলে ব্যাপারটা।"

কেন্দ্রের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোককে পুরুষের সাজ পোষাক বিভাগে উপস্থিত হতে দেখলো ওসমান। 'দেখলো' বলা ঠিক হবে না। নজর-কাড়া দীর্ঘদেহী মানুষটির উপর ওসমানের দৃষ্টি আপনা-হতেই পড়ে গেলো। বিদেশী টুরিস্টদের ভীড় এখানে প্রায় সব সময়। সেদিন সকালেও ভীড় ছিলো যথেষ্ট। খদ্দেররা এদিকে-ওদিকে ঘুরে-ফিরে থরে থরে সাজানো বুশশার্ট, কোট, টাই, ড্রেসিং গাউন, স্মোকিং জ্যাকেট ইত্যাদি দেখতে ব্যস্ত। কয়েকজন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোষাক ট্রাই করছেন। বিভাগের কর্মীরা খদ্দেরদের নিয়ে হিমসিম। ওসমান নিজেকে খদ্দেরদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে অন্য সকলের মতো জিনিসপত্তর দেখায় ব্যস্ত। কিন্তু আসলে ও পালন করে চলেছে নিজের কর্তব্য। সকলের অজান্তে খদ্দেরদের উপর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার সজাগ দৃষ্টি। একসময় ওসমানের দৃষ্টি এসে স্থির হলো এই দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকের উপর। তিনি টাই দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি টাই নিজের কোটের পকেটে

পুরে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে সরে গেলেন বিরাট আয়নার সামনে। ওসমান লক্ষ্য করলো ভদ্রলোক একদৃষ্টিতে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। একবার পকেট থেকে রুমাল বের করে, চশমা খুলে চোখমুখ মুছে নিলেন। এইভাবে কয়েক মিনিট কাটাবার পর তিনি ধীরপায়ে পুরুষের সাজ-পোষাক বিভাগ থেকে সরে গিয়ে এগিয়ে চললেন কেন্দ্রের প্রবেশপথের দিকে। ওসমান এক মুহূর্তও ভদ্রলোককে তার দৃষ্টির আড়ালে যেতে দেয়নি। পিছু পিছু ধাওয়া করে চলেছে তাঁর অজান্তে। বেশ কিছুটা হেঁটে যাবার পর ক্ষিপ্রগতিতে সামনে এসে প্রায় তাঁর পথ আটকে বলল, "স্যার, একটু দাঁড়াবেন?"

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর দু'চারটি মামুলি কথার পরই ওসমান তাঁকে সোজা ম্যানেজার সাহেবের ঘরে নিয়ে এসেছে। ভদ্রলোকের গো-বেচারাভাবে সে একটু ক্ষিপ্ত হয়েছিলো ঠিকই, কেন্দ্রের অভ্যন্তর না-হলে, এতোক্ষণ ধৈর্য ধরে রাখা তার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। কিন্তু কেন্দ্রের চার দেওয়ালের মধ্যে খদ্দেরদের সঙ্গে কোনো সিনক্রিয়েট করা একেবারেই বারণ। সে 'স্যার'-কে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এখন তিনি জানেন আর আমি জানি।

ঘটনার নূতনত্ব কিছুই নেই। একটি শাদামাটা হাত-সাফাইয়ের কেস। যা কিছু নূতনত্ব ভদ্রলোকের দুর্বোধ্য আচরণ। তাঁর মুখে রহস্যের নীরবতা। ঘটনার বিবরণ শুনলেন 'বনা প্রতিবাদে, যেন আর কারো-কথা হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, জানুয়ারী মাসের শীতের সকালেও তাঁর কপালে স্বেদবিন্দু নিয়নের আলোতে চিক্‌চিক্ করছে। ওসমানকে ইশারা করতে দু'গ্লাস জল টেবিলের উপর রাখলো। একটি গ্লাস তুলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে বললাম, "আসুন স্যার।"

এক চুমুকে গ্লাসের জলটুকু নিঃশেষ করে ভদ্রলোক দীর্ঘ নিঃশ্বাস

ফেললেন। অনেকক্ষণ আটকে থাকা একটি দীর্ঘশ্বাস জলের চাপে যেন মুক্ত করলো নিজেকে। এবার ধীরে ধীরে চেয়ারে বসলেন, বোধহয় কথা বলার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সরাসরি প্রশ্ন করলাম, "সবই তো শুনলেন আপনি। এসব তাহলে সত্যি ?"

তিনি এতো নীচু গলায় কথা বললেন যে শোনা যায় কি না-যায়। "হ্যাঁ।" তারপর কোটের পকেট থেকে একটি র-সিল্কের টাই বের করে টেবিলের উপর রাখলেন। কিন্তু টাই সম্পর্কে কোনো কথা না-তুলে দু'একটি রুটিন মাফিক প্রশ্ন করলাম। তিনি কে, কোথায় থাকেন, স্থানীয় বাসিন্দা না বাইরে থেকে এসেছেন—এই সব। আমার প্রতিটি প্রশ্ন তাঁর নীরবতার বর্মে ঠেকে ফিরে এলো। সামান্য কঠিন সুরে বললাম, "দেখুন স্যার, সকালবেলায় আপনার জন্যে এতো সময় নষ্ট করতে পারবো না। কথা যদি না-বলেন, তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না। আপনাকে সোজা পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবো।"

ভদ্রলোকের ঠোঁটদুটি থর-থর করে কেঁপে উঠলো। কিন্তু এবারও জবাব মিললো না। প্রথম আঘাতের পর আশ্বাসের সুরে বললাম, "জানি না, আপনি কে। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারি, চুরি বলতে সাধারণত যা বোঝায়, আপনি সে-কাজ করেননি। তাছাড়া আপনি যে-সব কাপড়-চোপড পরে আছেন, তা সবই বিদেশী বলে মনে হয়। সুতরাং মনের কথা যদি অকপটে বলেন, তাহলে হয়তো আপনাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারি। পুলিশের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজন নাও হতে পারে।"

সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিলাম। একটি তুলে নিতে, জ্বলন্ত লাইটার তাঁর মুখের কাছে তুলে ধরলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে জানলার বাইরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আমিও কোনো বাধা দিলাম না। মনে হলো ধূমপানের পর তাঁর স্নায়ুর চাপ একটু কমলো। আর ইঁদুর-বেড়ালের খেলা নয়। এবার পূর্ব-স্থিরীকৃত পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। কোনো ভণিতা না-করে

যেন চরমপত্র পেশ করছি, এ-রকম একটা স্বর গলায় এনে বললাম, "আপনাকে পাঁচমিনিট সময় দিলাম স্যার, সবকিছু ভেবে দেখার জন্যে। হয় আপনাকে অকপটে সবকিছু বলতে হবে, নইলে আমি বাধ্য হবো পুলিশকে খবর দিতে।"

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমার কথাগুলি শুনলেন ভদ্রলোক। আমি প্রতীক্ষার ভঙ্গীতে চেয়ারে শরীরের ভার ছেড়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। সিগারেটের শেষ অংশ ছাইদানে রেখে, সোজা হয়ে বসে ধীরে ধীরে বললেন, "আমি তৈরী। কি জানতে চান বলুন। কিন্তু তার আগে দয়া করে আপনার লোকটিকে বাইরে যেতে বলতে পারেন না?"

সামান্য কয়েকটি কথা। কিন্তু তার নিটোল ভরাট মধুর কণ্ঠস্বর এবং ইংরিজী বচনভঙ্গী শুনে অবাক হয়ে গেলাম। যেন কোনো নামী চিত্রাভিনেতার কণ্ঠস্বর নতুন করে শুনলাম, এই চুরির-দায়ে ধরা পড়া ভদ্রলোকের গলায়। আমার ইঙ্গিতে ওসমান ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

এবার ভদ্রলোকের কেবল পরিচয় নয়, এই সামান্য একটি টাই তুলে পকেটে পুরে ফেলার রহস্য জানতেই হবে। এই জানার উপর নির্ভর করছে আমার কর্তব্য এবং তাঁর ভবিষ্যৎ। রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য যদি কোনো কারণে রূঢ় অথবা নির্দয় হতে হয়, তাহলেও পিছিয়ে যাবো না। দৃঢ়চিত্তে শুরু করলাম, "আপনি যা করেছেন, তার গুরুত্ব নিশ্চয়ই জানেন।"

"হ্যাঁ, চুরি।" আমি কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, "যে অপরাধ করেছি তাতে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ৩৮০ ধারা অনুযায়ী কারাদণ্ড আমার পাওনা। উকিলের সাহায্য আমি চাইনে।" তারপর আপনমনে কি কতকগুলো কথা যেন বিড় বিড় করে বললেন। তার মধ্যে ধরতে পারলাম শুধু তিনটি শব্দ,—"ওথেলোস অকুপেশন গন।"

শব্দের তরঙ্গ মিলিয়ে যেতে চমকে উঠলাম। তিনি ওথেলো নন, তাঁর সমস্যা একেবারেই ভিন্ন জাতের। তবু বুঝলাম তাঁর চিন্তাধারা একটি বিশেষ পথে এগোতে শুরু করেছে, আর তখনই শঙ্কিত হয়ে

উঠলাম। তৎক্ষণাৎ তাঁর চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য, উৎসাহ দেবার মতো স্বরে বলে উঠলাম, "অল ইজ নট লস্ট। ভেবে দেখতে গেলে এটা নিতান্তই একটি ছিচকে চুরি। শাস্তি হয়তো হালকাই হবে। কিন্তু কলঙ্ক এড়াবেন কি করে? সব কিছু জেনেও আপনার কি করে এমন আত্মবিস্মৃতি ঘটলো? ভুলে গেলেন স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের কথা!"

"ইট জাষ্ট হ্যাপেণ্ড। তখন আমার কিছু মনে আসে নি।"

"কিন্তু মোটিভ?"

"ব্লেসড, ইফ আই নো।"

এ যেন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। ভাঙ্গবেন তবু মচকাবেন না। একটু উষ্ণভাবে বললাম, "মিথ্যে কথা। নিশ্চয়ই জানেন, কবুল করতে চাইছেন না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ক্লেপটোম্যানিয়া একটি রোগের নাম। আমার ধারণা আপনি এই রোগে ভুগছেন। যদি শুনি এ-কাজ আগেও করেছেন, ধরা পড়েন নি, তবে আশ্চর্য হবো না।"

উনি একটু ব্যাকুলভাবে বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথাই বলছি। জীবনে এই প্রথম একাজ করলাম। কিন্তু কেন যে করলাম!" ভদ্রলোকের কথার মধ্যে যেন আন্তরিকতার স্পর্শ পেলাম। বোধহয় সবটাই অভিনয় নয়। আর মনে হলো বেঁচে থাকার সার্থকতা সম্পর্কে তাঁর বিপরীতমুখী চিন্তা বোধহয় আপাততঃ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তাঁর কৃতকর্মের কারণ জানা নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল তাঁর 'জানিনা' দিয়ে তৈরী দায়িত্ব-এড়ানো উত্তরের উপর নির্ভর করে আমার পক্ষে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেই মনস্থির করতে হবে। শপ-লিফটার মাত্রকেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ায় আমি বিশ্বাসী নই। আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারি না ঠিকই, কিন্তু অন্ধের মতো নির্বিচারে সকলকে পুলিশের হাতে তুলে দিতেও পারি না।

এবার পরিচয় জানার দাবিটা নতুন করে পেশ করলাম। তিনি উত্তর না-দিয়ে একবার যেন তাঁর দৃষ্টি দিয়ে আমাকে মেপে নিভে

চাইলেন। তারপর কোটের ভিতরের পকেট থেকে বের করলেন মিশ্‌কালো একটি চামড়ার ওয়ালেট। ওয়ালেট খুলে একটি সুন্দর ভিজিটিং কার্ড তুলে, কিছুক্ষণ আপনমনে নেড়েচেড়ে আমার সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। কার্ডে ছাপা নাম-ঠিকানা দেখে আঁতকে উঠলাম। কিন্তু তিনি ভাবলেশহীন মুখে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে বসে আছেন। যেন কাঠগড়ায় আসামী, বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা শোনার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। এবার আমার অবাক হবার পালা। কি করে বিশ্বাস করবো যে টেবিলের বিপরীত দিকে বসে আছেন,

শৈবাল চৌধুরী

চেয়ারম্যান

পাওয়ার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড?

তাঁর নাম পরিচয় আমার অজানা নয়। তিনি দেশব্যাপী বৈদ্যুতিক শক্তির সমস্যা সমাধানের কাজে, স্বয়ং ভারত সরকার কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়েছেন পাওয়ার করপোরেশনের চেয়ারম্যানের পদে। তাঁর কর্মক্ষমতা এবং সাফল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলির হেড লাইন হয়েছে অনেকবার। তাছাড়া, ইনি যদি সেই লোকই হয়ে থাকেন, তবে তো ইনিই ভারত সরকারের অনুরোধে সুপ্রসিদ্ধ একটি আন্তর্জাতিক বৈদ্যুতিক কোম্পানীর মোটা মাইনের ম্যানেজিং ডিরেকটরের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন, দেশব্যাপী বৈদ্যুতিক সমস্যা সমাধানের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য। তাঁর এই দ্বৈত ভূমিকাকে কী করে মেলাবো! দুয়ের মধ্যে যে দু'মেরু-দূরত্ব।

হঠাৎ মনে হলো, আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। কার্ডের উপর ছাপা অক্ষরগুলি আর দেখতে পাচ্ছি না। সে-জায়গায় ফুটে উঠছে অগণিত নর নারীর বাঁকা-চোরা মুখ,—কেউ-বা কাঁদছে চিৎকার করে, কেউ-বা ডুকরে ডুকরে, কেউ-বা শুধু তাকিয়ে আছে ফ্যাল-ফ্যাল করে আমার দিকে; কেউ-বা মাটিতে আছড়ে পড়ে আমার দু'পা জড়িয়ে ধরে, পাগলের মতো কাকুতি-মিনতি জানাচ্ছে। তাদের সমবেত

আর্তনাদ আর সহ্য করতে না-পেরে দু'হাতে কান চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "কেন আপনারা একাজ করেন বলতে পারেন ?"

নিজের কণ্ঠস্বরে আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটলো। চেয়ার ছেড়ে কখন উঠে দাঁড়িয়েছি জানি না। দু'হাতে কান ঢেকে কামরার ছাদের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখলাম শৈবাল চৌধুরীও বিস্মিত হয়েছেন আমার এই আকস্মিক উত্তেজনায়। কিন্তু এখনো তিনি সহযোগিতার হাত বাড়ালেন না। যেখানকার সমস্যা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

কি করে তাঁকে বোঝাই আমার মনের অবস্থা! যখন শৈবাল চৌধুরীর মতো উচ্চ শিক্ষিত, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমাজে আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিরা আমার সামনে অপরাধী হিসেবে দাঁড়ান, তখন নিজেকেই যেন অপরাধী বলে মনে হয়। তাছাড়া আবো মনে হয়, কোনোদিন আমাব পরিচিত কোনো ব্যক্তি যদি এইভাবে আমার সামনে এসে হাজিব হয়, সেদিন কি হবে, সেদিন আমি কি করবো ? একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আমাকে চেপে ধরে, মেরুদণ্ডে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি, মনে হয় এবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আর এরকম ঘটনা ঘটেও ছিলো, যেদিন ব্রিজভূষণ মালা বৌদিকে, তাঁর মেয়ে এবং পাঁচ বছরের নাতনীসমেত আমার কামরায় নিয়ে এসে হাজিব করলো। কিন্তু সে কাহিনী এখন থাক।

টক্, টক্, টক্।

দরজায় কে যেন টোকা দিলো। "কাম ইন প্লিজ।" বেয়ারা কফি রেখে গেলো। আমি দ্রুত চিন্তা করার কিছু সময় পেলাম। এক কাপ কফি শৈবাল চৌধুরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "আসুন, মিঃ চৌধুরী।"

এই প্রথম আমার মুখে বাংলা কথা শুনে, চমকে উঠে মুখ তুলে তাকিয়ে শৈবাল চৌধুরী বললেন, "আপনি বাঙ্গালী !"

"আমার নাম সোমেশ্বর সরকার। ঘরে ঢোকার সময় দরজার গায়ে আমার নেমপ্লেটটি আপনার নজর এড়িয়ে গেছে বোধ হয়। কিন্তু আপনার কার্ড না দেখলে আমি জানতেও পারতাম না যে আপনি কেবল বাঙ্গালী নন, দেশের একজন স্বনামধন্য পুরুষ।"

একটি আত্মধিক্কারসূচক অব্যয় বেরিয়ে এলো শৈবাল চৌধুরীর গলা দিয়ে। যেন আমার প্রশংসাবাক্য আসলে একটি ছদ্মবেশী বিদ্রূপের কশাঘাত। আমি তাতে কান দিলাম না, বললাম, "স্যার আপনার নাম বহুবার সংবাদপত্রে পড়েছি। কিন্তু পরিচয় হবার সুযোগ আজই প্রথম হলো। কিন্তু বরাতটা একবার দেখুন, কি অবস্থার মধ্যে সে পরিচয় হলো।"

শৈবাল চৌধুরী বিষম এক ঝাঁকুনি খেলেন যেন। এক ঝলক রক্ত নামলো মুখে। মাথা নীচু করলেন। মনে হলো শেষ কথাগুলি না-বললেই ভালো হতো। গরম কফির বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উপরের দিকে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে সুর বদলে বললাম, "আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, মিঃ চৌধুরী।" কিন্তু যাকে বললাম, তিনি তখন সামাজিকতা থেকে অনেক দূরে। তাঁর মুহূর্তপূর্বের মনোবলের তলানিটুকু মাত্র আছে। মনে মনে আবার শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। যেটুকু এগিয়ে ছিলাম, এক ঝটকায়, যেন আবার ঠিক ততটাই পিছিয়ে গেলাম।

কোনো কথা না বলে, শৈবাল চৌধুরী কফির কাপে চুমুক দিয়ে চলছেন। কাপ শূন্য হতেই সিগারেটের প্যাকেট এবং জ্বলন্ত লাইটার এগিয়ে ধরলাম। সময় দিলাম কিছুক্ষণ আপন মনে ধূমপানের। এই বিরতির সুযোগটুকু থেকে নিজেকেও বঞ্চিত করলাম না। একটি সিগারেট ধরিয়ে বার কয়েক টান দিয়ে ডানলোপিলো আঁটা রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলি যেন হঠাৎ শিথিল হয়ে গেলো।

•

কতো ঘটনাই না মনের মধ্যে যাওয়া-আসা করছিলো, কত মানুষের মুখই না চোখের উপর ভেসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিলো। দিলীপ রাজ রায়, কুমকুম চুগ, কল্যাণী আয়েঙ্গার, তপন চ্যাটার্জী, মনোরমা আগরওয়ালা, অনন্তবসন্ত ভাণ্ডারকর, কর্ণেল দীনেশ খান্না, মিঃ জাস্টিস মালিক, বেগম মাকসুদা চিস্তি।

শিল্পকেন্দ্রে যে-সব জিনিস শপ-লিফটিং হয়ে থাকে, তার মধ্যে টাই,—বিশেষ করে র-সিল্ক টাইয়ের কথা সব থেকে আগে মনে আসে। পুরুষ বিভাগে পর পর কয়েকটি রিভলভিং স্টেনলেস স্টিল স্ট্যাণ্ডে ঝুলন্ত অপরূপ ডিজাইনের, বিভিন্ন আকৃতির অগুনতি চকচকে ঝকঝকে র-সিল্ক টাইগুলি খদ্দেরদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, আর মনের মধ্যে বোধ হয় আদিম সুপ্ত লোভ ক্ষণিকের জন্য জেগে ওঠে। ফলে সেইটিই হয়ে পড়ে তার শিকার। না কি তারা মুহূর্তের জন্য চলে যায় সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে যেখানে বেসাতি বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, হাট-বাজারের সৃষ্টি হয় নি, অধিকারবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি, জিনিস-মাত্রই ঈশ্বরের, অথবা প্রকৃতির, সেটা তোমারও যেমন আমারও তেমনি। চলে যায় সেই টম টিডলারের মায়াবী ময়দানে, যেখানে জিনিস কুড়িয়ে নিলেই তোমার। জিনিসগুলো যেন ডেকে ডেকে বলতে থাকে, "নাও তো দেখি কেমন নিতে পারো।" একটি ছোটো হাতের ভঙ্গী, যা ম্যাজিকের মতো আশ্চর্য, শিল্পীর রূপটানের মতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, তার সঙ্গে কি তুলনা হয় বিল-বানানো, দাম দেওয়ার মতো মোটাদাগের কাজ! টাইয়ের বিক্রির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে না-কেনা মাল-সাবড়ি অর্থাৎ শপ-লিফটিং। তখন ওসমান, রতনলাল, প্রেমসিং, ব্রিজভূষণ রাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের শীট আংকর। তাদের বিশেষ নজর রাখতে হয় পুরুষ বিভাগের উপর। ওরা নজরের বেড়াজাল পেতে রাখে, যেন রুই-কাতলা থেকে চুনোপুঁটি কেউ পালাতে না-পারে। যে কোনো বয়সের ছেলে হোক, মেয়ে হোক, কখনো-না-কখনো ধরা পড়ে টাই-লিফটিংয়ের অপরাধে। এ-অপরাধে মেয়েদের মধ্যে টিন-এজারদের সংখ্যাই বেশী। বয়-ফ্রেণ্ডকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা এই অপকর্মটি করে বসে। কতো বিচিত্র ঘটনা, কতো করুণ কাহিনী, কতো রকমের অবিশ্বাস্য মানুষই না জড়িয়ে আছে এই অপকর্মের সাথে। ভাবলেও অবাক হয়ে যাই। এরা অনেকেই সমাজে সুপ্রসিদ্ধ, কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচুর্যের মধ্যে প্রতিপালিত! ধরা পড়লে তাদের অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করতে গিয়ে, তাদের

মানসম্ভ্রম বাঁচাতে হিমসিম খেয়ে যাই। জানি, এ-দায়িত্ব আমার নয়, অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই তো আমার গণ্য করার কথা। কিন্তু মনুষ্যত্বের দাবীকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। এটা হয়তো আমার দুর্বলতাই কিন্তু এর জন্য আমার কোনো খেদ নেই। এটা যদি পাপ হয় আমি তবে অননুতপ্ত পাপী।

ভাবতে ভাবতে মনটা কখন অতীতের আর একটি অনুরূপ ঘটনার জটিলতায় ফিরে গেলো। কালীপূজা অর্থাৎ উত্তর ভারতে দেওয়ালীর কিছুদিন আগের কথা। সেদিন ছিলো আজকের মতোই একটি সকাল। কেন্দ্র সবে খুলছে,—ওসমান তাঁকে নিয়ে হাজির হলো আমার কামরায়। ওসমানের হাতে একটি র-সিল্ক টাই এবং ভদ্রলোক তাঁর ডান হাতে ধরে আছেন আধখোলা সাপের চামড়ার একটি ওয়ালেট। কামরায় ঢুকেই ভদ্রলোক দ্রুতগতিতে টেবিলের অন্য প্রান্তে সরে গিয়ে, ওসমানের হাতে-ধরা র-সিল্ক টাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, "স্যার, এই টাইটিই আমি চুরি করেছি। এটির দাম এবং চুরির অপরাধের জন্যে যা হয় জরিমানা করে আমাকে ছেড়ে দিন,—প্লি-ই-জ।"

কথা শেষ করে, দু'হাতের একত্রিত করতলের উপর তাঁর ওয়ালেটটি রেখে, টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত, কিন্তু ওসমানের বিস্ময় দেখবার মতো। কোনো শপ-লিফটারের আমার কামরায় আসামাত্র এ-ধরনের ব্যবহার ইতিপূর্বে কখনো তার চোখে পড়েনি। এ-ধরনের অদ্ভুত প্রস্তাবও কোনোদিন শোনেনি। ভদ্রলোককে এর আগে কোনোদিন কেন্দ্রের মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়লো না, কারণ এমনই তাঁর চেহারা যা একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। কিন্তু এই চুরির ব্যাপারটা তিনি যেন বড়ো তাড়াতাড়ি শেষ করতে চান বলে মনে হলো। তাঁর এই অহেতুক তাড়া দেখে, কেমন যেন খটকা লাগলো। মনে হলো আমাকে একটু চিন্তা করারও সুযোগ দিতে চান না। তাঁর প্রস্তাবের উত্তর দেওয়া দূরের কথা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার ভদ্রতাটুকুও মনে

এলো না। একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সে-দৃষ্টি তাঁর আপাদমস্তক পরিক্রমা সেরে কেন্দ্রীভূত হলো তাঁর মুখের উপর। আসল কথা, তাঁর চেহারা আর বেশভূষার পারিপাট্য আমাকে নির্বাক করে দিয়েছিলো। চোখে সোনার ফ্রেমের অত্যাধুনিক ডিজাইনের মূল্যবান চশমা, বোধহয় এ-দেশের তৈরী নয়। গলায় চিকচিক করছে সোনার সরু চেন। মনিবন্ধে ব্ল্যাক ডায়ালের অটো-মেটিক রোলেক্স ঘড়ি। ডান হাতের অনামিকায় আংটি। পরে দেখেছিলাম হীরে বসানো। পরনে শাদা ধবধবে অত্যন্ত মিহি খদ্দরের কুর্তা আর পায়জামা। কুর্তার উপরে ন্যাচারাল কালারের র-সিল্কের জহর কোট, যার সবক'টি বোতাম খোলা। গায়ের রং এতোই ফর্সা যে হাতের নীল শিরাগুলি পর্যন্ত যেন সুস্পষ্ট। মাথায় কাঁচাপাকা পাতলা চুল। দীর্ঘপুরুষ, ঋজু দেহ, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি।

দেখছিলাম তাঁর অভিজাত চেহারা এবং বেশভূষা। কিন্তু সেই-সঙ্গে মনের মধ্যে চলছিলো একটি দ্রুতচিন্তার ধারা। ইতিমধ্যে আবার মিনতি শুনলাম, টাইয়ের দাম আর জরিমানা নিয়ে তাঁকে যেন দয়া করে রেহাই দেওয়া হয়। ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে দেখছিলাম আর সেইসঙ্গে বুঝেও নিলাম কিছু। একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ধীরগতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কর্তব্য পালনে প্রস্তুত। সিগারেটের প্যাকেট সামান্য ফাঁক করে তাঁর দিকে এগিয়ে ধরে স্মিতহাস্যে অফার করলাম। কিন্তু না, এ ব্র্যাণ্ড নাকি তাঁর চলে না। প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দু'হাতের একত্রিত করতলের উপর রাখা ওয়ালেটটি এবার প্রায় আমার মুখের কাছে, দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার ভঙ্গীতে, এগিয়ে দিয়ে বললেন, "স্যার, আমার এই ওয়ালেট থেকে টাইয়ের দাম আর জরিমানা সমেত যতো টাকা উপযুক্ত মনে করেন, তা নিয়ে, আমাকে যাবার অনুমতি দিন। চুরির জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত। ক্ষমা ইত্যাদি প্রার্থনা করে আর জল ঘোলা করতে চাই না।"

আমি আর কিছু না বলে ওয়ালেটটি তুলে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারের

মধ্যে রেখে দিলাম। অর্থাৎ তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। সংক্ষেপে বললাম, "নমস্কার।"

ভদ্রলোককে একটু যেন দ্বিধান্বিত দেখালো। কপালে দেখা দিলো একটি কুঞ্চন রেখা। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে, সারা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত করে তুলে বলে উঠলেন, "বাঁচালেন আমাকে। অশেষ ধন্যবাদ, স্যার। আপনার এই অনুগ্রহ চি-র-কা-ল মনে থাকবে। আচ্ছা, তাহলে আসি? নমস্কার।"

কথাগুলি প্রকৃতই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কি ব্যঙ্গমিশ্রিত সঠিক বুঝতে না পেরে করজোড়ে বললাম, "শপ-লিফটারদের মধ্যে আপনি সত্যিই একটি ব্যতিক্রম। এ-রকমটি আগে কখনো দেখিনি। আপনার শুভকামনা করি। নমস্কার।"

আশা করেছিলাম ভদ্রলোক কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি আর কোনো কথা না বলে, ফিরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ধীরগতিতে পা বাড়ালেন। চঞ্চলতার কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা দিলো না। ওসমানকে একবার চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিলাম। অবাক হয়ে সে আমাকে দেখছে। ভুলে গেছে র-সিল্ক টাইটি তখনো তার হাতে ধরা। এতোক্ষণ যা দেখেছে, তার কাছে অভূতপূর্ব এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আপন মনে হেসে ফেললাম। ওসমান আজ খুব জব্দ হয়েছে। তার চাউনি কেমন যেন বোকা-বোকা। এভাবে আমাকে সামান্য দু'চারটি কথায় এবং মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি শপ-লিফটিং কেসের পরিসমাপ্তি ঘটাতে দেখে, সে কেবল হতবাকই নয়, কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে তার মনের মধ্যে একসাথে অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। ভাবতে পারছে না, কিভাবে এতো সহজে ভদ্রলোক রেহাই পেলেন। এ-ব্যাপারে একটি কথা বলার সুযোগও পেলোনা সে! ইতিমধ্যে ভদ্রলোক যে এগিয়ে গিয়ে হাতল ঘুরিয়ে দরজায় টান দিয়েছেন, সেদিকে ওসমানের নজর নেই। তাই থতমত খেয়ে গেলো আমার অনতি-উচ্চকণ্ঠ তার কানে যেতে, "স্যার, এক মিনিট। আমার একটি প্রশ্ন আছে।"

আধখোলা দরজার হাতল ধরে ভদ্রলোক পলকের জন্য স্থির হয়ে গেলেন। তারপর হাতল ছেড়ে ফিরে দাঁড়ালেন। মনে হলো এভাবে পিছু-ডাকা তিনি আশা করেননি। হিসেবের বাইরের এই নতুন ঝামেলায় কিঞ্চিৎ যেন চিন্তিত। কপালের কুঞ্চন-রেখা সুস্পষ্ট। স্বয়ংক্রিয় ডোর-ক্লোজারের চাপে দরজা আপনা থেকে ধীরে ধীরে ভদ্রলোকের পিছনে বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু সে-সময় তিনি হয়তো কল্পনাও করতে পারেন নি, এ-দরজা আর এতো সহজে খুলতে পারবেন না। হাসিমুখে আন্তরিকতার স্বরে আহ্বান জানিয়ে বললাম, "আপনার নাম ঠিকানা রেখে যেতে হবে।"

নিজের নাম ঠিকানা প্রকাশ করতে হবে শুনে, ভদ্রলোকের গাম্ভীর্য বেড়ে গেলো। মনের আশঙ্কা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো তাঁর মুখের উপর। মনে হলো তাঁর মন যেন দ্রুত চিন্তায় ব্যস্ত। কিন্তু সরাসরি কাজের কথায় এলাম না। যেন তাঁর এভাবে চলে যাওয়াটা আমার পছন্দ নয়। যাবার আগে চা বা কফি, একটা কিছু খেয়ে যান বরং। তিনি আমার এ প্রস্তাবও নাকচ করে দিলেন। তাঁর নাকি একটি অতি-জরুরী এ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। আবার তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার আবেদন।

কথার শেষের দিকে তাঁর গলার আওয়াজ কি কেঁপে উঠলো সামান্য! দেখলাম তাঁর গলার উঁচু অংশটি দ্রুতগতিতে একবার ওঠানামা করলো। তিনি ঢোক গিললেন। ওসমান নিঃশব্দে তাঁর সামনে টেবিলের উপর এক গ্লাস জল রেখে দিলো। এতোক্ষণ পর ওসমান যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে যতো সহজে ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে মনে করেছিলো, আসলে তা হয় নি। তাই তৎপর হয়ে উঠেছে আমাকে কাজে সহায়তা করার জন্য। র-সিল্কের টাইটি টেবিলের একধারে রেখে সে একটু জায়গা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোকের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে, কলম হাতে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকানো মাত্র তিনি বলে উঠলেন, "মোহন লাল মেহতা।"

মাথা নীচু করে নাম লিখতে লিখতেই প্রশ্ন করলাম, "স্থায়ী ঠিকানা ?"

"৪/২/এ নেহ্রু রোড। আহমেদাবাদ।"

মাথা নীচু অবস্থাতেই আমার পরবর্তী প্রশ্ন, "প্রফেসান প্লিজ।"

"বিজনেস।"

এবার মুখ তুলে বললাম, "কিসের বিজনেস ?"

ভদ্রলোক যেন সামান্য থতমত খেয়ে গেলেন। চট করে উত্তর দিয়ে উঠতে পারলেন না। তারপর সামান্য জোর দিয়ে বললেন, "সেটাও কি জানা দরকার ? মানে, আমি কাপড়ের দালাল।"

হাসিতে ফেটে পড়ার অবস্থা আমার। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলাম। কিন্তু সেদিন ভদ্রলোক কথাটা যে খুব মিথ্যে বলেন নি, তখন টের না-পেলেও, বেশ কিছুদিন পরে তা জেনেছিলাম সংবাদ-পত্রে তাঁর একটি ফটো দেখে। হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপনের উপর নজর আটকে গেলো। একটি সুপ্রসিদ্ধ উলেন মিলের বাৎসরিক রিপোর্ট। ছবি সমেত প্রকাশিত হয়েছিলো বাৎসরিক অধিবেশনে দেওয়া চেয়ারম্যানের বক্তৃতা। ভদ্রলোক যে একটি সুপ্রসিদ্ধ উলেন মিলের চেয়ারম্যান, সে-কথা তিনি সেদিন প্রকাশ করেন নি।

যাক, সে-কথা। ভদ্রলোকের হাত থেকে ওয়ালেট তুলে টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেওয়ার সময়, তাঁর কোনো প্রতিবাদ না দেখে, যে সন্দেহ তখন মনের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো, সে সন্দেহ কাল্পনিক নয়; ভদ্রলোক তাঁর পরিচয় গোপন রেখে কোনোমতে রেহাই পেতে চান। পরিচয় গোপন রাখার খেসারত হিসেবে, তিনি তাঁর পেট মোটা সাপের চামড়ার ওয়ালেটের পুরো টাকাটাই আমার হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু তখন জানতাম না, তাঁর ওয়ালেটে কি পরিমাণ টাকা আছে। আবার প্রশ্নোত্তর চললো, "রাজধানীতে কবে এসেছেন ?"

"গতকাল রাতে।"

"উঠেছেন কোথায় ?"

"স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে।"

"আপনার মাসিক আয়ের অঙ্ক প্রকাশ করতে কি কোনো আপত্তি আছে?" আমার এ-প্রশ্ন যে-কোনো মানুষকে উত্তেজিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ভদ্রলোকের কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অত্যন্ত বিনীতভাবে করজোড়ে হেসে উত্তর দিলেন, "আপ লোগো কী মেহেরবাণীসে ডাল-রোটিকা গুজারা হো হী যাতা, সাব।"

অতীব ধুরন্ধর! একেবারে বিনয়ের অবতার। বুঝতে পারলাম গভীর জলের মাছ, সহজে ধরা দেবার পাত্র নন। তাই, আপাততঃ আর কোনো প্রশ্ন না করে চেয়ারে হেলান দিয়ে ভদ্রলোকের দিকে হাসিমুখে তাকালাম। ফুটিয়ে তুললাম অবিশ্বাসের বাঁকা হাসি। ভদ্রলোককে জানিয়ে দিতে চাই, তাঁর কথার বিন্দুবিসর্গ আমি বিশ্বাস করি নি। তারপর বেজে উঠল আমার বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, "ডাল-রুটির গুজারা নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু টাকা ভরা ওয়ালেটের ফেটে পড়া আকৃতি এবং আপনার চেহারা আর সাজ পোষাক দেখে মনে হয় না কাপড়ের দালালী থেকে এর জোগান হয়। যাই হোক, আপনার ওয়ালেটে কতো টাকা আছে?"

"হাজার তিনেকের মতো হবে।"

চোখে মুখে কপট বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বললাম, "বলেন কি! টাই চুরির জরিমানা আর পরিচয় গোপন রাখার খেসারত দিতে গিয়ে একজন কাপড়ের দালাল এক কথায় তাঁর কষ্টার্জিত তি-ন হা-জা-র টা-কা ছেড়ে দিতে পারে! আপনি কি এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?"

কিন্তু ভদ্রলোকের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললেন, "প্রথমতঃ টাকাটা আজ সকালেই আমার হাতে এসেছে। একটি পার্টিকে মাল বেচার টাকা। আর, চুরি করার পর উপায়হীন হয়ে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে খেসারত হিসেবে সব টাকাটাই আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। আমার একটা প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার প্রয়োজন ছিলো, প্রয়োজন ছিলো এই বয়সে যা করলাম, তার উপযুক্ত শাস্তি।

এই টাকার জন্যে কি নিদারুণ অর্থকষ্ট আমাকে কিছুকাল ভোগ করতে হবে, তা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

ভদ্রলোক নিজেকে এতোক্ষণে সামলে নিয়েছেন। তাঁর শান্ত চেহারা, কথা বলার ভঙ্গী এবং ব্যবহারের মধ্যে কোনোরকম মানসিক দুর্বলতা দেখতে পেলাম না। তাঁর কথাগুলি যেন অধিক মাত্রায় নাটকীয় লাগলো, মনে হলো যেন আমাকে অভিভূত করার চেষ্টায়, ইচ্ছে করেই ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন। শেষ বিশ্লেষণে, তাঁর কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নিতে পারলাম না। টাই চুরির অপরাধ স্বীকার করছেন কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছেন নিজের সঠিক পরিচয় প্রকাশ। তাই বললাম, "আপনি যাই বলুন না কেন, আপনার একটি কথাও বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার সঠিক পরিচয় গোপন করেই চলেছেন। আমি জানি না আপনি কে। কিন্তু একথা হলফ করে বলতে পারি, আপনি আর যাই করুন না কেন, জীবিকার জন্য কাপড়ের দালালী করেন না।"

ভদ্রলোক সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে বললেন, "আমি অপারগ। এর পর আমার আর কিছু বলার থাকতে পারে না।"

এভাবে ভদ্রলোক বিষয়টির উপর দাঁড়ি টেনে দিতে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যেন টেনিস বল পিটিয়ে আমার কোর্টে ফেলে দিলেন। পরের ব্যাপারটা ছোটোখাটো স্নায়ুযুদ্ধ। ভদ্রলোক তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর আমারও পণ, তিনি যা গোপন করছেন তা ফাঁস না-করে থামবো না। দেখা যাক্ এ-যুদ্ধে জয় হয় কার। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধোঁয়ার রিং ছাড়ার পর আমি সরাসরি তাঁর নাম পরিচয় চ্যালেঞ্জ করে বসলাম। তারপর কোনান ডয়েলী ভঙ্গীতে শুরু করলাম,—যেন আমি একজন ছোটোখাটো শার্লক হোমস, "আমার যদি ভুল না-হয়ে থাকে, তাহলে আপনি কেবল অত্যন্ত ধনীই নন, প্রাচুর্যেও ভরপুর। হেঁটে চলে আপনি ঘুরে বেড়ান না, সামান্য প্রয়োজনে চড়েন গাড়ী। স্থানান্তরে যাবার জন্যে রেলগাড়ী চড়েন না, যাতায়াত করেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের টিকিটে। আর ঘরের বাইরে

রাত কাটাবার প্রয়োজন হলে, ফাইভ-স্টার হোটেলে যান, রেল স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে নয়। রাইট ?"

এই পর্যন্ত বলা শেষ হতেই বিদ্যুৎগতিতে ভদ্রলোকের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনের একটি সম্ভাবনার কথা মনে দেখা দিলো। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠলাম, ছিঃ এই সামান্য পথটি এতোক্ষণ মনে পড়ে নি! যে ব্যাপার এক মিনিটে শেষ করা যায়, তাতে আমার মতো মানুষের এতো সময় লাগলো কি করে! মনে পড়ে গেলো টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে ভদ্রলোকের ওয়ালেটের কথা।

আমার এই কর্মজীবনে শপ-লিফটার তো কম দেখলাম না। তাদের মনস্তত্ত্ব, কথাবার্তা এবং আচার-ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও কিছু জমা হয়েছে নিশ্চয়ই। সব মানুষের ওয়ালেটের মধ্যে এমন কিছু জিনিস থাকে, যা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় এবং মূল্যহীন। কিন্তু সে-সব জিনিস সময় বিশেষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের ওয়ালেটের মধ্যে ভিজিটিং কার্ড কিংবা এমন কিছু ছোটোখাটো জিনিস অথবা কাগজের টুকরো নিশ্চয়ই আছে, যা তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দেবে, নিদেনপক্ষে তাঁর উপরে করবে একটু আলোকপাত। তাই দিয়েই তাঁকে কোণঠাসা করতে পারবো। ড্রাই-ক্লিনিংয়ের রসিদ, এক টুকরো কাগজে লেখা কোনো টেলিফোন নম্বর, কোনো সুপ্রসিদ্ধ বিপণীতে ধারে কেনা ক্রেডিট বিল, কোনো ক্লাবের মেম্বারশিপ কার্ড ইত্যাদির উপর নির্ভর করে, কতো শপ-লিফটারদের আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিখ্যাত ফিল্ম-নির্মাতা অনুপচাঁদ আগরওয়ালের স্ত্রী মনোরমা আগরওয়ালের পরিচয় জানতে পেরেছিলাম তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগে রাখা নাম-ছাপা চেক বই থেকে। কর্ণেল দীনেশ খান্নাকে তাঁর আইডেনটিটি কার্ড এবং বিনয় সাহানীকে তাঁর হোটেল-বিল থেকে। ঘটনার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই সংশ্লিষ্ট নামের। পুরুষদের ওয়ালেটের আর মহিলাদের ভ্যানিটি ব্যাগ খুঁজতে গিয়ে কতো গোপনীয় পত্রাবলী, কতো গোপনীয় ছবিই না দেখতে হয়েছে আমাকে!

যাই হোক, ভদ্রলোকের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবার আসন্ন

সম্ভাবনার কথা মনে হতে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু সরাসরি কাজ শুরু না-করে বললাম, "আপনার আইডেনটিটি গোপন রেখে কোনো লাভ হলো না। কারণ, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারই সহায়তায় তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন। চোখেমুখে একটু আতঙ্কের ছায়া। আমার কথার তাৎপর্য তিনি বুঝবেনই বা কি করে! তাঁর ওয়ালেটের কথা যে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, তা তাঁর জানার কথা নয়। আর জানলেও, ওয়ালেটে টাকা ছাড়া আর কি আছে, সে কথা তাঁর হয়তো মনেও নেই। আবার শুরু করলাম, "কিন্তু প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হবার আগে, আপনি কে অথবা কি হতে পারেন, সে সম্পর্কে আমার অনুমান শুনে নিন। হয় আপনি একজন মেম্বার অব পার্লামেণ্ট, না-হলে মেম্বার অব স্টেট লেজিসলেচার। তা যদি না হয়, তাহলে আপনি ডাক্তার কিংবা ল'ইয়ার। চাকরী আপনি করেন না, সে চাকরী যতো বড়োই হোক না কেন। প্রমাণ চান?"

উত্তরের অপেক্ষা না-করে, হঠাৎ টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর ওয়ালেটটি বের করে টেবিলের উপর উল্টে দিলাম। এক গোছা একশো টাকার নোট, কিছু খুচরো আর কয়েকটি নানা আকৃতির বিভিন্ন রঙের ভাঁজ করা কাগজের টুকরো টেবিলের উপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভিজিটিং কার্ড না-দেখে হতাশ হয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে সামান্য ভয়ও যেন দেখা দিলো। তড়িৎ-গতিতে ওয়ালেটের মধ্যে আঙুল পুরে দিলাম। খালি, আর কিছু নেই। ওয়ালেটটি টেবিলের এক পাশে রেখে, ভাঁজ করা কাগজগুলোর উপর ঝুঁকে পড়লাম। প্রথমেই তুললাম একটি ভাঁজ করা শাদা কাগজ, যেটি অন্যগুলির চেয়ে আকারে সামান্য বড়ো এবং ভাঁজের সংখ্যাও বেশী। কাগজটি নিভাঁজ করতেই দেখি, হোম মিনিস্ট্রির সরকারী দপ্তরে প্রবেশ করবার একটি ছাড়পত্র। চোখ বুলোতে দেখলাম, সাক্ষাৎকারীর নাম দিলীপ রাজ রায়। আগের দিন অফিসিয়ল প্রয়োজনে দেখা করেছেন ভারতের আইনমন্ত্রীর সঙ্গে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চেয়ারে

হেলান দিয়ে ভদ্রলোকের দিকে হাসিমুখে তাকালাম। টেবিলের উপর পড়ে থাকা আর কিছু যাচাই করার প্রয়োজন হলো না। ভদ্রলোকের রক্তশূন্য মুখ আর পলকহীন দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। কপাল ঘামে ভিজে, আর টেবিলের উপর রাখা হাত দুটি অল্প অল্প কাঁপছে। ছাড়পত্রটি নাড়তে নাড়তে ব্যঙ্গভরে বলে উঠলাম, "ভারতের মহামান্য আইনমন্ত্রী তাহলে আজকাল কাপড়ের দালালদের সঙ্গেও দেখা করছেন! হাউ ইনটারেস্টিং!"

ভদ্রলোক একেবারে কোণঠাসা। কোনো উত্তর না দিয়ে, তাঁর জহর কোটের পকেট থেকে কম্পিত হস্তে একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। কার্ডের উপর কালো কালিতে ছাপা তাঁর নাম এবং পরিচয় আমার চোখের উপর নাচতে শুরু করলো। বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সে নাচ দেখলাম। হোম মিনিস্ট্রির দপ্তরে দেখা করবার ছাড়পত্রটি দেখে যতো না অবাক হয়েছিলাম, তার শতগুণ বেশী অবাক হলাম ভিজিটিং কার্ড দেখে। আপন মনে বার বার পড়তে লাগলাম ঃ

দিলীপ রাজ রায়

লিগাল এ্যাডভাইজার

গভর্ণমেন্ট অব............।

তারপর ঘাড় তুলে দেখি, ভারতের একটি বিশিষ্ট প্রদেশের লিগাল এ্যাডভাইজার দিলীপ রাজ রায় মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। দৃষ্টি তাঁর বিপরীত দেওয়ালের উপর স্থির হয়ে আছে। হয়তো ভাবছেন, 'ধরণী দ্বিধা হও'। হাসিও এলো, দুঃখও হলো। এই রকমই হয়। লজ্জায় এঁরা মুখ দেখাতে পারেন না। সামান্য খোঁচা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ রায়। কিন্তু আপনার ভয় কি? প্রয়োজন হলে স্বয়ং আইনমন্ত্রী আপনার জামিন হতে পারবেন।"

টেলিফোন ডাইরেকটরী তুলে নিতেই, তিনি সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমার হাত দুটি চেপে ধরলেন। থর থর করে তাঁর হাত দুটি আর ঠোঁট কাঁপছে। লজ্জায়, গ্লানিতে, আতঙ্কে তাঁর মুখ যেন মেঘাচ্ছন্ন। একটি

শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে, তাঁকে স্থির হয়ে বসতে বললাম। টেবিলের উপর ওসমানের রাখা জলের গ্লাস তুলে ধরে এক নিশ্বাসে সবটুকু জল শেষ করলেন। মনে হলো সেই সঙ্গে যেন হতাশার এক দীর্ঘ নিশ্বাস অলক্ষিতে বেরিয়ে এলো। আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়। স্বাভাবিকভাবে শুরু করলাম কথাবার্তা। প্রথম কিছুক্ষণ এক তরফা কথা বলার পর, দিলীপ রাজ রায়ের মানসিক ভারসাম্য ফিরে এলো। এবার নিজের থেকেই সব কথা বললেন। নিজের কথা, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কথা,জীবিকা ও জীবনধারণের কথা। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার তাঁকে রাজধানীতে উড়ে আসতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার জন্য। ইণ্টারন্যাশনাল হোটেলে তাঁর পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা করা আছে। যখনই আসেন রুম নম্বর ৬০৫ তাঁর বাঁধা। অকপটে বলে গেলেন সব কথা, গোপন করলেন না কিছুই। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন অপরাধ। এক সময় প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা বলতে পারেন, স্যার, সামান্য একটি টাই চুরি করলেন কেন?"

ম্লান হেসে উত্তর দিলেন, "কি আর বলবো, মিঃ সরকার! আমার জামাই থাকে লণ্ডনে। কয়েকদিন পর তার জন্মদিন। তাকে জন্মদিনে উপহার হিসেবে একটি টাই পাঠাবার জন্যেই আজ আপনাদের এখানে এসেছিলাম। কিন্তু মনের মতো টাইটি আবিষ্কার করতেই কেমন যেন হাত নিসপিস করতে লাগলো, আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। স্থির মস্তিষ্কে, ভেবেচিন্তে, সুযোগ বুঝে টাইটি পকেটে পুরে ফেললাম। যে এ-কাজ করলো সে-যেন ঠিক আমি নয়, আর কেউ। কিংবা অন্য আমি। অনেকটা যেন ডঃ জেক্‌ল্ এ্যাণ্ড মিঃ হাইডের মতো ব্যাপার। আমার মধ্যে এই দুই সত্তার সহাবস্থান এর আগে কোনো-দিন অনুভব করিনি। ভেবেছিলাম কেউ টের পায়নি। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। একে কি বলবেন ক্লেপটোম্যানিয়া? কিন্তু তা কি করে হবে? আগে কখনো তো এ-কাজ করিনি।"

বাধা দিলাম না। নিঃশব্দে তাঁর কথা শুনে চললাম। সামান্য থেমে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। "কিন্তু প্লীজ, যেন মনে করবেন

না, এসব কথা বলে আমার অপরাধ লাঘব করার কিংবা আপনার মন গলাবার চেষ্টা করছি। আমি অপরাধী, আইন এবং নীতির চোখে। একে শেষ পর্যন্ত চুরি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।"

ঠিক এই কথাই বলেছিলেন মিস্টার জাস্টিস মালিক। তিনিও একটি র-সিল্ক টাই কোটের পকেটে পুরে কেন্দ্র থেকে রওনা দিয়েছিলেন! ধরা পড়ার পর তিনি নিজের পরিচয় গোপন করেন নি। খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছিলেন তাঁর অপরাধ। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, তাঁকে বলেছিলাম, "ইয়োর অনার, কর্মজীবনে অসংখ্য অপরাধের বিচার আপনি নিক্তির ওজনে করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আপনিই স্বয়ং আসামীর কাঠগড়ায়। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে আপনার বিচার করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমার একান্ত অনুরোধ, নিজের সম্পর্কে আপনার জাজমেণ্ট আপনি নিজেই দয়া করা শুনিয়ে দিন।"

পকেট থেকে চশমার খাপ বের করে, তার থেকে মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে লাগিয়ে নিয়ে, একটু ঝুঁকে পড়ে টেবিলের উপর দু'হাত রেখে বসলেন মিস্টার জাস্টিস মালিক। তারপর দু'হাতে আমার রাইটিং প্যাডটা ধরে, যেন তাতে লেখা জাজমেণ্টের অপারেটিভ পার্টটা পড়তে শুরু করলেন :

"কন্‌সিডারিং অল দ্য এভিডেন্স ডিস্‌কাস্‌ড বাই মি এ্যাবাভ্‌, আই হ্যাভ নো হেজিটেশন ইন কামিং টু দ্য কনক্লুসন্‌ দ্যাট দ্য প্রসিকিউশন হ্যাজ প্রুভ্‌ড্‌ দ্য কেস বিঅন্‌ড্‌ রিজ্‌নেবল্‌ ডাউট। কন্‌সিডারিং অল দ্য এভিডেন্স, আই ফাইণ্ড দ্য অ্যাকিউস্‌ড্‌ গিল্‌টি আণ্ডার সেক্‌শন ৩৮০ আই পি সি এ্যাণ্ড কন্‌ভিক্ট্‌ দ্য অ্যাকিউস্‌ড্‌ আণ্ডার দ্য সেড্‌ সেকশন।"

কামরার মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় সেদিন এতো চমকে উঠতাম না। আজ এতোদিন পরে, সেদিনের কথা মনে হতে আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেলো! আর তার ধাক্কায় আমি অকস্মাৎ চলে এলাম অতীতের ফ্ল্যাশব্যাক থেকে বর্তমানের কঠোর সত্যের সীমানায়। ছটফটিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসতে দেখি, শৈবাল

চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ইতিমধ্যে কখন যে তাঁর ধূমপান শেষ হয়েছে জানতে পারিনি।

গলায় একটা ক্যাজুয়্যাল টোন এনে বললাম, "আপনি তাহলে বলতে পারছেন না, কেন একাজ করলেন?"

"বিশ্বাস করুন মিঃ সরকার, আমি যে কখন টাইটি পকেটে পুরে-ছিলাম, সে কথাও মনে পড়ে না। সত্যিই আমি জানি না, কেন এ-কাজ আমি করলাম। এ্যাকচুয়্যালি, কোনো কিছু কেনার জন্যে আপনাদের এখানে আজ আসিনি। জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে আমার বিদেশে। করপোরেশনের কাজে প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়। আমার বেশীরভাগ কাপড়-চোপড়ই বিদেশী। আর টাইয়ের আমার কোনো দরকারই নেই। এতো টাই জমে উঠেছে যে সবগুলি ব্যবহার করে উঠতে পারি না।"

"তাহলে কি জন্যে এসেছিলেন?"

"বেশ কিছুদিন দেশের বাইরে ছিলাম। কয়েকদিন হলো ফিরেছি। আজ অফিস যাবার পথে, গাড়ী যখন শিল্পকেন্দ্রের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ মনে হলো, অনেকদিন আপনাদের এখানে আসা হয়নি। ভাবলাম, একবার আপনাদের ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ারের ডেকরেশন আর ডিসপ্লেটা দেখে যাই। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।"

থেমে গেলেন শৈবাল চৌধুরী। কেমন যেন মনে হলো তাঁর নিজের শিল্পকেন্দ্রে প্রবেশ করার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সময়ের এক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যেন এক অদৃশ্য জলবিভাজিকার মতো তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে দু'ভাগ করে দিয়েছে। তার এক পার থেকে এক শৈবাল চৌধুরী আত্মমগ্ন বিস্ময়ে দেখছেন আর-এক শৈবাল চৌধুরীর দৈব-প্রেরিত অগ্রগতি।

হারানো খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, "তারপর?"

আমার কথা তাঁর কানে পৌঁছলো কি না জানি না। তাঁর দৃষ্টি

শূন্যে নিবদ্ধ, বলে চললেন, "অলস গতিতে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হাজির হলাম পুরুষের সাজপোষাক বিভাগে। আর ওখানে যাওয়াটাই হলো আমার কাল!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শৈবাল চৌধুরী আবার থেমে গেলেন। অপেক্ষা করে রইলাম এরপর তিনি কি বলেন শোনার আশায়। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দূরে নীল আকাশের দিকে, যেন কোনো অদৃশ্য সংকেতের অনুসন্ধানে। মৃদুকণ্ঠে বললাম, "তারপর?"

শৈবাল চৌধুরী এবারেও আমার কথা শুনতে পেলেন কি না বুঝতে পারলাম না। যেন এই বিরতিটুকু একটি প্রস্তুতি-পর্ব। সেটা শেষ হতে তিনি পূর্ব-কথার অনুসরণে স্বগতোক্তির মতো বলে যেতে লাগলেন। যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন আত্মকাহিনী। নিজের কাছেই জবাবদিহি করছেন।

পুরুষের সাজপোষাক বিভাগে রিভলভিং টাই স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ালেন শৈবাল চৌধুরী। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একের পর একটি টাই নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। তারপর কি যেন হলো তাঁর, কিছুই মনে করতে পারছেন না। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন একটি টাই তুলে কোটের পকেটে পুরে নিয়েছেন। পরমুহূর্তে শরীরের সবগুলি স্নায়ু একসঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠলো। মনে হলো যেন চেতনা হারাবেন। চারদিক যেন গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

সম্বিত ফিরে পেতে মনে হলো একি করলেন তিনি! তিনি—শৈবাল চৌধুরী চুরি করলেন! তাও সামান্য একটা টাই! কিন্তু তখন বোধহয় অনেক দেরী হয়ে গেছে। মুখের কথা আর হাতের বাণ, যেমন একবার বেরিয়ে গেলে, আর ফিরিয়ে আনা যায় না, তেমনি একবার চুরি করলেও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আশেপাশে অনেক লোক। পকেট থেকে টাইটি বের করে আবার স্ট্যাণ্ডে রেখে দেওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না শৈবাল চৌধুরী।

ধীরে ধীরে সরে এসে দাঁড়ালেন বিরাট আয়নার সামনে। খুঁটিয়ে-

খুঁটিয়ে নিজের প্রতিচ্ছবিকে দেখতে লাগলেন। আপনমনে প্রতিচ্ছবিকে বললেন, 'তুমি শৈবাল চৌধুরী, দেশের একজন নামী পুরুষ হয়ে চুরি করলে সামান্য একটি টাই! ছিঃ, ছিঃ, একথা প্রকাশ হয়ে পড়লে তোমার কি অবস্থা হবে জানো? সংবাদপত্রে তোমার ছবি-সমেত এ-কীর্তি প্রকাশিত হলে তুমি কি করবে বলতে পারো'? প্রতিচ্ছবি নিরুত্তর। কোনো জবাব না দিয়ে, প্রতিচ্ছবি তাঁর ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করলো রুমাল। চশমা খুলে চোখের কোলে আটকে-থাকা অশ্রুজল মুছে আর-এক শৈবাল চৌধুরীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপর প্রতিচ্ছবির ঠোঁটদুটি থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। করুণ দৃষ্টিতে প্রতিচ্ছবি মিনতি জানালো, 'এবারটা আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি ইচ্ছে করে চুরি করিনি। বিশ্বাস করো, কেন যে একাজ করলাম আমি জানি না, আমি জানি না'।

শৈবাল চৌধুরী উপসংহার টানলেন ওই কথা দিয়েই। "আমি জানি না, আমি জানি না। কে আমাকে বলে দেবে কেন আমি এ-কাজ করলাম।"

টেবিলের উপর দু'বাহুর মধ্যে মাথা রেখে তিনি যেন ভাবাবেগ দমন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। নিঃশব্দে বসে রইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে প্রবল অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যেন একপ্রকার অস্তিত্বগত সংকট। তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রচালিতের মতো শৈবাল চৌধুরীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আলতোভাবে তাঁর পিঠে হাত রাখতে তিনি চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "চোখ মুছে ফেলুন, স্যার।"

তাঁর মুখ সত্যি অশ্রুসিক্ত মনে হচ্ছিলো। সেখানে দেখা দিলো ম্লান সলজ্জ হাসি। এক মুহূর্তের জন্য আমার হাত চেপে ধরলেন, মনে হলো নিজেকে অত্যন্ত অসহায়, রিক্ত বোধ করছেন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছে গভীর অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, "অপরাধ যখন

করেছি শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। কিন্তু এইসঙ্গে শেষ হয়ে গেলো আমার পাবলিক কেরিয়র।"

নিজের আসনে ফিরে এসে বললাম, "ও-কথা এখন থাক, মিঃ চৌধুরী।" আমার মনে ঘুরে-ফিরে কেবল একই প্রশ্ন জাগছিলো। শৈবাল চৌধুরী এ-কাজ করলেন কেন? তিনি কি মানসিক রোগাক্রান্ত? না কি তাঁর পারিবারিক সুখশান্তি বিনষ্ট?

তার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য কথা শৈবাল চৌধুরী আমাকে শোনালেন। তিনি বিবাহিত, এ-বয়সেও স্ত্রীর সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কেবল সচেতনই নন, গর্বিতও। 'বিয়ের পর তাঁর বান্ধবীদের কাছে শুনেছি যে স্কটিশের তৎকালীন ছেলেরা নাকি আমার স্ত্রীকে বলতো বেথুন বিউটি'। দুটি সন্তানের পিতা। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে আমেরিকায় এম. আই. টি-তে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। জীবনের অধিকাংশ সময় শৈবাল চৌধুরীর বিদেশে কাটলেও তিনি জীবনে সুরাস্পর্শ করেন নি।

তিনি যেন একটি ক্লিন বিল অব্ লেডিং পেশ করে দিলেন। কিন্তু আমার সব গোলমাল হয়ে গেলো। যে মানুষ বিবাহিত জীবনে সম্পূর্ণ সুখী, যাঁর ছেলেমেয়েরা জীবনে প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত, যিনি স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত এবং কর্মজীবনে প্রায় শিখরে অধিষ্ঠিত, সেই মানুষের এই স্খলন যে কার্যকারণ সম্পর্কের কোনো সূত্রেই ধরা দেয় না। কেবল মনে পড়লো জীবনানন্দ দাশের একটি বিখ্যাত কবিতার দুটি লাইন:

'তবু এক বিপন্ন বিস্ময়,
আমাদের রক্তের ভিতরে খেলা করে!'

যে কারণ তিনি জানেন না, তা আমি তুলে আনবো কোন্ মায়াজাল ফেলে! আমি সাইকিয়্যাট্রিস্ট নই, তাই শৈবাল চৌধুরীর মনোজগতে প্রবেশ করে তাঁর কৃতকর্মের গূঢ় রহস্য সমাধানের ক্ষমতা আমার নেই।

তাহলে শৈবাল চৌধুরীকে নিয়ে কি করা যায়! এ পর্যন্ত যা কিছু বললেন, তাতে করে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, তিনি উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। আত্মরক্ষার

যথাযথ ব্যবস্থা না করে তাঁকে মুক্তি দিলে, ভবিষ্যৎ-বিপদের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙ্গবে না ধরণের একটা উপায় মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো। কিন্তু সে-কথা তোলা বড়ো কঠিন। মুহূর্তের অসাবধানতায় সব বানচাল হয়ে যেতে পারে। ইন্টারকম বেজে উঠলো। সেক্রেটারীর গলা, "স্যার, মিসেস সিং একবার দেখা করতে চান।"

যাক্, বাঁচা গেলো! শৈবাল চৌধুরী সম্পর্কে ভাববার কিছু সময় পেলাম। উত্তর দিলাম, "বসতে বলো। এখনি আসছি।" চেয়ার ছেড়ে শৈবাল চৌধুরীকে বললাম, "মাফ করবেন। আপনাকে একটু বসতে হবে। একটা জরুরী কাজ সেরে এখুনি ফিরে আসছি।"

পাশের কামরায় গিয়ে কোনো কিছু বলার আগেই স্নেহলতা এগিয়ে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুরকণ্ঠে বলে উঠলেন, "বড্ডো বেলা হয়ে গেছে, মিঃ সরকার। আজ আর বসার সময় হবে না। এতক্ষণে মিঃ সিং নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠে,আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার নববর্ষের কফির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলাম না। কিছু মনে করলেন না তো! আজ তাহলে আসি?"

একটু ঘাড় হেলিয়ে স্মিতহাস্যে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন স্নেহলতা। মনে হলো তিনি হয়তো জানতে পেরেছেন শৈবাল চৌধুরীর উপস্থিতির কথা। হয়তো কল্পনার সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর কোনো-কিছু আলোচনাও হয়ে থাকবে। তাই বোধহয় আর এমব্যারাস না-করে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি মুক্তি দিলেন আমাকে। অসহায়ের ভঙ্গীতে বললাম, "আমার দুর্ভাগ্য, মিসেস সিং!"

পলকের জন্য একবার কল্পনার দিকে তাকিয়ে স্নেহলতা বললেন, "তাহলে আসি? বাই মিঃ সরকার, বাই কল্পনা।" উত্তরের অপেক্ষা না-করেই স্নেহলতা যাবার জন্য পা বাড়ালেন। নিজের কামরায় ফেরৎ আসতে গিয়ে কল্পনার দিকে চোখ পড়ে গেলো। যা আন্দাজ করে-ছিলাম, ঠিকই। কল্পনার চোখে স্পষ্ট লেখা আছে সে-কথা। আমার কামরায় শৈবাল চৌধুরীর উপস্থিতির কথা স্নেহলতা জানতেন।

কামরায় ঢোকামাত্র শৈবাল চৌধুরী বলে উঠলেন, "আমার বিষয় কি স্থির করলেন, মিঃ সরকার ?"

আমার অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছেন। মনে মনে স্থির করেছেন, কালবিলম্ব না-করে, বাস্তবের সম্মুখীন হবেন। তিনি বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। সুতরাং আমাকে সাবধান হতে হলো। এরপর প্রতিটি কথা,প্রতিটি উত্তর দিতে হবে ভেবে এবং সাবধানে। তাঁর কথার সরাসরি কোনো উত্তর না-দিয়ে বললাম, "না, স্যার। এখনো কিছু স্থির করি নি। সাধারণত এ-সব ক্ষেত্রে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।"

"তাহলে আপনি কি আমাকেও পুলিশে দেবেন?" ভয়ার্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শৈবাল চৌধুরী। মনে হলো তাঁর সবগুলি ইন্দ্রিয় উদগ্রীব হয়ে উঠেছে আমার উত্তরের অপেক্ষায়। এবারেও সরাসরি উত্তর না-দিয়ে বললাম, "ইট ডিপেণ্ডস।" একটু থেমে তার সঙ্গে যোগ করলাম, "মুড়ি মুড়কীর দর এক নয়। সাধারণতঃ পুলিশে খবর দেওয়া হয় ঠিকই। কিন্তু ব্যতিক্রম যে নেই, একথা বলবো না।"

তাঁর প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। কি যেন ভাবছেন তিনি। হঠাৎ টেবিলের উপর দু'হাত রেখে, আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আমাকে এই ব্যতিক্রমের মধ্যে ফেলা যায় না?"

তাঁর কথা শুনে আপন মনে হাসলাম। এই ইনিই না একটু আগে শাস্তি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন! শেষ পর্যন্ত প্রটেকসনই চাইছেন, তবে একটু ঘুরিয়ে। ভাবলাম ঠিক আছে, বেঁচে থাকতে হলে একটু ইগো বোধহয় থাকা দরকার। হাজার হোক তিনি একটি বিরাট সংস্থার চেয়ারম্যান। আশ্বাস দিয়ে বললাম, "নিশ্চয়ই যায়। তবে আপনি যদি নিজেকে সহায়তা করেন আর বিশ্বাস করেন আমাকে।"

শৈবাল চৌধুরী হকচকিয়ে গেলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিঃ সরকার!"

সন্তর্পণে আমার প্রস্তাবটি তাঁর সামনে রাখলাম। "প্রথমতঃ আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে আপনার কৃতকর্মের একটি স্বীকারোক্তি লিখে দিতে পারেন। আর আমাকে যদি বিশ্বাস করেন,

তাহলে কথা দিতে পারি, আপনার এই স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ গোপনীয় হিসেবে গণ্য হবে। কেবল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছাড়া আপনার এই কনফেসনাল স্টেটমেন্ট কোনো দিন, কোনো সময়ে, কোনো অবস্থায় আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না।"

শৈবাল চৌধুরী কোনো জবাব দিলেন না। পুলিশের সঙ্গে থানায় যাওয়া এবং গোপনীয় স্বীকারোক্তি লেখার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়, সে-কথাই বোধকরি বিচার করছেন আপন মনে। হয়তো ভাবছেন স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা, ভাবছেন নিজের কথা, ভাবছেন জীবন-মরণের কথা। উত্তরের অপেক্ষা না-করে আবার শুরু করলাম "দ্বিতীয়তঃ, আপনাকে এই টাইটি কিনে নিতে হবে।"

বক্তব্য শেষ করেই, সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে শৈবাল চৌধুরীর মুখের কাছে জ্বলন্ত লাইটার তুলে ধরলাম। তিনি বুঝতে পারলেন কি না জানি না যে, আমি তাঁকে ধুমপান করতে বাধ্য করালাম। এ-সময়ে তাঁর মনের টেনসন আয়ত্বের মধ্যে রাখতে চাই। আমার বক্তব্য তখনো কিছুটা বাকী। অর্ধেক সিগারেট যখন পুড়ে গেছে, তখন ধীরে ধীরে আমার সাবধান-বাণী তাঁকে শোনালাম, "কোনো তাড়া নেই, মিঃ চৌধুরী। ভেবে চিন্তে জবাব দিন। আপনি প্রবীণ এবং বিজ্ঞ। তবুও একটি কথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আমার কর্তব্য। আপনার সামনে আমি কোনো কমপ্রোমাইজের ফরমূলা রাখছি না। জোর করে আপনাকে দিয়ে কোনো কিছু করিয়ে নেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনি হয়তো এখন সব কিছু ঠিক মতো ভাবতে পারছেন না। তাই আপনার ভাবনা চিন্তাকে যদি কোনোভাবে সহায়তা করতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বললাম। আপনি যে সিদ্ধান্তই নিন না কেন, তা হবে সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব।"

কথা শেষ করে চেয়ারে ঠিক করে বসলাম। আমার কথাগুলি শৈবাল চৌধুরীর মনের অন্তস্তলে থিতিয়ে যেতে কিছু সময় লাগবে। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেলো। জানলার ভিতর দিয়ে দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছেন। দু আঙুলের ফাঁকে আলগা-

ভাবে ধরা সিগারেট আপনা-আপনি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাঁর কোনো খেয়াল নেই। ভারত সরকারের একটি অন্যতম সংস্থার স্বনামধন্য কর্ণধারের কাছে এতো বড়ো সমস্যা এর আগে যেন কোনো দিন দেখা দেয় নি। আর সে সমস্যা নিজেকে জড়িয়ে, টু ডু অর নট টু ডু। হঠাৎ নিজেকে ঝেড়ে ফেলে, সোজা হয়ে আমার দিকে তাকালেন। প্রায় পুড়ে-যাওয়া সিগারেটের শেষ অংশটুকু ছাইদানে চেপে দিয়ে বললেন, "বলুন কি লিখতে হবে, মিঃ সরকার ?"

তাঁর কথায় কোনো আগ্রহ দেখলাম না। চেয়ারে হেলান দেওয়া অবস্থাতেই, তাঁর কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে আর একবার আমার সাবধান বাণী শুনিয়ে দিলাম, "আপনি যা করতে চলেছেন, তা ভেবে-চিন্তে, কোনো চাপে না-পড়ে, সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই করছেন।"

"আপনি চিন্তিত হবেন না, মিঃ সরকার। সারা জীবন মানুষ ঘেঁটেছি। আপনাকে বিচার করতে বোধহয় ভুল হয় নি আমার।"

আমি হেসে বললাম, "এটা কি কমপ্লিমেণ্ট ?" কিন্তু আমার রসিকতাটুকু মাঠে মারা গেলো।

তিনি সংক্ষেপে বললেন, "বলুন, কি লিখতে হবে ?"

শৈবাল চৌধুরীর আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। যেন স্বীকারোক্তি লেখার সিদ্ধান্তে অচল, অটল। লোহার সেফ খুলে একটি রেজিস্টার বের করে তাঁর সামনে মেলে ধরলাম! রেজিস্টার দেখে ম্লান হেসে বললেন, "হিয়ার ইজ কাম্‌ফার্ট। আই টেক মাই প্লেস এ্যামং মেনি আদারস্।"

কোনো উত্তর না-দিয়ে কেবল মুচকি হাসলাম। তারপর কোটের বুকপকেট থেকে পার্কারের সোনার কলম খুলে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে শৈবাল চৌধুরী বললেন, "ডিকটেট মি, প্লিজ।"

"আপনি কি লিখবেন, আমি তা কি করে বলবো, স্যার! যা ঘটেছে সংক্ষেপে তাই লিখে দিন," নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম। কোনো কথা না-বলে শৈবাল চৌধুরী লিখতে শুরু করলেন ঃ

'আই, শৈবাল চৌধুরী, রেসিডেণ্ট অব্ কিউ- আর-১, গ্রেটার

কৈলাশ, নিউ দিল্লী, এ্যাণ্ড চেয়ারম্যান অফ দ্য পাওয়ার করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ডু হিয়ারবাই মেক দ্য ফলোয়িং স্টেটমেণ্ট ভল্যানটারিলি এ্যাণ্ড উইদাউট এনি কোয়ারসন ফ্রম দ্য ম্যানেজমেণ্ট অব দ্য ভারতীয় শিল্পকেন্দ্র ঃ

আজ প্রায় সকাল সাড়ে দশটার সময় আপনাদের পুরুষ বিভাগ থেকে একটি র-সিল্ক টাই তুলে নিয়ে আমার কোটের পকেটে লুকিয়ে রাখি। ধরা পড়ার পর, টাইটি আমার কোটের পকেটে পাওয়া যায়। আমি শিল্পকেন্দ্রের একজন নিয়মিত খদ্দের এবং জীবনে এই প্রথম এ-ধরনের গর্হিত কাজ করলাম। যাইহোক, আমার কৃতকর্মের জন্যে আমি সম্পূর্ণ দায়ী এবং অত্যন্ত লজ্জিত। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করুন। এই অনুকম্পার জন্যে আজীবন আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। ইতি—অনুগৃহীত, শৈবাল চৌধুরী।"

লেখা শেষ করে রেজিস্টারটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন, ঠিক আছে তো?"

সামান্য হেসে, রেজিস্টার বন্ধ করে বললাম, "অশেষ ধন্যবাদ। আপনি কেবল নিজেকেই সহায়তা করলেন না, মিঃ চৌধুরী, আমাকেও একটি বিরাট অপ্রিয় কাজের দায় থেকে মুক্তি দিলেন।"

"লজ্জা দেবেন না, মিঃ সরকার। আমার মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, সংসার, এক কথায় আমার সব কিছুই আজ আপনি রক্ষা করলেন। এ আমার নবজন্ম! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" রুমাল দিয়ে চোখ মুছে, তিনি আবার শুরু করলেন, "টাইয়ের দাম দেওয়ার মতো পুরো টাকা আমার কাছে এখন নেই। যা আছে তার থেকে গোটা পঞ্চাশেক টাকার মতো আপনি আপাতত জমা রেখে নিন। অফিস ফিরতি-পথে বাকীটা বিকেলে এসে দিয়ে যাবো।'

ওয়ালেট খুলে টাকা বের করতে যেতে, বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এর জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। কোনো টাকা জমা রাখার দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত মানুষ। সামান্য কয়েকটা টাকা দেবার জন্যে, আপনাকে নিজে আসতে হবে না। সময়

মতো কারুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলে, আমি টাইটি এবং ক্যাশমেমো তাকে দিয়ে দেবো।”

উঠে দাঁড়ালাম। কাজ শেষ। শৈবাল চৌধুরীর বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে বললাম, “চলুন, স্যার। আপনাকে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।”

গাড়ীতে ওঠার আগে আমার ডান হাত চেপে ধরে শৈবাল চৌধুরী দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, মুখে কিছু না-বলেও যেন অনেক কিছু বললেন। বলবার মতো কোনো কথা আমার মনে এলো না। তারপর এক সময় হাত ছেড়ে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিলেন। মুহূর্তে মারসিডিজ গাড়ী শৈবাল চৌধুরীকে নিয়ে আমার চোখের আড়ালে চলে গেলো।

শূন্যমনে একদৃষ্টিতে শৈবাল চৌধুরীর গতিপথের দিকে তাকিয়েছিলাম। পথে অগণিত মানুষ এবং যানবাহনের ভীড়। কত লোক পায়ে হেঁটে চলেছে। তবু একমাত্র শৈবাল চৌধুরীর মুখ ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন আমার বাঁ-হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলছে, “দাদা, গাড়ী তো অনেকক্ষণ চলে গেছে। আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে?” ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে সহকর্মী তন্দ্রা বলে উঠলো, “ভিতরে চলুন। ফরেন সেক্রেটারী এসেছেন। ইউনাইটেড নেশনসে যাচ্ছেন আজ রাত্রে। কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রেজেনটেশন কিনতে চান, আপনাকে খুঁজছিলেন। তাঁকে আপনার অফিসে বসিয়ে এসেছি।”

অজান্তে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। বললাম, “চলো।”

বছরের প্রথম দিনের সকালেই এই অপ্রীতিকর ঘটনার পর, সারাদিন মনটা কেমন উদাস হয়ে রইলো। কোনো কাজেই ঠিকমতো মন দিতে পারছিলাম না। বেশির ভাগ সময় নিজের কামরায় বসে রইলাম। ঘুরে-ফিরে কেবলই শৈবাল চৌধুরীর কথা মনে আসছিলো। কোনোমতেই তাঁকে মন-থেকে বিদায় দিতে পারছিলাম না। ঠিক জানতাম না, কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হলো, সেই সংকট-মুহূর্তে শৈবাল চৌধুরীর যা হয়েছিলো, তাকেই বলে ব্যক্তিত্বের বিভাজন।

ডাক্তারী ভাষায় দুই বিরুদ্ধ সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আমার নাগালের বাইরে একটি দার্শনিক সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়েছিলাম,—মানুষের ব্যক্তিত্বের কোন্ বিশেষ রন্ধ্র থেকে তার অপরাধ-প্রবণতার জন্ম হয়। নীতির কোনো দেশ-কাল-নিরপেক্ষ মানদণ্ড আছে কি না। আমি যখন তার উত্তর খুঁজছি, ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠলো। ডাঃ দাসগুপ্তর টেলিফোন।

টেলিফোনে ডাঃ দাসগুপ্তর কথা শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত শৈবাল চৌধুরীকে ক্লিনিকে ভর্তি হতে হলো! বললাম, "আশা-করি আপনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন শৈবাল চৌধুরীর পরিচয়?"

"হ্যাঁ, সব জেনেছি। তাছাড়া ঘটনার পূর্ণ বিবরণও পেয়েছি। শৈবাল চৌধুরীর মনে নিদারুণ অনুশোচনা। কেবলই বলছেন, ডাক্তার, এ কি করলাম আমি! মিঃ সরকার আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি চুরির দায়ে অপরাধী।"

ভেবেছিলাম শৈবাল চৌধুরী সুস্থ, শান্ত মনে এখান থেকে চলে গেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা তো হয় নি। আমার মনের মধ্যে যে আশঙ্কা সারাদিন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো, শেষপর্যন্ত তাই সত্যে পরিণত হলো। তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নিজেকে কিরকম অপরাধী মনে হলো। বললাম, "ডাক্তার সাহেব, শৈবাল চৌধুরীর জন্যে আমি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন, তাঁর এ-অবস্থার জন্যে আমি দায়ী নই।"

"না, না, মিঃ সরকার, একেবারেই না। এ-ঘটনা আপনাদের ওখানে না ঘটে অন্য যে-কোনো জায়গায় ঘটতে পারতো। যে-মুহূর্তে তিনি টাইটি পকেটে রেখেছিলেন, সে-মুহূর্তে তিনি যদি রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যেতেন, তাহলে একটি ভয়ংকর এ্যাক্সিডেন্ট হতে পারতো। সে-ক্ষেত্রে পরিণতির কথা চিন্তা করলে আমি শিউরে উঠি। তিনি জীবিত থাকতেন কি না সন্দেহ। তাঁর পরম সৌভাগ্য, সে-সময় তিনি আপনাদের ওখানে ছিলেন। আর কেবল একটি টাই চুরির ওপর দিয়ে তাঁর ফাঁড়া কেটে গেলো।"

অবাক হয়ে বলে উঠলাম, "কি বলছেন আপনি, ডাক্তারবাবু!"

"ঠিক তাই। বাড়িয়ে কিছুই বলছি না। আপনি শৈবাল চৌধুরীর প্রতি যে পরিমাণ সহনশীলতা, সহানুভূতি, সমাদর এবং অনুকম্পা দেখিয়েছেন, তার জন্যে ডাক্তার হিসেবে, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আর সেই কারণেই তাঁকে সুস্থ করে তুলতে আপনার সহযোগিতার জন্যই আমার এই টেলিফোন।"

"সম্ভব হলে আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে রাজী। কিন্তু তাঁর হয়েছে কি?"

"সে অনেক কথা, দেখা হলে ডিটেলে একদিন বলবো। আপাততঃ জেনে রাখুন, টাই যখন শৈবাল চৌধুরী পকেটে রেখেছিলেন, ঠিক তখনই তিনি মোমেণ্টারি মেণ্টাল ব্ল্যাঙ্কনেসে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ তাঁর মন সাময়িকভাবে শাদা কাগজের মতো শূন্য হয়ে গিয়েছিলো। বলতে পারেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অকেজো হয়ে পড়েছিলো। সেই বিন্দুতে চেতনার ধারাবাহিক গতিতে ছেদ পড়ায় স্বভাবতই শৈবাল চৌধুরী তাঁর কাজের কারণ বলতে পারেন নি। কেবলই আপনাকে বলেছেন, আমি জানি না। মুশকিল এই, যা একবার হলো, তা আবার হতে পারে। এর ওপরে আছে অপরাধবোধের চাপ।"

"ব্যাপারটা তাহলে খুবই গুরুতর বলুন। এর কোনো প্রতিকার আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে আছে?"

"হ্যাঁ অথবা না, দুটোই বলা যায়। এটি নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়! কিন্তু যথাযথ চিকিৎসা হলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু এর প্রতিকার পুরোপুরি আমার হাতে নেই। আপনার কো-অপারেশন না-পেলে হয়তো আমার বেশী কিছু করবার থাকবে না। শৈবাল চৌধুরীর মতো স্পর্শকাতর মানুষ মাইট ওয়েল এণ্ড আপ ইন অ্যান অ্যাসাইলাম।"

"তার মানে পাগলা গারদ! কি বলছেন আপনি! নো, নো, ডক্টর, নট, ইফ আই ক্যান হেল্‌প ইট। নিশ্চয়ই আমি সহযোগিতা করবো।

বলুন, আমি কি করবো?" প্রায় উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলাম টেলিফোনে! থরথর করে আমার হাত কাঁপছে। গরম হয়ে উঠেছে আমার মাথা আর কান। হৃদয়ের স্পন্দনের আওয়াজ নিজের কানে বাজছে হাতুড়ি পেটার মতো। চেয়ার ছেড়ে কখন উঠে দাঁড়িয়েছি জানি না।

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে ডাঃ দাসগুপ্ত আমার চিৎকার শুনে কি ভাবলেন, কে জানে? কিঞ্চিৎ বিরতির পর তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "আমি জানতাম মিঃ সরকার, আপনার কো-অপারেশন পাবো।"

"সহযোগিতার জন্যে আমি প্রস্তুত।"

"শৈবাল চৌধুরীকে আপনি বলেছেন, টাইটি তাঁকে কিনে নিতে হবে। আমার অনুরোধ তাঁকে বাধ্য করবেন না ওইটি কিনতে।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু ব্যাপার কি?"

"তাঁর মন থেকে গিল্ট কমপ্লেক্স দূর করতে হবে। টাইটি যদি আপনি তাঁকে কিনতে বাধ্য করেন, তাহলে ওইটি গিয়ে উঠবে তাঁর ওয়ারড্রোবে। নয় কি? তারপর যতোবার ওয়ারড্রোব খুলবেন, ততোবারই তাঁর অপরাধের জলজ্যান্ত চিহ্ন চোখের সামনে ঝুলতে থাকবে। এর ফলে যা হবে, তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলে অবসেসন। কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না তাঁর অপরাধ। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা দূরের কথা, তিনি দ্রুতগতিতে অবনতির পথে এগিয়ে যাবেন।"

সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ দাসগুপ্তর কথাগুলি বার বার মনের মধ্যে ধাক্কা দিতে লাগলো। তাড়াতাড়ি বললাম, "তাই হবে ডাক্তার সাহেব। শৈবাল চৌধুরীকে টাইটি কিনতে হবে না। আই উড নট ইনসিস্ট অন ইট।"

"অজস্র ধন্যবাদ, সরকার সাহেব। অজস্র ধন্যবাদ।" তারপর একটু বিরতির পর আবার তাঁকে কথা বলতে শুনলাম। কিন্তু এবার তাঁর কণ্ঠস্বর যেন অত্যন্ত গম্ভীর মনে হলো, "শৈবাল চৌধুরী আপনাকে একটি স্বীকারোক্তি লিখে দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে-আত্মবিশ্বাস নিয়ে সেই কনফেসনাল স্টেট্‌মেণ্ট তিনি লিখেছিলেন, সে

আত্মবিশ্বাস এবং আপনার ওপর তাঁর আস্থা এখন ক্রমশঃ কমের দিকে। তিনি প্যানিকি, তাই অমনটা হওয়া স্বাভাবিক। এখন কেবলই বলছেন, ওই স্বীকারোক্তিটি হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়বে। ব্ল্যাকমেলের সম্ভাবনাও বাদ দিতে পারছেন না।”

“কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি, ডাক্তার সাহেব?”

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ডাক্তার দাসগুপ্ত বললেন, “ভাবছিলাম··· ।”

“বলুন?”

“ওই স্বীকারোক্তিটি কি নষ্ট করে ফেলা যায় না? অবশ্যি শৈবাল চৌধুরীর সামনেই এ-কাজটি করতে হবে।”

চমকে উঠলাম। শৈবাল চৌধুরী আমার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন! তাহলে তো আমাকে পুরোমাত্রায় সাবধান হতে হবে। শৈবাল চৌধুরীর মতো বহু নামী, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ধরা পড়েছেন শপ-লিফটিং-এর অপরাধে। মুক্তি পাবার পর তাদের মধ্যে ধর্মাধর্ম বিচার-শূন্য কয়েকজন শিল্পকেন্দ্র এবং আমাকে কতোই না বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছেন আক্রোশের তাড়নায়। তাদের প্রতিরোধ করার একমাত্র অস্ত্র তাদের নিজেদের হাতে লেখা এই কনফেসনাল স্টেট্‌মেণ্ট। এই স্বীকারোক্তি নষ্ট করার অর্থ একটা বড়ো রকমের ঝুঁকি নেওয়া। এমনিতেই আমাদের কাজে হাজারো অকুপেসন্যাল হ্যাজার্ড আছে। এটা হবে তার ওপরে আর এক কাঠি। শৈবাল চৌধুরী হয়তো তেমন কিছু করবেন না, তবুও হু নোজ্? এটা কেবল আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রতিষ্ঠানের মান-মর্যাদার প্রশ্ন। ডাঃ দাসগুপ্ত নিশ্চয়ই এই স্বীকারোক্তির মূল্য জানেন। তাই কল্পনা করতে পারলাম না, তাঁর মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ-প্রস্তাব করলেন কি ভাবে! ভুলে গেলাম এই মুহূর্তে শৈবাল চৌধুরী কেবল তাঁর একজন রোগী। নইলে কেন মনে হবে, শৈবাল চৌধুরীর মতো স্বনামধন্য মানুষের স্বার্থে তিনি আমার মতো একজন সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করতে সংকুচিত হচ্ছেন না? হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। মনে হলো দু কথা শুনিয়ে দিই ডাঃ দাসগুপ্তকে। কিন্তু সামলে নিয়ে

শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললাম, "না, ডাক্তার সাহেব, তা হয় না। ওই স্বীকারোক্তির মূল্যটুকু আশাকরি আপনাকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু আপনি এতোখানি লিবার্টি চাইবেন আমার কাছে, এটা আমি আশা করি নি। আপনি আপনার রোগীর স্বার্থে আমাকে গিনিপিগ করতে চান! র‍্যাদার এ টল অর্ডার, ইজন্‌ট্‌ ইট!"

কথাগুলি ডাঃ দাসগুপ্তর হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত দিলো জানি না। তাঁর আহত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, "আমার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে, মিঃ সরকার। আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার মতো মানুষকে বলি দেওয়া দূরের কথা, কাছে পেলে কতোই না খুশী হতাম। একদিন আপনার কাছে নিশ্চয়ই যাব। আশাকরি তখন এ ভুল-বোঝাবুঝির শেষ হবে।"

তাঁর কথা তিনি রেখেছিলেন। এসেছিলেন পরের দিনই। এসে দুঃখ করে বলেছিলেন, "আপনি তো জানেন আমি একজন স্পেশালিস্ট। আর ওই যে ওয়ান ট্র্যাক মাইণ্ড বলে একটা কথা শোনা যায়; ওটা স্পেশালিস্টের মন সম্বন্ধে যেমন খাটে, অমন আর কারো সম্বন্ধে খাটে না। যাক্, ওর আর দরকার হবে না। আমি একটি সাবস্‌টিটিউট প্রসেস্ খুঁজে নিয়েছি। এমনিতেই রুগীকে ভালো করে তুলবো।"

আর তিনি তা তুলেছিলেনও।

কিন্তু এই যে ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, তা অন্তরঙ্গতার পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে চললো। ছুটির পর প্রায়ই আমাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যেতেন তাঁর ক্লিনিকে। কিন্তু ক্লিনিক থেকে কবে যে তাঁর বাড়ীর ড্রইংরুমে বসে আড্ডা দিতে শুরু করেছিলাম, সে-কথা আজ আর মনে পড়ে না। সেখানেই মিসেস দাসগুপ্তার সঙ্গে পরিচয়। মিসেস সোনালী দাসগুপ্তা, আমার স্নেহময়ী সোনা বৌদি, যাঁর স্নেহ-সমুদ্রের সন্ধান পেতে আমাকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয় নি।

কিন্তু সে কাহিনী অন্য।

সেদিনের কথা আজও বেশ মনে পড়ে।

সেদিন ছিলো পঁচিশে ডিসেম্বর, ক্রিসমাস ডে। সেদিনও সকাল দশটা বাজতেই প্রতিদিনের মতো ভারতীয় শিল্পকেন্দ্র তৎপর হয়ে উঠলো। চব্বিশে ডিসেম্বর আজও কেন্দ্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। স্বাধীন ভারতের বয়স-বাড়ার সঙ্গে তার তাৎপর্য ম্লান হয়ে যায় নি। চব্বিশে ডিসেম্বর কেন্দ্রের নগদ বিক্রী ছিলো তিন লক্ষের উপর। সময়ের হিসেবে ধরলে এটি আগের সব রেকর্ড ভেঙ্গেছিলো। দৈনিক বিক্রীর পরিমাণ ঊর্দ্ধমুখী হলে সেটা প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের কাছে যেমন, কর্মীদের কাছেও প্রায় তেমনি সাড়া-জাগানো সুসমাচার; এর থেকে তারা পায় আত্মপ্রসাদ যা কিনা তাদের কৃতিত্বের হাতে-হাতে পুরস্কার। কিন্তু সঠিক অঙ্কটি জেনে যেতে গেলে একটু অপেক্ষা করতে হয়। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এটুকু অপেক্ষার শক্তিও কোনো কর্মীর মধ্যে বাকী ছিলো না। ছুটি হতে-না-হতেই প্রায় সকলেই চলে গিয়েছিলো। সেদিন আধ ডজন ক্যাশিয়ারের হিসেব মিলিয়ে সমবেত বিক্রীর অঙ্ক ঘোষণা করতে বেজে গিয়েছিলো রাত ন'টা। আমরা ক'জন, যাদের ওপর কেন্দ্র বন্ধ করার দায়িত্ব, উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলাম ফলাফল জানার জন্য। বিক্রীর মোট অঙ্ক ঘোষিত হওয়া-মাত্র একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলাম সকলে। পরস্পরকে অভিনন্দন জানিয়ে যখন কেন্দ্রের প্রবেশ পথের দরজায় তালা লাগালাম, তখন

নিজেকে পাখীর পালকের মতো হালকা লাগছিলো। কিন্তু এতো আনন্দের মধ্যেও ফুলের মধ্যে কাঁটার মতো একটি বেদনার অনুভূতি থেকে-থেকে ঠেলে উঠছিলো। আমার ছোট-বড়ো ডেডিকেটেড সহকর্মীরা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কর্মদক্ষতার ফলে রচিত হলো এই ইতিহাস, আজ সে-কথা কেউই জানতে পারলো না। ঘুমের মধ্যে আজকের দিনের স্বপ্ন হয়তো অনেকেই দেখবে। কিন্তু তাদের স্বপ্ন যে বাস্তবে পরিণত হয়েছে, সে কথা জানতে পারবে আগামীকাল সকালে।

পঁচিশে ডিসেম্বর একটু সকাল-সকাল কেন্দ্রে এসে হাজির হলাম। প্রথমেই গুদাম থেকে ব্ল্যাকবোর্ড আর স্ট্যাণ্ড তুলিয়ে এনে স্থাপিত করলাম কর্মীদের প্রবেশ পথের কাছাকাছি। মোটা-মোটা হরফে শাদা চক দিয়ে কালো বোর্ডের উপর লিখে দিলাম ঃ

"আন্তরিক অভিনন্দন।
কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতার
ফলে ইতিহাস রচিত হয়েছে গতকাল।
নগদ বিক্রীর মোট পরিমাণ ছিলো ৩,৩০,৮৫০ টাকা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্মীরা একে-একে আসতে লাগলো। শুরু হলো শিল্পকেন্দ্রের প্রাত্যহিক প্রবেশমুখী জনস্রোত। কিন্তু কেউ ব্ল্যাকবোর্ডের সুস্পষ্ট ঘোষণা এড়িয়ে ভিতরে ঢুকবে, তার জো কি। লেখা পড়ছে, আর থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; মুখে ফুটে উঠছে সার্থকতার হাসি। তারপর আর কি, শুরু হলো পরস্পরকে অভিনন্দন। সব শেষে সকলের মিলিত জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো শিল্পকেন্দ্র। এটা কোনো রাজনৈতিক দলের পায়তারা কষা নয়, খেটে-খাওয়া মানুষদের আনন্দের সহজ-সবল আত্মপ্রকাশ। ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে-ছিলাম, সকলের সঙ্গে করমর্দনে ব্যস্ত। সহকর্মীদের আনন্দোচ্ছ্বাস, তাদের গর্ব, আমার বুক ভরিয়ে দিলো।

দশটা বাজার একটু আগে, ব্ল্যাকবোর্ড সরিয়ে গুদামে পাঠিয়ে দিলাম। কেন্দ্রের প্রবেশপথ যথারীতি হাট-করে খুলে দেওয়া হলো। প্রতিদিনের মতো এক পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম অফিস ঘরে।

হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিলো না। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালাম। অলসদৃষ্টিতে কামরার ছাদের দিকে তাকিয়ে ধূমপানে ছিলাম নিমগ্ন। হঠাৎ মনে হলো একটি ব্যক্তিগত অভিনন্দন পত্র ছোটোবড়ো প্রত্যেক সহকর্মীর হাতে তুলে দিলে কেমন হয়! ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার অতিরিক্ত এই ব্যক্তিগত পত্র স্বীকৃতি দেবে প্রত্যেকের কর্মদক্ষতার, মনে জাগাবে আত্মপ্রসাদ এবং কাজের-উদ্দীপনা। কাগজ টেনে একটি খসড়া করলাম। লেখা শেষ করে কয়েকবার পড়লাম। মনে হলো মন্দ হয় নি। তবুও ভাবলাম একজন ইংরেজি-নবিশের মতামত নেওয়া ভালো। মনে এলো মিতালীর কথা। ডক্টর (মিস) মিতালী মিত্র। রাজধানীর বিখ্যাত এবং প্রাচীন সরস্বতী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা। মিতালী কলেজ-জীবনে কেবল আমার সহপাঠিনীই ছিলো না, পরিচয় আবাল্য। প্রায় সমবয়সী, হয়তো আমার থেকে বছর খানেকের ছোটই হবে। আমাদের বাবারা একই সরকারী দপ্তরে কাজ করতেন। অনেকদিনের বন্ধুত্ব তাঁদের। পাশাপাশি দুটি সরকারী কোয়ার্টারে ছিলো আমাদের আবাস। বাল্যে মিতালী ছিলো আমার খেলার সাথী, কৈশোরে অনুরাগী এবং যৌবনে প্রিয় বান্ধবী। ছাত্রী হিসেবে সে চিরকালই মেধাবী। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় কখনো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলো অক্সফোর্ড। ফিরে এসে ডক্টর মিতালী মিত্র এম. এ., পি. এইচ. ডি (অক্সন) যোগদান করলো সরস্বতী কলেজে। আবাল্য অধ্যয়নের মধ্যে ডুবে থাকার ফলে বোধহয় মনের মানুষের খোঁজ করার অবসর মেলে নি। ফলে আজও মিতালী অবিবাহিতা। কলেজ হস্টেলের ওয়ার্ডেন। টেলিফোন লাগানো তিন-কামরার ফ্লাটে নিঃসঙ্গ জীবনে তার সঙ্গে থাকে রান্না-বান্না আর দেখাশুনা করার জন্য নিঃসন্তান মধ্যবয়সী এক বাঙ্গালী বিধবা, যার সকল অনুশাসন মিতালী হাসি মুখে মেনে নেয়। মিতালীর স্থানীয় গার্জেন, সঙ্গের সাথী 'বিজলী দি'।

শিল্পকেন্দ্রের শপ-লিফটারের তালিকার একটি বিরাট অংশ জুড়ে

আছে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা। এরা জুভেনাইল ডেলিংকোয়েন্ট—আমার মতে কচি অপরাধী। এদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। ধরা পড়লে তাদের অভিভাবক, প্রিন্সিপ্যাল কিংবা হস্টেলের ওয়ার্ডেনদের হাতে তুলে দিয়ে থাকি। তাঁরাই যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন। থানা-পুলিশের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে মিতালীর সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করতে হয়েছে। তাছাড়া মিতালী শিল্পকেন্দ্রের একজন নিয়মিত খদ্দের। ইন্টিরিয়র ডেকরেশন তার হবি। যখনই আসে, কিনে নিয়ে যায় কিছু-না-কিছু ; খালি হাতে ফেরে না।

বড়দিন, মিতালীর কলেজ বন্ধ। বাড়ীতেই আছে নিশ্চয়ই। টেলিফোন করলাম। ওপার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "হ্যাঁ জী।"

বুঝতে পারলাম মিতালীর লোকাল গার্জেন! আমাকে ভালোই চেনে। ছু'চারটে কথার পর মিতালীকে ডেকে দিলো। এবার শুনতে পেলাম মিতালীর কণ্ঠস্বর, "এই যে! কি ব্যাপার মশাই! সাত সকালে টেলিফোন? ছুটি বুঝি?"

প্রয়োজনের কথা সরাসরি না-তুলে বললাম, "ধ্যাৎ, আমাদের আবার ছুটি! সাহেব বিবিদের থাকে বড়দিনের ছুটি। আমাদের মতো যারা গোলাম, এ-সময় তাদের কাজের চাপ আরো বাড়ে। অফিস থেকে বলছি। তোমার তো আজ কলেজ বন্ধ। তাই ভাবলাম একবার খবর নিই "

"খবর নেবে! শুনে ভয় হচ্ছে মশাই।"

বুঝলাম মিতালী "খবর লেনা" এই হিন্দী ইডিয়মটির সংগে জড়িয়ে একটু ছুষ্টুমি করছে। উত্তরে শোনা গেলো আমার একটু হাসির শব্দ।

এরপর কিছুক্ষণ পিং-পং কথাবার্তা হলো। অনেকদিন পর কল করছি, তাই মিতালীর দিক থেকে কিছু মান-অভিমানের পালা। ওর সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তাতে এসব চলে। কিন্তু এটাতো ঠিক সৌজন্যমূলক কল নয়। তাই কাজের কথায় চলে এলাম এক ঝটকায়, "কি জানো, ইংরেজিতে একটা ড্রাফট করেছি। ভাবলাম ডক্টর মিতালী মিত্র, এম. এ., পি. এইচ. ডি (অফ্লন)-এর অভিমতটা একবার জেনে নিই।"

"হয়েছে, হয়েছে, অনেক হয়েছে। একেবারে স্তুতি পাঠক! ফাজলামী ছেড়ে কাজের কথাটা পরিষ্কার করে বলো দেখি।"

"বিশ্বাস করো, সত্যি বলছি। তোমার মতামত আমি জানতে চাই। লেখাটি পড়ছি, তুমি কাইগুলি একটু মন দিয়ে শোনো।" শুরু করলাম, "ডিয়ার কলিগ,............"

এগোতে পারলাম না। কামরার দরজা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেলো। এক ভদ্রলোকের সাথে রতনলালের প্রবেশ। টেবিলের বিপরীতে এসে দাঁড়াবার আগেই মিতালীকে তাড়াতাড়ি বললাম, "একটু ধরো, ছেড়ে দিও না। এক ভদ্রলোক এসেছেন, দেখি কি ব্যাপার!"

একটিমাত্র কারণেই কোনো অজানা-অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে রতনলালের আমার কামরায় প্রবেশ ঘটতে পারে। আমি-যে ভদ্রলোকের আসার কারণ জানি, সে-কথা তাঁকে জানতে না-দেওয়ার উদ্দেশ্যে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় তাঁকে চেয়ারে বসতে বলছি। কিন্তু তিনি বসেন নি। কান থেকে রিসিভার সরিয়ে নিলাম। কিন্তু মিতালী যাতে আমার কথা শুনতে পায়, সেই কারণে রিসিভারের মুখ চাপা দিলাম না। ভদ্রলোককে বিনীত কণ্ঠে বললাম, "মাফ করবেন। আমি অত্যন্ত জরুরী একটি কল করছি। শেষ হতে কিছু সময় লাগবে। আপনি কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন! প্লিজ সিট ডাউন এ্যাণ্ড মেক ইয়োরসেল্ফ কাম্ফার্টেব্ল্।"

ভদ্রলোক তবুও বসলেন না। কোনো জবাব না-পেয়ে যেন একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি, এভাবে বললাম, "বসার যদি ইচ্ছে না-থাকে, তাহলে বরং এক কাজ করুন। কিছুক্ষণ কেন্দ্রের ভিতরে ঘুরে বেড়িয়ে উইনডো সপিং করুন। মিনিট দশেক পর ফিরে আসবেন। ততোক্ষণে আশাকরি আমার কাজের কথা শেষ হয়ে যাবে। হোপ ইট স্যুইটস্ ইউ!"

ক্ষেত্র তৈরী করেই রেখেছি। ইশারায় রতনলালকে কেবল মুখ বুজে থাকতেই জানাই নি, কামরার বাইরে চলে যেতেও বলে দিয়েছি।

কিন্তু এরপরও ভদ্রলোক কোনো কথা বললেন না। এ-টাইপ আমাদের জানা। আমাদের নিজস্ব ভাষায় বীটেন সাল্‌কি। অর্থাৎ ধরা পড়ে বাক্যি হরে গেছে। গুম হয়ে গেছে একেবারে। রতনলাল বাইরে যেতে, হাত নেড়ে হতাশার সুরে বললাম, "কতক্ষণ আর আমার লোক অপেক্ষা করবে? আপনি কোনো কথা বলছেন না দেখে চলে গেলো। যাইহোক, আপনি যদি দাঁড়িয়ে থাকা পছন্দ করেন, ইট ইজ ইয়োর অ্যাফেয়ার। আমি কিন্তু বসছি।"

উত্তরের অপেক্ষা না-করে চেয়ারস্থ হলাম। রিসিভার কানে তুলে মিতালীক বললাম, "ইয়েস, মিঃ ব্যানার্জী। স্যরি টু কিপ ইউ ওয়েটিং। মহারানীর আমাদের এখানে আসার দিনক্ষণ কি স্থির হয়ে গেছে?"

অন্যদিক থেকে, "হঠাৎ কি আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছো? তাও আবার ইংরিজিতে! মিঃ ব্যানার্জী কে? তোমার মাথার ঠিক আছে তো?"

"নাথিং রং মিঃ ব্যানার্জী।" বাকী কথাগুলো ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে হলো, "অতিথির সঙ্গে আমার আগের কথা শুনতে পেয়েছো?"

"পেয়েছি বইকি। তুমি তো মাউথপিস ঢেকে কথা বলো নি।"

"ইচ্ছে করেই ঢাকিনি। তোমাকে শোনার সুযোগ দিতে। হোয়াট ডু ইউ মেক অব ইট?"

"ব্লেসড্, ইফ আই নো।"

ধীরে ধীরে মিতালীকে বুঝিয়ে দিলাম একজন ভদ্রলোক শপ-লিফটার ধরা পড়েছেন। তাঁকে আমি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই, ফোনে দরকারি কথা বলার ছলে। এর ফাঁকে তাঁকে বেশ খুঁটিয়ে দেখাও হবে আর সেই সঙ্গে জানা যাবে একজন শিক্ষিত অপরাধী কতক্ষণ কথা না-বলে থাকতে পারে। মোট কথা মিতালীকে একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম। ও বুদ্ধিমতী, বেশী বলার দরকার করে না। ওই যে বলে ভারবাম সেপিনটি, অর্থাৎ এ ওয়ার্ড টু দ্য ওয়াইজ, তাই আর কি।

"বুঝলাম, কিন্তু তোমার ড্রাফ্‌ট?"

"আপাততঃ শিকেয় তোলা রইলো।"

"বেশ ভালো কথা। আমার পূর্ণ-সহযোগিতা তোমার জন্যে রইলো। আচ্ছা, কি রকম দেখতে ভদ্রলোককে?"

"গায়ের রং পশ্চিমবাসীদের যেমন হয়ে থাকে। গৌরবর্ণ না-হলেও বেশ পরিষ্কার। বলিষ্ঠ চেহারা। মনে হয় পঞ্চনদবাসী কিংবা প্রতিবেশী কোনো প্রদেশের। সুবিন্যস্ত একমাথা ঘন কালো আকর্ণলম্বিত বাবরি চুল। মুখে কোনো ব্যক্তিত্ব কিংবা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি না। উচ্চতায় আমারই মতো। পরনে ধূসর গরম দোনলা আর গায়ে পিঙ্গল...... গেট মি?"

"কোয়াইট। গ্রে ট্রাউজার্স এ্যাণ্ড ব্রাউন কোট। বয়স?"

"কতো আর হবে! এক কুড়ি দশের আশে-পাশে।"

"অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছো ভদ্রলোককে। করছেন কি?"

"মাথা তুলেই দাঁড়িয়ে আছেন। বলতে ইচ্ছে হচ্ছে এ পেনি ফর ইয়োর থট। দৃষ্টি সরাসরি আমার দিকে নয়। আমার মতো তিনিও চোখের কোণা দিয়ে আমার মাপে-জোপে ব্যস্ত বলে মনে হয়। কিন্তু দাঁড়াবার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর ডান হাত শরীরের সঙ্গে চাপা। হাত ভেঙ্গে গেলে তেকোণা কাপড়ের স্লিং-এর মধ্যে যে অবস্থায় রাখা হয়, অনেকটা সেইরকম।"

"মুখের ওপর ভয়, দুশ্চিন্তা কিংবা নারভাশনেস-এর চিহ্ন ফুটে ওঠে নি? অস্বস্তিবোধ করছেন না?"

"ওঠেনি আবার! কপালে কালি পড়েছে—নিশ্চয়ই অস্বস্তির চিহ্ন। মুখের ফ্যাকাশেভাব মনে হয় বাড়ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি যে দ্রুত এবং গভীর তা জানিয়ে দেয় শরীরের সঙ্গে লাগা হাতের করাতি চাল। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। শরীরের ভার কখনো এ-পায়ে কখনো ও-পায়ে রাখছেন। ভাগ্যিস ও আসার আগেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলাম! হি কুডন্ট্ হ্যাভ চোজেন এ বেটার টাইম! পরিস্থিতি এখন আমার হাতে।"

"তুমি তো মনে হয় বেশ নির্বিবাদে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে কথা বলে চলেছ। কামরায় আর কে আছে?"

"কেউ না।"

উৎকণ্ঠিত স্বরে মিতালী বলে উঠলো, "বলো কি! ভদ্রলোক যদি তোমাকে হঠাৎ আক্রমণ করেন? দৌড়ে পালিয়ে গেলেই বা কে রুখবে?"

উত্তর দিতে গিয়ে বাধা পেলাম। টেবিলের ওপার থেকে ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোক মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলেন, "এক মিনিট, স্যার·"

ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে হাত তুলে ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে মিতালীকে বললাম, "এবার উটের পিঠে শেষ কুটোটুকু দিতেই শুধু বাকী। কথা বলার জন্যে অত্যন্ত আনচান করছেন। কোনোরকমে ঠেকিয়ে রেখেছি। তোমার শেষ কথার উত্তর: আক্রমণ অপরাধীরা করে না। কেন্দ্রের ইতিহাসে এ ধরনের উদাহরণ প্রায় নেই বললেই চলে। কোণঠাসা হয়ে পাগলের মতো কেউ যে পালাবার চেষ্টা করেনি, এমন নয়। বাট দে অল্ ড্র ব্ল্যাংকস্। একবার এক বিদেশী ছোকরা চেষ্টা করে প্রায় সফল হয়েছিলো। তার সঙ্গে কেন্দ্রের কর্মীদের ধস্তাধস্তির ফলে সেদিন অত্যন্ত গুরুতর এবং জটিল পরিস্থিতির সামনা সামনি হতে হয়েছিলো। কিন্তু সেদিনও শেষপর্যন্ত জয় হয়েছিলো আমাদের। সময় হলে একদিন এসো! শোনবার মতো কাহিনী।"

"বেশ ভালো কথা। খুব শিগগিরই আসছি। যাই হোক, কথা যখন বলতে চান ভদ্রলোক, তখন সুযোগ দাও। হয়তো সবকিছু স্বীকার করে নিজের মনকে হালকা করতে চান।"

ভদ্রলোকের দিকে এবার সরাসরি তাকিয়ে মিতালীকে বললাম, "দেখি তাহলে কি বলতে চান তিনি। কিন্তু একটি জিনিস আমি তাঁর সম্পর্কে শুরু থেকে লক্ষ্য করছি। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি বুকের ওপর থেকে ডান হাতটি সরালেন না। রীতিমতো সন্দেহজনক কি বলো? মনে হয় আক্ষরিক অর্থে আস্তিনের ওপরে কোনোকিছু লুকানো আছে। আর একটি নতুন উপসর্গ। কপালে দেখা দিয়েছে বড়ো বড়ো ঘামের ফোঁটা। তুমি ঠিকই বলেছো, মিতালী। আর দেরী করা যায় না। যাই হোক, ঘটনার অবশিষ্ট অংশ একদিন টেপ রেকর্ডে শুনে যেও।"

"টেপ রেকর্ড! তার মানে?"

সে-কথার উত্তর না-দিয়ে, পরিষ্কার ইংরিজিতে যেন কোনো ব্যানার্জী সাহেবের কাছে বিদায় নিলাম, "ও. কে., মিঃ ব্যানার্জী। মীট ইউ ইন্ ইওর অফিস টু-মরো এ্যাট টেন ইন্ দ্য মরনিং এ্যাণ্ড ফাইনালাইজ দ্য রেস্ট অফ্ দ্য প্রোগ্রাম দেন। থ্যাংকস্ এ লট। বাই।"

মিতালীকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে রিসিভার ক্রেডেলে রেখে দিলাম। কিছু না-জানার ভান করে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সুরে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম আমার অতিথির কাছে, "স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাকে বাধ্য হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। প্লিজ, কিছু মনে করবেন না। একটু আগে কি যেন আপনি বলতে চাইছিলেন? নাউ, আই এ্যাম্ রেডী ফর্ ইউ। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?"

কথা বলছিলাম বটে, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো ভদ্রলোকের উপর। তাঁর মুখের কোনো পরিবর্তন কিংবা প্রতিক্রিয়া যেন দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। উত্তর না-দিয়ে আগের মতোই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। সারা কপাল ঘামে চিকচিক করছে। মুখ থমথমে। ওঁকে কথা বলানোর জন্য কণ্ঠে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে বললাম, "আপনি হঠাৎ এতো ঘামছেন কেন? শরীর খারাপ লাগছে বুঝি? আমাদের কেন্দ্রের ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবো? তাছাড়া দাঁড়িয়েই বা আছেন কেন, প্লিজ বসুন না।"

উত্তরে কেবল কয়েকবার অল্প-অল্প মাথা দোলালেন ভদ্রলোক। কিন্তু আর বোধ হয় তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ছিলো না। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসলেন। আমার নকল আন্তরিকতা এবং সহানুভূতি হয়তো তাঁকে স্পর্শ করে থাকবে। ঠোঁটের সামান্য কম্পন দেখে মনে হলো যেন কথা বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না। ভয়ে কিংবা অজানা কোনো কারণে।

যে-সব শপ-লিফটাররা শিল্পকেন্দ্রে ধরা পড়ে, তাদের মধ্যে গরীব কিংবা

মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ আঙুলে গোনা যায়। অভাবের তাড়নায় অপরাধীর সংখ্যা, এক হিপিরা ছাড়া, খুবই অল্প। ধরা পড়ে উচ্চ-মধ্যবিত্ত কিংবা ধনী সমাজের মানুষেরাই। ধরা পড়ে অধিকাংশ হয়ে যায় সদ্য খোলস-ছাড়া সাপের মতো নির্জীব। সহানুভূতি এবং আন্তরিকতা দেখালে, লজ্জা, অপমান এবং অবমাননার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় অকপটে কবুল করে সব কিছু। এর পরের পর্বে এদের অনেককেই অল্প-বিস্তর হিস্টিরিক হতে দেখেছি। কিন্তু যাদের স্নায়ু অপেক্ষাকৃত সবল, যারা নিজেদের মনে করে চালাক-চতুর, তাদের ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা। সেখানে দেখাতে হয় ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড ও শেষ পর্যন্ত লৌহকপাটের ভীতি। দিতে হয় সংবাদপত্রে অপকীর্তির প্রচার কিংবা চাকুরীস্থলে খবর দেওয়ার হুমকি। কেউ একেবারে স্কট ফ্রি যেতে পারে না, সকলেই কমবেশী সাজা পায়। যে শাস্তি কঠোর ডেটারেন্ট না-হয়ে চরিত্র সংশোধনী নৈতিক শাস্তির রূপও নিতে পারে। কিন্তু সবই নির্ভর করে অপরাধীর ব্যবহার, স্বীকারোক্তি এবং অপরাধের গুরুত্বের উপর।

ভদ্রলোক বসে আছেন মাথা নীচু করে, নিঃশব্দে; মনে হয় ইনি প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। সহানুভূতি এবং আন্তরিকতা দেখানোতে তিনি ভিতরে ভিতরে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। কিন্তু তিনি যে-পর্যন্ত মুখ না-খুলছেন, সে-পর্যন্ত কোনো-কিছুরই নিষ্পত্তি হবে না। আমি কতক্ষণ এ-ভাবে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবো? পায়ের কাছে টেবিলের গায়ে লাগানো বোতামে পা দিয়ে চাপ দিলাম। কামরার বাইরে জ্বলে উঠলো সবুজ সাংকেতিক আলো আর সঙ্গে সঙ্গেই রতনলাল আবার কামরায় এসে ঢুকলো। তাকে দেখামাত্র ভদ্রলোক যেন কেঁপে উঠলেন। হাতের ইশারায় রতনলালকে কাছে ডাকলাম। কিছু-না-জানার ভান করে অসহায় কণ্ঠে তাকে বললাম, "ভদ্রলোক কোনো কথা বলছেন না, রতনলাল। উনি কি জন্যে এসেছেন বুঝতে পারছি না। তোমায় যখন সঙ্গে এনেছেন, তখন নিশ্চয়ই তোমার কিছু জানা আছে?"

আমার ভনিতা রতনলালকে সাবধান করার পক্ষে যথেষ্ট। আশা করেছিলাম, রতনলাল অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলার পর, আসল ব্যাপার

৭

বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু এতক্ষণ কামরার বাইরে অপেক্ষা করার ফলে, তার ধৈর্য্যচুতি ঘটে থাকবে। নইলে কোনোরকম গৌরচন্দ্রিকার আশ্রয় না-নিয়ে সরাসরি উগ্রকণ্ঠে কেন বলে উঠবে, "স্যার, আপনি এতক্ষণ এঁর সঙ্গে কি কথা বলেছিলেন জানি না। ইনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে আসেন নি, আমি ওঁকে ধরে এনেছি আপনার কাছে। চুরির অভিযোগে। এক কাঁড়ি জিনিস চুরি করে পোষাকের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন। সির্ফ চোট্টা নেহি, ডাকু হ্যায়, সাব।"

যে-পথ ধরে এগোবো বলে স্থির করেছিলাম, রতনলালের কথায় সে-পথে কাঁটা পড়লো। সব ভেস্তে দিলো উজবুকটা। হতাশা আর বিরক্তিতে মন ভরে গেলো। তবু মনের হতাশা দমন করে চোখেমুখে ফুটিয়ে তুললাম পরম বিস্ময়। বললাম, "সে কি কথা! আমি তো ভেবেছিলাম, ভদ্রলোক নিজের কোনো কাজে এসেছেন।"

রতনলালের ভাষায় যা জানা গেলো, তা এইরকম—

কার্যোপলক্ষে রতনলাল তখন চর্ম বিভাগে পরিক্রমারত। বিভাগে খদ্দেরদের বেশ ভীড়। বেশভূষা আর গতিবিধি দেখে বোঝা দায় যে রতনলাল শিল্পকেন্দ্রের একজন কর্মী। রং-বদলানো গিরগিটির মতো সেও খদ্দেরদের মধ্যে মিলেমিশে আছে। তার স্বভাবসিদ্ধ সজাগ দৃষ্টি উপস্থিত সকলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে তাদের অজান্তে। তার দৃষ্টি হঠাৎ এই ভদ্রলোকের উপর স্থির হয়ে গেলো। ঘুরে-ফিরে পণ্যদ্রব্য নাড়াচাড়া করছেন। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন। কোনো-কিছু কেনার আগ্রহ আছে বলে রতনলালের মনে হলো না। প্রকৃত খদ্দেরদের পক্ষে এ-ধরনের আচরণ অস্বাভাবিক। যেমন ওদেশে বলে, স্মেল্ড এ র‍্যাট, রতনলালের তাই হলো। সে যেন ইঁদুরের গন্ধ পেলো নাকে। সে দেখলো, সামনের পণ্যদ্রব্য পেরিয়ে উপস্থিত খদ্দের এবং বিভাগের কর্মীদের দিকেই ভদ্রলোকের নজর যেন বেশী। হাতে তুলে কোনো জিনিস দেখার ভান করছেন, কিন্তু আসলে চোখের কোণা দিয়ে খদ্দের এবং কর্মীদের কে কোথায় আছে, যাচাই

করছেন। তার টেরচা চাউনি মনে সন্দেহ জাগায়। ভালোভাবে চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে, রতনলাল নিশ্চিন্ত হলো যে ভদ্রলোক একা, নিঃসহচর। তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলো ভদ্রলোকের উপর।

এক সময় তিনি রিভলভিং স্টেনলেস স্টিলের স্ট্যাণ্ড থেকে একটি সাপের চামড়ার বেল্ট তুলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। তারপর কোমরে বেঁধে দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। যেন ট্রাই করছেন ; পরীক্ষা করে দেখছেন মানায় কি না। সে-সময় তাঁর কাছেপিঠে কোনো খদ্দের ছিলো না এবং বিভাগের কর্মীরা ছিলো ব্যস্ত। নিজের মনে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হয়ে থাকবেন যে সকলের অজান্তে এবং অগোচরে তিনি কোমরে বেল্টটি বেঁধে নিতে পেরেছেন। বেল্ট-বাঁধা অবস্থাতেই আবার শুরু হলো তাঁর বিভাগ পরিদর্শন। কখনো দেখছেন দস্তানা, কখনো ওয়ালেট, কখনো-বা ব্যাগ। এক সময় সরে গিয়ে বেশকিছু সময় কাটালেন কোলাপুরী চপ্পল দেখে। চপ্পল দেখতে-দেখতে এক-সময় বন্ধ করলেন কোটের বোতাম দুটি। বেল্ট চলে গেলো লোক-চক্ষুর আড়ালে। মোডাস অপারেন্ডি দেখে রতনলালের মনে হলো, ভদ্রবেশী পেশাদার চোরের শুভাগমন হয়েছে নিশ্চয়ই। নিজেকে আরো সাবধান করে নিলো। তারপর এইভাবে আরো কিছুক্ষণ কাটবার পর ধীর-পায়ে ভদ্রলোক চর্ম বিভাগ ছেড়ে চললেন আর বেড়ালের মতো সতর্কপায়ে রতনলাল তাঁকে অনুসরণ করলো। মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টির বাইরে হতে দিলো না তাঁকে।

পুরুষ বিভাগ। ভদ্রলোক অপূর্ব কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলেন সেখানে। আগের মতো সুযোগ খুঁজতে বেশী সময় নষ্ট করলেন না। তাঁর আত্ম-বিশ্বাসের পারা তরতর করে উপরে চড়ছে। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পকেটস্থ করলেন একটি নয়, দুটি নয়, পুরো আধ ডজন টাই। তাঁর কর্মদক্ষতা তারিফ করার মতো, হাত সাফাইয়ের কাজে পেশাদার ঘাগী চোরের মুন্সীয়ানা। মোকাবিলার সম্ভাবনা এবং পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত হতে যাচ্ছিলো রতনলাল, কিন্তু তার আর সময় পেলো না।

পুরুষ বিভাগে কাজ শেষ করে ইতিমধ্যে ভদ্রলোক নূতন কর্মক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

শিল্পকেন্দ্রের কৃত্রিম অলঙ্কার বিভাগ একটি বিশেষ আকর্ষণ। সোনার অলঙ্কার ব্যবহারের রেওয়াজ আজ প্রায় উঠে যাচ্ছে। তার জায়গায় এসেছে কৃত্রিম অলঙ্কারের যুগ। সোনার দাম গগনস্পর্শী, রূপোর দামও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কারিগরেরা বাধ্য হয়ে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে বিকল্প হিসেবে কৃত্রিম অলঙ্কার প্রস্তুতিতে। হস্তশিল্প বিদ্যার ক্রমোন্নতির সঙ্গে আধুনিক রুচিসম্পন্ন নূতন নূতন ডিজাইনের কৃত্রিম অলঙ্কার দেখা দিচ্ছে প্রতিদিন। মহিলাদের রং-মিলিয়ে বেশভূষা করার ফ্যাশন এখন এক নূতন উচ্চতায় পৌঁছেছে। মাথায় চুল আর দেহের বর্ণের সঙ্গে ম্যাচ করে অঙ্গসজ্জার জন্য বাছাই করতে হয় শাড়ী, চোলি, শাল, অলঙ্কার এবং পাদুকা। একই ভাবে পছন্দ করতে হয় ঠোঁটের রং আর নখের পালিশ। হাতে নিতে হয় ম্যাচিং ব্যাগ। শিল্পকেন্দ্রের কৃত্রিম অলঙ্কার বিভাগে সবসময় খদ্দেরদের ভীড়। কর্মীরা এখানে কাজের চাপে রুদ্ধশ্বাস। শপ-লিফটিং-এর সুযোগ সুবিধা সীমায়িত রাখবার জন্য অস্বচ্ছ কাঁচের তৈরী কাউন্টারের ভিতরে সাজানো থাকে কারিগরদের অপূর্ব সৃষ্টি। নানা ডিজাইনের হাতের চুড়ি, পায়ের তোড়া, কানের দুল, গলার হার···আরও কতো কি! কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় সবকিছু, কিন্তু সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। খদ্দেরদের নির্দেশ অনুযায়ী, বাহারী অলঙ্কার কাউন্টারের ভিতর থেকে গ্লাসটপের উপর রেখে দেওয়া হয়। অপছন্দ অলঙ্কার অবিলম্বে সোজা ফিরে যায় স্বস্থানে কাউন্টারের ভিতরে।

ভদ্রলোক বিভাগের কর্মীদের নির্দেশে-নির্দেশে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। হাসিমুখে ক্রমান্বয়ে বলে চলেছেন, এটা দেখাও, ওটা দেখাও, এটা কি জিনিস, ওটার কতো দাম। কর্মীরা কেবল ভদ্রলোককে নয়, সেই সঙ্গে অন্যান্য খদ্দেরদের প্রতিও সমান মনোযোগী। দূর থেকে রতনলাল দেখলো, ভদ্রলোক যেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। আত্মপ্রসাদে ডগমগ। কর্মীদের তাড়া দিয়ে একরাশ অলঙ্কার কাউন্টারের উপর জড়ো

করে নিয়েছেন। খদ্দেরদের ভীড়ের চাপে কর্মীরা হিসেব রাখতে পারে নি, কোথা থেকে কতো জিনিস কাউন্টারের উপর জড়ো করিয়েছেন ভদ্রলোক। জাদুকরের প্যাটার-এর মতো অনর্গল কথা বলার সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে রসিকতার মেশাল দিয়ে, বিভাগের কর্মী এবং আশেপাশের খদ্দেরদের কেবল হাস্যোদ্দীপনই করছেন না, সকলকে করে দিয়েছেন অন্যমনস্ক। তাঁর কথার জাদুতে সকলে যেন হিপনোটাইজড্।

তারপর যা শুরু হলো তা আরও আশ্চর্য। যেন পথের ধারে ডুগডুগি বাজিয়ে অগণিত জনতার চোখের উপর বাজীকরের খেলা। রতনলালের ভাষায় 'মাদারিকা খেল্'। অবলীলাক্রমে করে চলেছেন নিপুণ হাতসাফাইয়ের কাজ। সকলের অজান্তে কয়েকটি কানের দুল, পায়ের তোড়া, ব্রোচ, আংটি চোখের নিমেষে অন্তর্হিত হলো তাঁর কোটের পকেটে। পরিশেষে লোক-দেখানো হিসেবে কয়েকটি অলঙ্কার কিনলেনও। তারপর সকলকে প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে পরিত্যাগ করলেন কৃত্রিম অলঙ্কার বিভাগ। ধূলো দিলেন সকলের চোখে। বাজীকরের বাজী মাত। কিন্তু বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে আপন মনেই হয়তো তখন হেসেছিলেন। ভদ্রলোকের কর্মদক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রসাদ দেখে রতনলাল ভাবলো, খেলাটা কতদূর গড়ায় শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তাই সোজা ধরে নিয়ে আমার কামরায় হাজির করার প্রবল ইচ্ছা দমন করে সূতোটা আলগা করলো। নিজে রইলো ভদ্রলোকের অনুসরণরত। মাছকে খেলিয়ে তোলার কায়দা রতনলালদের সকলেরই ভালো জানা।

যাকে নিয়ে এতো কাণ্ড, সেই নাটের গুরু অনেকক্ষণ আর কিছু করলেন না। অলস গতিতে এদিকে-ওদিকে সাজানো পণ্যদ্রব্য দেখে বেড়াতে লাগলেন। মৃত্তিকা বিভাগ, হাতির দাঁত বিভাগ, চিত্রকলা বিভাগ পরিদর্শন সেরে হাজির হলেন ধাতু বিভাগে। কিন্তু সময় নষ্ট করলেন না সেখানে। তড়িৎগতিতে কয়েকটি পিতলের ছোটো-ছোটো জিনিস আত্মসাৎ করার পর, সরে গেলেন যেখানে বিভিন্ন জাতের কাঠের তৈরী হস্তশিল্প বিক্রী হয় সেদিকে। সাহারানপুরের সিসম, কাশ্মীরের আখ্‌রোট, মধ্যপ্রদেশের টিক, আন্দামানের শ্বেত, দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ

চন্দন এবং গোলাপগন্ধী কাঠের জিনিস। অত্যন্ত আকর্ষকভাবে সেল্‌ফে, মাটিতে আর দেওয়ালের গায়ে সাজানো। সারা বিভাগ একবার পরিক্রমা সেরে, ভদ্রলোক স্থির হয়ে দাঁড়ালেন দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো গোলাপগন্ধী কাঠের উপর হাতির দাঁতের কাজ করা একটি কারুশিল্পের কাছ-ঘেঁষে। রতনলালের তাঁর হাবভাব দেখে মনে হলো, তিনি বিধাতা না-হলেও নিদেনপক্ষে হর্তা-কর্তা। ময়দান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে নিশ্চয়ই স্থির করছেন পরবর্তী কর্মপদ্ধতি।

ভদ্রলোককে আর চুরি করার সুযোগ খুঁজতে হলো না। রতনলালই করে দিলো। যেন ছিপের সুতো ছেড়ে দিয়ে বঁড়শীর মাছকে এবার ডাঙ্গায় তুলতে চায়। এক ফাঁকে বিভাগের মহিলা কর্মীদের ক্ষণিকের জন্য বিভাগ পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়ে, নিজে বেশ কিছু দূরে সুবিধেমতো দাঁড়াবার জায়গা বেছে নিলো। বিভাগে উপস্থিত খদ্দেররা কিংবা ভদ্রলোক নিজে জানতে পারলেন না কিছু। কেবল রতনলালের নির্দেশ এবং ব্যবহার দেখে মাধুরী আর উমা বুঝে নিলো তাদের বিভাগে শপ-লিফটারের উদয় হয়েছে। রতনলালকে তার কাজ করার সুযোগ দিতে তারা দু'জনে দূরে সরে দাঁড়ালো। এমন জায়গায় গিয়ে পজিসন নিলো যেখান থেকে সারা বিভাগের উপর নজর রাখা যায়।

ওদিকে শুরু হয়েছে ভদ্রলোকের 'কাজ'। চন্দন এবং গোলাপ-গন্ধী কাঠের কয়েকটি পেপার কাটার, সিগারেট হোল্ডার, চাবির রিঙের মতো ছোটো-ছোটো জিনিস পকেটে ফেলে সরে দাঁড়ালেন, যেখানে সাজানো রয়েছে একের পর এক ছোটোবড়ো বিভিন্ন আকারের চন্দন কাঠের দেবদেবীর মূর্তি। রতনলাল লক্ষ্য করলো, কোটের বোতাম দুটি খুলে দিলেন ভদ্রলোক। তারপর এক নিমেষে সারা বিভাগে একবার চোখ্ বুলিয়ে নিয়ে, এক ফুটের একটি চন্দন কাঠের মূর্তি কোটের নীচে বুকের ডানদিকে লুকিয়ে ফেলে, উপর-হাত দিয়ে চেপে ধরলেন কোটের উপর থেকে। কোটের বোতাম বন্ধ হতে দেরী হলো না। রতনলাল সরে গিয়ে বাইরে বেরুনোর পথের মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। এবার মাধুরী আর উমাও যা দেখবার দেখেছে। তারা হতবাক।

ভদ্রলোক এবার কাঠের বিভাগ ছেড়ে যাচ্ছেন দেখে, রতনলাল উত্তেজিত হলো, বঁড়শিতে মাছ গাঁথা হয়ে গেছে। ডাঙ্গার কাছে মাছ এসে পৌঁছচ্ছে। আর দেরী করতে পারলো না। এক্সিটের কাছাকাছি হতেই, কোনো কথা না বলে, কোনো ভদ্রতা না দেখিয়ে, সে অতর্কিতে ভদ্রলোকের কাঁধ চেপে ধরলো। তিনি এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করা মাত্র, মাধুরী মুখ ফসকে চিৎকার করে উঠলো, "চোর, চোর।"

ভদ্রলোক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রতনলাল তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালো। খদ্দেরদের দৃষ্টি তাদের উপর। তাদের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। চোখেমুখে নিদারুণ ভয়ের অভিব্যক্তি নিয়ে, ভদ্রলোক যেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন রতনলালের দিকে। মনে হলো এ-মুখ যেন চেনা-চেনা, এর আগে কয়েকবার আশেপাশে দেখেছেন। রতন-লালের ভূমিকা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতেই, লজ্জায় তিনি মাথা নীচু করলেন। রতনলাল বলে উঠলো, "অনেক হয়েছে, স্যার। এবার দয়া করে চলুন ম্যানেজার সাহেবের দপ্তরে।"

এই হচ্ছে তাহলে আমার ঘরে ভদ্রলোকের উপস্থিতির ইতিহাস। অবাক কাণ্ড! সাদামাটা ভাষায় একে চুরি ছাড়া আর কি বলে? যে মানুষ সারা কেন্দ্র পরিক্রমা করে, একের পর একটি জিনিস চুপিসাড়ে নিজের পোষাকের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে পেরেছেন, পোষাক-আশাকে সর্বতোভদ্র হলেও, তাঁকে চোর বলা ছাড়া গতি নেই। যতদূর জানি, ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ব স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত ছাড়া এ-কাজে সফলতা মেলে না। তবে কি ইনি ভদ্রবেশী পেশাদার চোর? তাহলে তো পুলিশের হাতে সোপর্দ করতেই হয়। কিন্তু আপাততঃ কোনো কিছু করার আগে তাঁর পরিচয়, পেশা, পারিবারিক পটভূমি ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। না-হলে বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা এড়ানো যাবে না।

যে-সব পণ্যদ্রব্য ভদ্রলোকের পোষাকের নানা জায়গায় লুকোনো আছে, তাদের কথা এখন উল্লেখ করার দরকার নেই। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শিথিল করে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট

ধরালাম। চেয়ার মৃদু মৃদু দুলতে লাগলো। মনে যাই থাক, নিতান্ত হালকা ভাবে প্রশ্ন করলাম, "আপনার নাম জানতে পারি?"

মাথা নীচু করে আগের মতোই বসে রইলেন তিনি। দৃষ্টি টেবিলের উপর থেকে সরলো না। জবাব না-পেয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, "আপনার নাম?"

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। আগের মতোই ডান হাত দিয়ে বুকের কাছটা চেপে আছেন। কোনোমতে দু হাত জোড় করে মিনতি জানালেন, "স্যার, আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

আমি যেন তাঁর কথা শুনি নি। আর একবার নাম জিজ্ঞেস করলাম। চেয়ারে হেলান দেওয়া অবস্থায় দুলতে দুলতেই প্রশ্ন করে চলেছি। তিনি হয়তো এবার আমার অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। মাথা নীচু করে বলে উঠলেন, "শিবকুমার শর্মা।"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন, "থাকেন কোথায়?"

"নৈনিতাল।"

"রাজধানীতে আসার কি কারণ?"

"ব্যক্তিগত কাজেই এসেছি।"

"কোথায় উঠেছেন এখানে?"

"শ্বশুরবাড়ী।"

"কদ্দিন হলো বিয়ে হয়েছে?"

"প্রায় বছর চারেক।"

"একা এসেছেন, না সস্ত্রীক?"

"সস্ত্রীক।"

"ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"একটি ছেলে।"

"শ্বশুরবাড়ীতে কে কে আছেন?"

"শ্বশুর, শাশুড়ী আর শ্যালক।"

"আপনার স্ত্রীর ভাই বোন ক'টি?"

"এক ভাই। কোনো বোন নেই।"

"শালাবাবু কি করেন ?"

"ডাক্তারী পড়ে।"

"শ্বশুরমশাই ?"

"শল্য-চিকিৎসক। নিজের নার্সিং হোম আছে।" মুখ খোলার পর, শিবকুমারের কথা বলতে আর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

একটু বিরতির পর আবার শুরু করলাম, "শ্বশুরমশাই কেবল শল্য চিকিৎসকই নন ; নার্সিং হোমের মালিকও। আপনি তো দেখছি ধনী পরিবারে বিয়ে করেছেন। ডাক্তার সাহেব তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়েতে নিশ্চয়ই খুব খরচা করেছিলেন ! আপনার ভাগ্য রেখা খুবই উজ্জ্বল !"

কিন্তু তখন কি জানতাম কে এই শিবকুমার শর্মা, কী তাঁর পরিচয় ! জানলে হয়তো ভাগ্য রেখার কথাটা তুলতাম না। শিবকুমার কোনো উত্তর না-দিয়ে মাথা নীচু করলেন। হঠাৎ বললাম, "কি যেন বলছিলেন শ্বশুরমশায়ের নার্সিং হোমের নাম ?"

"ডাঃ গুলেরিয়াজ নার্সিং হোম।" শিবকুমারকে নার্সিং হোম সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন এর আগে করি নি, কিন্তু সে-কথা ভাবার সময় তিনি পেলেন না। কথার মধ্যে হঠাৎ কোনো অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলে সাধারণতঃ সদুত্তরই পাওয়া যায়। তবুও যাচাই করার উদ্দেশ্যে টেলিফোন ডাইরেকট্রি তুলে নিতে, শিবকুমার চমকে উঠলেন আতঙ্কে। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "না, না, শ্বশুরমশাইকে টেলিফোন করবেন না। সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমি মুখ দেখাতে পারবো না। প্লিজ।"

শিবকুমারের দিকে না-তাকিয়ে ডাইরেকট্রির পাতা উল্টোতে উল্টোতে বললাম, "টেলিফোন করবো কি না-করবো সে পরের কথা। আপাততঃ দয়া করে একটু চুপ করে বসে থাকুন, আমাকে কাজ করতে দিন।"

খুঁজে পেলাম 'ডাঃ গুলেরিয়াজ নার্সিং হোম'। রাজধানীর অভিজাত ফ্রেণ্ডস কলোনীর ঠিকানা। ডাঃ গুলেরিয়ার বাড়ীর ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বরও পেয়ে গেলাম। নার্সিং হোম, বাড়ীর ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বরগুলি একটি কাগজে লিখে নিয়ে, মুখ তুলে শিবকুমারের

দিকে তাকালাম। ভয়ে কাঁটা, জড়সড় হয়ে বসে আছেন। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর-লেখা কাগজের উপর। তাঁর মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-সমীক্ষায় ফিরে এলাম। বললাম, "নৈনিতালে আর কে থাকেন ?"

"কেউ না। কেবল আমরাই। মানে আমি, আমার স্ত্রী এবং ছেলে।"

"কি করেন নৈনিতালে ?"

"চাকরী।"

"মা, বাবা এবং ভাইবোনেরা কোথায় ?"

"বাবা বম্বেতে থাকেন। মা অনেকদিন হলো, মারা গেছেন। আমার কোনো ভাইবোন নেই। একমাত্র সন্তান আমি।"

"বাবা বম্বেতে কি করেন ? কোথায় থাকেন ?"

"একটি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটর। মালাবার হিলসে নিজের বাড়ী। একলাই থাকেন। মা চলে যাবার পর, দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেন নি। পিসিমা, বাবার নিঃসন্তান বিধবা বড়ো বোন, তাঁকে দেখাশুনা করেন।"

ছোকরা বলে কি? বাবা ম্যানেজিং ডিরেকটর, মালাবার হিলসে নিজের বাড়ী! শ্বশুর সার্জেন, নার্সিং হোমের মালিক! শিবকুমার কেবল অর্থশালী ডাক্তারের একমাত্র জামাতা নয়, ধনী ম্যানেজিং ডিরেকটরের একমাত্র সন্তান। যাকে বলে রোলিং ইন মানি! তাহলে এতোগুলি জিনিস চুরি করতে গেলেন কেন ? এ পর্যন্ত যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি ভাববার মতো বটে। শিবকুমারকে আরোও জানবার আগ্রহ বেড়ে গেলো। শ্বশুরের নাম-ধাম লেখা কাগজটি ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, "লেখাপড়া কোথায় করেছেন ?"

"সিমলায়।"

"আপনার বাবা থাকেন বম্বেতে। সিমলায় কার কাছে থেকে পড়াশুনা করেছেন ?"

"আমি সম্পূর্ণ একলা মানুষ হয়েছি বলতে পারেন। ছাত্রাবস্থা কেটেছে আমার স্কুল কলেজের হস্টেলে। প্রথমে সিমলায় বিশপ জন-স্কুল; মধ্যে রাজধানীর সেণ্ট পল্‌স্‌ কলেজ এবং শেষে লুধিয়ানা এগ্রিকালচরল ইউনিভার্সিটিতে।"

"কদ্দূর লেখাপড়া করেছেন?"

"এগ্রিকালচরে এম. এসসি।"

"পরীক্ষার ফলাফল কেমন ছিলো?"

থেমে গেলেন শিবকুমার। কোনো উত্তর না-দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। মনে হলো গভীর চিন্তামগ্ন। মুখের উপর যেন লজ্জা, সঙ্কোচ আর দ্বিধার ছায়া। কি যেন বলতে চান, কিন্তু পারছেন না। ভাবলাম পরীক্ষার ফলাফল হয়তো ভালো ছিলো না। সেই কারণে সুবিধে মতো কোনো চাকরী না-পেয়ে হয়তো নৈনিতালের মতো ছোটো শহরে গিয়েছেন জীবিকা অর্জনের জন্য। কিন্তু তখন জানতাম না আমার সিদ্ধান্ত আগাগোড়াই ভুল। জানতাম না কে এই শিবকুমার শর্মা, কি-বা তাঁর পেশা। যাই হোক, আশ্বাসের সুরে বললাম, "চিরকাল ভালো স্কুল-কলেজে পড়েছেন। সে-রকম ভালো ফলাফল যদি না-হয়ে থাকে, সে জন্যে সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। সব মানুষের সব কিছু কি হয়?"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিবকুমার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে কথা নয়, মিঃ সরকার। যে শিক্ষা আমার গৌরবের, তা প্রকাশ করতে আজ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। জীবনে আমি কোনো-দিন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিনি। গলায় গোল্ড মেডেল আর হাতে স্কলারশিপ নিয়ে আমার শিক্ষা শুরু এবং সমাপ্তি। কিন্তু········"

কথা শেষ করতে পারলেন না। এতোক্ষণ পর এই প্রথম শিব-কুমারের গাল বেয়ে নেমে এলো অনুতাপের অশ্রুধারা। কিন্তু এ-ধরনের অনুতাপের সম্মুখীন হওয়া আমার কর্মজীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যে মানুষ শিক্ষা-দীক্ষার পরও নিজেকে সংযত করতে শেখে নি, তার প্রতি মেলোড্রামাটিক অনুকম্পার দিন আমার পার হয়ে গেছে। ইদানিং ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে শপ-লিফটারদের সম্পর্কে কোনো

সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমার কোনো সিদ্ধান্ত অনেক সময় নির্দয় বলে মনে হয়, কিন্তু কঠোর কর্তব্য-পালনের পর একজন কর্তব্যনিষ্ঠ বিচারকের মতোই আমি অনুতপ্ত। শিবকুমারের প্রতিটি উক্তি প্রমাণ-সাপেক্ষ। কেবল মুখের কথায় বিশ্বাস করে এগোতে পারি না। তাঁর কৃত কর্মের বিশ্লেষণ এখনও অসমাপ্ত। কাল বিলম্ব না-করে শুরু করলাম, "আপনি ধনীর একমাত্র সন্তান এবং অর্থশালী ডাক্তারের একমাত্র জামাতা। আপনার ছাত্রজীবনের প্রতি পর্বে রয়েছে হীরের চোখ-ধাঁধাঁনো দ্যুতি। এমন যোগাযোগ বেশি লোকের জীবনে হয় না। কিন্তু এ-পর্যন্ত যে সব কথা বলেছেন, যেমন নাম, ধাম, শিক্ষা, পরিচয় ইত্যাদি, সে সব যে নির্ভেজাল সত্যি, তার প্রমাণ কি ?"

শিবকুমার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে আরো একটু বিশদ হলাম, "আমার প্রমাণ চাই। আদালতে গ্রাহ্য হয় এমন প্রমাণ এবং তা দেওয়ার দায়িত্বও আপনার। এর ওপর নির্ভর করছে আপনার ভবিষ্যৎ।"

শিবকুমারের চক্ষুস্থির! কি বলবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। হঠাৎ কানে এলো তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বর, "বিশ্বাস করুন, মিঃ সরকার, আমি একটি কথাও মিথ্যে বলি নি। আমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি তথ্য সত্যি। কিন্তু প্রমাণ দিতে বলে আমাকে একটু মুশকিলে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে কোনো প্রমাণপত্র আমার সঙ্গে নেই।"

"তা যদি হয়, আমি আপনাকে হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারি। যেমন ধরুন আপনার নাম আর ঠিকানা। আপনার ভিজিটিং কার্ড আছে ?"

"আছে, কিন্তু সঙ্গে নেই।"

"আপনার স্ত্রী আশাকরি বাড়ীতেই এখন আছেন।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তো সব ল্যাঠা চুকে গেলো। আপনার স্ত্রীর সঙ্গেই টেলিফোনে কথা বলছি।"

ভয়ার্তকণ্ঠে শিবকুমার বলে উঠলেন, "না, না, দয়া করে আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করবেন না। সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমার জীবন একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে।"

এবার কিঞ্চিৎ কড়া সুরে বললাম, "দেখুন মিঃ শর্মা, একথা আগে ভাবা উচিত ছিলো। আপনার জীবন বরবাদ হলো কি থাকলো, সে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই। দরকার হলে কেবল আপনার স্ত্রী নয়, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই আপনার অপকীর্তি জানাতে দ্বিধা করবো না।" শিবকুমারকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখালো। যেন তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। এবার কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে আশ্বাসের সুরে মৃদু হেসে বললাম, "কিন্তু এখনো অবশ্য সে অবস্থা দেখা দেয় নি। আপাততঃ এইটুকু বলতে পারি, আপনার অপকীর্তি গোপন রেখেই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। যাচাই করে নেবো আপনি এ পর্যন্ত যা-যা বলেছেন তার সত্যতা। আর আমার ওপর যদি আস্থা না-থাকে তো সে-কথা বলুন। আমি অন্য রাস্তা ধরতে বাধ্য হবো, তবে তা আপনার মনঃপূত হবে কি না সন্দেহ।"

জবাবের আশায় অপেক্ষা করে রইলাম। নত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শিবকুমার অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন, "বেশ, তাহলে তাই করুন।"

ডায়ালের শেষ সংখ্যাটি ঘুরে আসতেই মহিলা কণ্ঠস্বর কানে এলো, "হ্যালো।"

"নমস্কার। আমি শিবকুমার শর্মার সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

শিবকুমারের ছু'কান খাড়া হয়ে উঠেছে। ব্যাকুল নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, "নমস্কার। জানতে পারি আপনি কে কথা বলছেন?"

"নিশ্চয়ই। আমি শিবকুমারের কলেজ-বন্ধু। ভি. কে. রাঘবন। আপনি কি মিসেস শর্মা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; কিন্তু উনি তো এখন বাড়ীতে নেই।"

"নমস্তে ভাবিজী, নমস্তে। শিবকুমার কোথায় গেছে বলতে পারেন ? বেলা এগারোটার সময় ভারতীয় শিল্প কেন্দ্রে আমাদের মিলিত হবার কথা। কিন্তু এগারোটা বেজে গেলো, অথচ তার দেখা নেই। তাই ভাবলাম একবার ফোন করে দেখি।"

"উনি তো বেশ কিছুক্ষণ হলো বাবার গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, উনি ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের স্কলারশিপ পেয়েছেন। আজ রাত্রে ন্যু ইয়র্ক যাচ্ছেন তিন বছরের জন্যে। ওখানকার শিক্ষক এবং সহকর্মীদের জন্যে কিছু প্রেজেণ্টেশন কেনার জন্যে বেরিয়েছেন। ব্যাঙ্ক হয়ে শিল্প কেন্দ্রেই তো যাবার কথা।"

শুনে আমি হতবাক। গলা যেন শুকিয়ে গেছে। ঢোক গিলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। এতোক্ষণ ধরে কথা বলে চলেছি দেখে শিবকুমার যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। কেবলই উস্‌খুস করছেন। কিন্তু তিনি জানতে পারলেন না, তাঁর সম্পর্কে কি অমূল্য তথ্য আমি জেনে ফেলেছি। তিনি যা-যা বলেছেন তা সবই সত্যি। প্রমাণের আর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কে এই শিবকুমার, ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের স্কলারশিপ নিয়ে যাচ্ছেন ন্যু ইয়র্ক! কি তাঁর প্রকৃত পরিচয় ? মিসেস শর্মার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। অযথা সময় নষ্ট না-করে বললাম, "ন্যু ইয়র্ক যাবার কথা নৈনিতাল থেকে আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলো, শিবকুমার। গতকাল তার সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছিলো। স্থির হয়েছিলো, দুজনে আজ পরামর্শ করে প্রেজেণ্টেশন-গুলি পছন্দ করবো। মনে হয় ব্যাঙ্কে আটকে গেছে। এখুনি নিশ্চয়ই এসে যাবে। আচ্ছা, ভাবিজী, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। নমস্তে।"

"নমস্তে, ভাইসাব।"

রিসিভার রেখে দেখি, শিবকুমার ইতিমধ্যে মাথা নীচু করে বসে আছেন। আমার কথা শুনে এবার বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য আমার হাতে এসেছে। লজ্জা এবং আত্মগ্লানিতে

শিবকুমার যেন আভূমি নত ; তাঁকে বেশ খানিকটা অবাক করে দিয়েই আমি ব্যবসাদারী গলায় বলে উঠলাম, "মিঃ শর্মা, যে সব জিনিসগুলি চুরি করেছেন, টেবিলের উপর দয়া করে রাখুন তো।"

শিবকুমার মুখ তুলে প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। বুঝলাম তাঁর পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়েছি। নির্দেশ পালনে বিলম্ব দেখে, রতনলাল এগিয়ে আসছিলো। বোধহয়, নিজের হাতে জিনিসগুলি শিবকুমারের কাছ থেকে উদ্ধার করে দেখাতে চায় নিজের কাজের সফলতা। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অদম্য উৎসাহ। হাত তুলে মানা করলাম। তাঁর উৎসাহে শীতল জল নিক্ষিপ্ত হলো ; একটি দীর্ঘশ্বাসে বোঝা গেলো তার হতাশার পরিমাণ। নিঃশব্দে আমার পিছনে এসে দাঁড়ালো। শিবকুমারকে আবার বললাম, "দেরী কেন ? জিনিসগুলি টেবিলের উপর রাখুন।"

যেন সম্বিত ফিরে পেলেন শিবকুমার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। একটির পর একটি জিনিস টেবিলের উপর চলে এলো। যে ডান হাত এ-যাবৎ বুকের কাছে শরীরের সঙ্গে ছিলো চাপা, সেটিকে সামান্য শিথিল করে, অন্য হাতে কোটের তলা থেকে বের করলেন চন্দন কাঠের খোদাই-করা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি। তারপর কোট এবং ট্রাউজারের বিভিন্ন পকেট থেকে বেরিয়ে এলো, আধ ডজন সিল্ক টাই, চার জোড়া রুপোর কানের দুল, কয়েকটি পায়ের তোড়া, ব্রোচ, দুটি নকল পাথর-বসানো হাতের আংটি, দুটি পিতলের ছোটো মূর্তি, দশটি চন্দন কাঠের লেটার-ওপনার, এক ডজন মীনা-করা ছোটো-ছোটো পিতলের রেকাবী এবং আরও কতো কী। কাজ শেষ করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন শিবকুমার। জিনিসের পরিমাণ দেখে আমার চক্ষুস্থির! এক উচ্চশিক্ষিত মানুষ, যিনি আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাড়ি দেবেন ন্যু ইয়র্কের পথে, তিনি একাজ করলেন কেন ? ক্রাইম স্টোরীতে যে মোটিভ খোঁজার কথা থাকে, সেটা এখানে কোন কাজে লাগাতো ? বলার মতো কোনো কথা মনে আসছিলো না। নিজের নিষ্ফলতায় একটি হালকা ক্রোধ মনের মধ্যে চিন্‌চিন্ করতে লাগলো।

এর পরই আর একটি ঘটনা মনে আসতেই উষ্মা বেড়ে উঠলো। মুখের পেশীগুলি যেন কঠিন হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু নিজেকে সংযত করে টেবিলের উপর রাখা জিনিসগুলির দিকে শিবকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "এই সব? না আরও কিছু লুকানো আছে? যদি থাকে ভালোয়-ভালোয় বের করে দিন, নইলে সার্চ নিতে বাধ্য হবো।" চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর নিজের কানেই বিকৃত শোনালো। শিবকুমারের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলা কতো কঠিন বুঝলাম।

"না, স্যার, আর কিছু নেই।"

পিছন-থেকে রতনলালের চাপা কণ্ঠস্বর কানে এলো, "স্যার· · · ।"

ঘাড় না-ফিরিয়েই, হাত তুলে তাকে বাধা দিলাম। জানি ও কি বলতে চায়। কিন্তু সে-বিষয় এখন তুলবো না। শিবকুমার যাচ্ছেন ন্যু ইয়র্ক, ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের স্কলারশিপ নিয়ে। তাহলে তাঁর পেশা কি? বলেছিলেন নৈনিতালে চাকরী করেন। কিন্তু কিসের চাকরী? শিক্ষকতা? হতে পারে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচরল ইনস্টিটিউট-এ চাকরী? তাও হতে পারে। প্রকৃত পেশা জানবার আশায় আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম, "কোথায় শিক্ষকতা করেন?"

"নৈনিতাল এগ্রিকালচরল ইউনিভার্সিটি।" পেশা তাহলে শিক্ষকতাই। লুধিয়ানা থেকে এম· এসসি করার পর পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতা। কিন্তু শিবকুমারের মতো হীন মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষের শিক্ষকতা করার কোনো অধিকার কি থাকা উচিৎ? শিক্ষকতার মতো দায়িত্বশীল পেশা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করে, নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলাম "আপনি শিক্ষক! কি বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেন, জানতে পারি কি? নিশ্চয়ই চুরি বিদ্যে। আপনার মতো শিক্ষকের হাতে যারা দেশের ভবিষ্যত তৈরী করার ভার দিয়েছেন তারা জানেন না তারা কি অবিবেচনার কাজ করছেন। কিন্তু আপনাকে কি বলবো! আপনি বিষাক্ত সাপের থেকেও ক্ষতিকারক। এ-পেশায় কোনো অধিকার আপনার নেই। হাতে ক্ষমতা থাকলে, আপনাকে কেবল

বরখাস্তই করতাম না, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিস্তৃত প্রচার করতাম আপনার অপকর্মের কাহিনী।"

কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি দ্রুত হতে দ্রুততর হয়ে উঠলো। মাথা নীচু করে শিবকুমার নিঃশব্দে সহ্য করছেন তিরস্কার। এর মধ্যে তড়িৎগতিতে চেয়ার ছেড়ে একেবারে শিবকুমারের মুখের কাছে হাজির হয়ে কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়ালাম। আমার আচরণ শিবকুমারের কাছে দুর্বোধ্য, এই অপ্রত্যাশিত সম্মুখীনতায় যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। যেন কোনো আসন্ন আঘাত থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি। আমি কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হঠাৎ শিবকুমারের কোমরে বাঁধা চুরি করা সাপের চামড়ার বেল্ট ধরে সজোরে এক হ্যাঁচকা টান দিলাম। আচম্বিত শরীরে টান পড়ায় তিনি টাল খেলেন। স্থির হয়ে দাঁড়াতে আমি তাঁকে কিছুটা ভর্ৎসনা করেছিলাম। রতনলালকে বললাম, "ভালো করে সার্চ নাও। পকেটগুলোতে যা কিছু আছে, সব বের করে টেবিলের ওপর রাখো।"

তল্লাসী নিয়ে রতনলাল একটি চামড়ার বড়ো ধরনের ওয়ালেট, চেক বই, ধূমপানের পাইপ, লাইটার আর তামাকের পাউচ, রঙ্গিন চশমা, রুমাল এবং একটি কলম টেবিলের উপর রাখলো। লক্ষ্য করলাম, রতনলাল সবগুলি পকেট ভালো ভাবে দেখলো কিন্তু বাদ গেলো ট্রাউজারের পিছনের পকেটটি। উত্তেজনার বশে হয়তো ভুলে গেলো, কিংবা ওটা আর সার্চ করা দরকার মনে করলো না। সেখানে কিছু রাখতে দেখেনি বোধহয়। কাজ শেষ করে রতনলাল সরে দাঁড়াতে শিবকুমারকে বললাম, "আপনার ওয়ালেট খুলে দেখতে চাই, কোনো আপত্তি আছে?"

"না, আপত্তি কিসের।"

ওয়ালেট খুলতেই প্রথমে নজর পড়লো অশোকস্তম্ভ মার্কা ভারত সরকারের নীল পাসপোর্ট। পাতা উল্টোতেই দেখলাম শিবকুমারের নাম।

একে একে ওয়ালেটের অন্যান্য জিনিসগুলি টেবিলের উপর রাখলাম। আন্তর্জাতিক, ভ্যাকসিনেসন সার্টিফিকেট, প্যান-আমেরিকানের দিল্লী-ন্যু ইয়র্ক বিমান যাত্রার একটি টিকিট, ক্লিপে-অাঁটা একতাড়া নোট এবং কিছু খুচরো। আর একটি শাদা লেফাফা। বিমান যাত্রার টিকিট খুলে দেখি যাত্রার দিন ছাব্বিশে ডিসেম্বর, সময় ০১'২৫ মিনিট অর্থাৎ আজ মধ্যরাতের পর। নোটের তাড়ায় দু হাজার তিনশো টাকা। একেবারে নতুন করকরে ব্যাঙ্ক নোট। নিশ্চয়ই সদ্য ব্যাঙ্ক থেকে তোলা। শিবকুমারের স্ত্রী ঠিকই বলেছিলেন। আর, শাদা লেফাফার উপর টাইপ করা নাম ও ঠিকানার দিকে তাকাতে, কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে গেলো আমার দৃষ্টি। প্রশ্ন জাগলো শিবকুমারের কাছে ন্যু ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নাম-লেখা লেফাফা থাকার কারণ কি! বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে মাথা তুলতেই দেখি শিবকুমার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শাদা লেফাফার দিকে। আমার কৌতূহল দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। নিশ্চয় কোনো রহস্য রয়েছে এই লেফাফাটি ঘিরে। অথচ লেফাফার মুখ বন্ধ করা হয় নি। আলগা ত্রিকোণ অংশটি কেবল ভিতরে ঢোকানো। তদন্তকারীর অধিকার নিয়ে চিঠিটি টেনে বের করলাম; অমনি শোনা গেলো শিবকুমারের কণ্ঠস্বর, "স্যার, ওটা পড়বেন না। অত্যন্ত ব্যক্তিগত চিঠি।"

চিঠি পড়তে মানা-করার একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে ওর মর্ম আমি জেনে ফেললে উনি অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে যাবেন। কিন্তু কেন? এমন নয়, যে এটি তাঁর গোপন প্রেমপত্র। শিবকুমারের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। মাথা নীচু করে চিঠির কাগজের ভাঁজ খুললাম। পুরু শাদা ধবধবে কাগজের শিয়রে নীল কালি দিয়ে এমবস্ করা পত্র-লেখকের পরিচয় ও ঠিকানা:

উপাচার্য

নৈনিতাল এগ্রিকালচরল ইউনিভার্সিটি

নৈনিতাল: ইণ্ডিয়া।

আর তার নীচে টাইপ করা,

"ডিয়ার ডঃ জনসন,

দিস ইজ টু ইনট্রোডিউস ডঃ শিবকুমার শর্মা, এ ব্রিলিয়ন্ট স্কলার এ্যাণ্ড এ টিচার অব আওয়ার ইউনিভার্সিটি, অ্যাবাউট হুম আই হ্যাড………"

আর এগোতে পারলাম না। আমার চোখে-মুখে বিস্ময়, মুখ তুলতেই শিবকুমারের উদ্বিগ্ন দৃষ্টির সঙ্গে চোখোচোখি হলো! সে দৃষ্টিতে আকুল মিনতি। কোনো কথা না-বলে চিঠির অবশিষ্ট অংশ পড়লাম।

এম. এস-সি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর, লুধিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েই গবেষণা করে পি. এইচ-ডি হয়েছেন শিবকুমার। আন্তর্জাতিক কৃষিজগতে তিনি স্বনামধন্য এবং হাই ইলডিং ভ্যারাইটি গমের বিষয় একজন বিশেষজ্ঞ। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের স্কলারশিপ নিয়ে তিনি তিন বছরের জন্য যোগদান করছেন ন্যু ইয়র্ক এগ্রিকালচরল কলেজে, উচ্চতর গবেষণার জন্য। ন্যু ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জনসনকে লেখা এটি শিবকুমারের পরিচয় পত্র।

পড়া শেষ হলো। শিবকুমার ইতিমধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন অন্যত্র। দেখা যাচ্ছে তাঁর মুখের প্রোফাইলটুকু। ডঃ জনসনকে যে চিঠিতে শিবকুমারের স্বপরিচয় জানানো হয়েছে, সেই গৌরবময় পরিচয়ের বিপরীত ফলপ্রকাশ শিবকুমারকে লজ্জা আর আত্মগ্লানিতে ভরিয়ে তুলেছে। নইলে তাঁর দু চোখ বেয়ে এমন অঝোর ধারায় দুর্বার জলের স্রোত নেমে আসবে কেন? ভাবছিলাম কি বিচিত্র এই মানুষের মন! কখন যে সে কোন দিকে বাঁক নেবে তার বোধহয় স্থিরতা নেই। জানি না শিবকুমারের মতো স্বনামধন্য উচ্চ-শিক্ষিত, সুস্থ এবং নিঃসন্দেহে ধনী মানুষ, কিসের প্রভাবে, কোন সপ্তম রিপুর তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হন, আর এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন! কিন্তু এ-সব ভাবার পরও নরম হলো না আমার মন। মনে হলো শিবকুমারের শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও, একজন পেশাদার চোর এবং তাঁর কাজের মধ্যে যখন টুইডিলডাম আর টুইডিলডি-র মধ্যে যতোটুকু

পার্থক্য, তার বেশি পার্থক্য নেই, তখন শাস্তির ব্যাপারে তারতম্য থাকবে কেন? আজ যদি শিবকুমারের বদলে ধরা পড়তো কোনো পেশাদার চোর, তাহলে কি করতাম? কর্তব্য স্থির করার উদ্দেশ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সিগারেট ধরিয়ে কামরার মধ্যে শুরু করলাম পায়চারী। হঠাৎ মনে হলো সার্চের সময় রতনলাল শিবকুমারের ট্রাউজারের পিছনের পকেটটা তো দেখে নি। ভাবলাম এই ত্রুটিটুকু আমিই সেরে নেবো। কিন্তু শিবকুমারের মুখোমুখি হতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। ভয়ে আড়ষ্ট। হঠাৎ ট্রাউজারের পকেটের উপর হাত রাখতেই তিনি দু' পা পিছিয়ে গেলেন। বুঝলাম এখানে সন্দেহজনক কিছু আছে। কড়া স্বরে দু হাত তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলাম।

পকেট থেকে বেরোলো আনকোরা নতুন চারটি সিল্ক টাই। না, এগুলি আমাদের কেন্দ্রের নয়, কিন্তু প্রাইস ট্যাগের উপর ছাপা কুতুবমিনারের প্রতীক জানিয়ে দিলো, টাইগুলি 'তন্তুবায় কেন্দ্রে'র তৈরী। শিবকুমারের কাছে এগুলি এলো কি ভাবে? যদি কিনে থাকেন, তাহলে ওয়ালেটের ভিতর কিংবা অন্য কোনো পকেটে ক্যাশ-মেমো পাওয়া গেলো না কেন? ফেলে দিয়েছেন? হতে পারে। কিন্তু জিনিস কিনে কি কেউ ট্রাউজারের পিছনের পকেটে রাখে? অস্বাভাবিক নয় কি? তবে কি এগুলিও চুরির মাল? মিসেস শর্মা বলেছিলেন, ব্যাঙ্ক থেকে শিবকুমারের সরাসরি শিল্পকেন্দ্রে আসার কথা। কিন্তু তা তিনি আসেন নি। তিনি যদি এর আগে তন্তুবায় কেন্দ্রে গিয়ে থাকেন, তবে সময়ের এই ফাঁকটুকুর হিসেব মেলে। তন্তুবায় কেন্দ্র থেকে চুরি করার সম্ভাবনাই যেন মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করলো। সাবধানে প্রশ্ন করলাম, "টাইগুলি চমৎকার। কিনলেন কোথায়?"

"না, না, এগুলি আমি কিনি নি। আমার বন্ধু জলি, চেনেন কি না জানি নে,—রাজধানীর একজন প্রসিদ্ধ এক্সপোরটার,—জলি আমাকে এগুলি প্রেজেণ্ট করেছে। এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। তার কারখানাতেই তৈরী।"

শিবকুমারের এই চট-জলদি উত্তর আমার সন্দেহকেই সমর্থন করলো। উনি তাহা মিথ্যা বলছেন। জানেন না কুতুবমিনারের প্রতীক তন্তুবায় কেন্দ্রের টাইয়ের জন্য রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক। অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে না। মনের ভাব গোপন করে আন্তরিকতার সুরে বললাম, "প্রেজেন্ট? মানতেই হবে প্রেজেন্ট হিসেবে খুবই ভালো জিনিস।"

স্রোতের টানে ভেসে-যাওয়া মানুষের মতো হাতের কাছে হঠাৎ এক ফালি কাঠের টুকরো পেয়ে চেপে ধরলেন শিবকুমার আত্মরক্ষার আশায়। বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "হবে না! জলি আমার অনেক দিনের বন্ধু যে। ন্যু ইয়র্ক যাচ্ছি শুনে, অভিনন্দন জানাতে এসে, টাইগুলি আমাকে প্রেজেন্ট করেছে।"

ধৈর্য ধরে রাখা আর সম্ভব হলো না। চিৎকার করে বলে উঠলাম, "শ্যাট আপ, ইউ লায়ার। নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিৎ। দাঁড়ান, আমি এখুনি তন্তুবায় কেন্দ্রে ফোন করছি।"

কথা শেষ করে নিজের আসনে ফিরে এসে রিসিভার ছোঁয়ামাত্র, শিবকুমার আমার হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, "স্যার, আপনি ঠিকই ধরেছেন। এ-টাইগুলো, চুরি-করা।"

রিসিভার রেখে দিলাম। পুনরায় অস্থিরগতিতে শুরু হলো আমার পদচারণা। রতনলালের দিকে নজর পড়তেই সে বিব্রতভাবে নড়েচড়ে উঠলো। সার্চ করার সময় শিবকুমারের ট্রাউজারের পিছনের পকেট সে ছুঁয়ে দেখেনি। এই ভুলের জন্য বোধহয় বিব্রত বোধ করছে। নজর ফিরিয়ে চেয়ারে ফিরে এলাম। শিবকুমারকে পুলিশের হাতেই তুলে দিতে হবে। টেবিলের উপর রাখা জিনিসগুলির মোট মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি শাদা কাগজ টেনে তৈরী করলাম একটি তালিকা। মোট মূল্য দাঁড়ালো প্রায় বারোশো টাকা। শিবকুমারের দিকে তালিকাটি এগিয়ে দিয়ে বললাম, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিঃ শর্মা। বারোশো টাকার জিনিস চুরি করার অপরাধে আপনাকে হাজতে যেতে হবে।"

"আমি ক্ষমা চাইছি আর সব টাকা দিয়ে দিচ্ছি।"

"তা হয় না, মিঃ শর্মা। আপনি ক্ষণিক লোভের বশবর্তী হয়ে একটিমাত্র জিনিস তুলে নেন নি। একে শপ-লিফটিং বললে কমিয়ে বলা হয়। এ তো ডাহা চুরি। তন্তুবায় কেন্দ্রে ঢোকা থেকে শুরু করে, আমার কামরায় হাজির হওয়া পর্যন্ত আপনার কাজের বিশ্লেষণ করলে কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো যায়। সেটি হলো, এ-সব স্থির মস্তিষ্কে পূর্ব-পরিকল্পিত চুরি। এ-অপরাধের ক্ষমা নেই। আপনাকে যেতে হবে লৌহকপাটের আড়ালে। ন্যু ইয়র্ক রবার্ট এফ কেনেডী বিমানবন্দরে আকাশ যাত্রাটি আপাততঃ বাতিল হলো।"

উপহার কেনার উদ্দেশ্যেই বাড়ী থেকে শ্বশুর মশায়ের গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলেন শিবকুমার। সঙ্গে ছিলো চেক বই। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সদুদ্দেশ্যেই গিয়েছিলেন তন্তুবায় কেন্দ্রে। ইচ্ছে ছিলো, কয়েকটি সিল্কের টাই কেনার। দৈবক্রমে তাঁর নজর পড়লো টাই পছন্দে ব্যস্ত এক ভদ্রলোকের দিকে। তিনিও টাই পছন্দ করছিলেন। শিবকুমার আড়চোখে দেখলেন, ভদ্রলোক ভালোভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটি টাই নিজের কোটের পকেটে পুরে দিলেন। বিস্ময়ে শিবকুমার হতভম্ব। সম্বিত ফেরার আগেই ভদ্রলোককে নির্বিবাদে তন্তুবায় কেন্দ্র ছেড়ে চলে যেতে দেখলেন। তন্তুবায় কেন্দ্রের কোনো কর্মচারীর হাতে ধরা পড়লেন না। কিছুক্ষণ তার চলার পথে তাকিয়ে থেকে শিবকুমার আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন ঘটনার বিষয়টি। চুরি করা কতোই না সরল, কতোই না সহজ!

ধীরে ধীরে শিবকুমারের মনেও দেখা দিলো প্রলোভন, প্রাণে জেগে উঠলো সাহস। তারপর তিনিও একটির পর একটি করে চারটি টাই হাতের অনায়াস ভঙ্গীতে কোটের পকেটে পুরে, এক সময় এসে দাঁড়ালেন তন্তুবায় কেন্দ্রের বাইরে। ধরা পড়লেন না। মুহূর্তের জন্যেও কেঁপে ওঠেনি তাঁর হাত, দেখা দেয়নি মনের মধ্যে কোনো দ্বিধা। সমস্ত কাজটি যেন আপনা-হতে হয়ে গেলো। আর এই ধরা-না-পড়া

হলো তাঁর কাল! তাঁর কাছে মনে হলো এ-এক নতুন খেলা, এই দাম-না-দিয়ে জিনিস তুলে নেওয়া। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পকেটে পুরে নিলেই জিনিসটা কেমন নিজের হয়ে যায়। না, টাকার কথা তিনি ভাবেন নি, টাকা বেঁচে যাওয়া এ-কমকাণ্ডের একটি বাই-প্রডাক্ট। বাড়তি লাভ বলা যায় হয়তো, কিন্তু এতে মজাই বেশী। শিবকুমারের হাতে জাদু ছিলো-কি-ছিলোনা জানি না, কিন্তু মেজাজে ছিলো নিশ্চয়ই। তবু তিনি জাদুকরের লাইন নেন নি। তাই তাঁর ভানুমতির খেল নতুন পথ খুঁজে নিলো। ধরা-পড়ার সম্ভাবনার কথা মুহূর্তের জন্য উদিত হলো না তাঁর মনে। তন্তুবায় কেন্দ্রে ধরা না-পড়ার ফলে, মনে তাঁর দেখা দিলো দুর্জয় সাহস। নব-আবিষ্কৃত চুরির ক্ষমতাকে পাথেয় হিসেবে বেছে নিয়ে সদর্পে তন্তুবায় কেন্দ্র পার হয়ে এসে পৌঁছলেন ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রের প্রবেশ পথে। তারপর শুরু হলো তাঁর 'কাজ'।

আমি চুরিই বলবো, না-বলে উপায় কি? কিন্তু তাতে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে কি না, সে অন্য কথা। তাঁর সাহস এবং আত্ম-বিশ্বাস ক্রমশঃ চরমে গিয়ে পৌঁছলো। মনে করেছিলেন, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এক সময় শিল্পকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু জানতেন না শিল্পকেন্দ্রের সিকিউরিটির ব্যবস্থা। চিনতেন না ওসমান, রতনলাল, ব্রিজভূষণ, প্রেমসিংদের। ধরা পড়ে গেলেন।

শাস্তির কথা জানিয়ে দিয়ে চুপ করলাম। কিন্তু এতো হাকিমের নির্দেশ নয় যে, শুধু শুনিয়ে দিয়েই বিচারকের কর্তব্য শেষ। এখানে হাকিমের নির্দেশ কাজে পরিণত করার দায়িত্ব শাসনকার্য পরিচালকদের। শিল্পকেন্দ্রে আমাকে শোনাতে হয় নির্দেশ এবং সে-নির্দেশ কাজে পরিণত করার জন্য আইনের কর্ণধারদের শরণ নিতে হয়। সেও আমাকেই। এ কর্তব্য পালন মাঝে মাঝে বড়ো কঠিন, বড়ো যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।

এই ঘটনা শোনার পর তাঁকে ছেড়ে দিতে পারলেই হয়তো খুশী হতাম। হয়তো তিনি এক ধরনের মরবিড ইনফ্যান্টিলিজম্-এর শিকার। পরে ডাক্তার কৃপাসিন্ধু দাসগুপ্তর অনুমান শুনেছিলাম।

একে বলে পোটেনশিয়াল প্যারনিয়া। মাঝে মাঝে বাস্তববোধ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। হয়তো ছেলেবেলায় ঘটা কোনো ট্রম্যাটিক অভিজ্ঞতা এর পিছনে কাজ করছে। কিন্তু যে শিক্ষিত মানুষ রাজধানীর দু'টি সুপ্রসিদ্ধ বিভাগীয় বিপণী থেকে, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় হাজার দেড়েক টাকার মতো জিনিস চুরি করতে পারেন, তাঁর কাজের সামাজিক গুরুত্বকে কী করে অস্বীকার করবো? শিবকুমার অপেক্ষা করে আছেন, আমার নির্দেশের। তাঁর জোড়-করা হাত আমার দিকেই ফেরানো। চোখ-যে কথা বলতে পারে, তার যেন জলজ্যান্ত প্রমাণ পেলাম। তারপর কানে এলো শিবকুমারের কম্পিত কণ্ঠস্বর, "আমি চুরি করেছি। আমি অপরাধী। দোহাই আপনার, হাজতে পাঠিয়ে পুলিশের নথীপত্রে নাম লিখিয়ে, আমাকে দাগী চোরে পরিণত করবেন না।"

কর্তব্যের মুখোমুখী হয়ে দিশাহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো শিবকুমারের মতো অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত। আইনানুসারে এ-অপরাধের শাস্তি কারাবাস। কিন্তু কারাদণ্ড সমাপ্তির পর শিবকুমার তো অপরাধীর ছাপ নিয়ে লৌহকপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবেন। তখন দেখা দেবে নিত্যনূতন সমস্যা,—ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক। এসব কঠিন সমস্যা সমাধানের কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের দেশে। সুতরাং পুলিশের নথীপত্রে অপরাধীর তালিকা-বৃদ্ধি ঘটিয়ে শিবকুমারকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া সমাজ-সচেতন লোকের পক্ষে কঠিন।

সবই ঠিক। যদি ওভার্ট অ্যাক্ট-এর কথা ধরা যায় তবে শিবকুমার অপরাধী। তাঁকে বিচার বিভাগের সামনে থেকে আড়াল করার অধিকার কি আমার আছে! পরে, শাস্তি দেওয়া-না-দেওয়া বিচারকের এক্তিয়ারভুক্ত। নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে বসে আমি যেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি সমস্যার আবর্তে। শিবকুমার তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনার কোনো উত্তর পান নি ; হয়তো তাঁর মনে মুক্তির ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু সে আশা ঝনঝনিয়ে ভেঙ্গে গেলো আমার কথায়, "না, মিঃ শর্মা, শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। আমি

এখুনি ট্রাঙ্ককল করে আপনার উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলে, আপনাকে শিক্ষকতা থেকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব জানাবো। শিক্ষকতার কাজে আপনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।”

শিবকুমারের মুখ দিয়ে বের হলো শুধু একটি মাত্র কাতর শব্দ, “মাই গড।”

আমি থামতে পারলাম না। রতনলালকে বললাম, “এঁকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে কাছে দাঁড়াও।”

রতনলাল শিবকুমারকে বসিয়ে দিলো। রিসিভার তুলতেই উনি যেন গ্যালভেনিক শক খেয়ে তড়বড়িয়ে উঠলেন। বললেন, “প্লিজ, টেলিফোন করবেন না। আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন না!”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, “বুঝেছি, আবার বুঝিও নি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কিছু লোককে কিছু সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায়, কিন্তু সব লোককে সব সময় নয়। তন্তুবায় কেন্দ্রে আপনি সফলতা অর্জন করেছিলেন কিন্তু শিল্পকেন্দ্রে হলেন সম্পূর্ণ নিষ্ফল। বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন নিজের হাতে, তার ফলভোগ আপনাকে করতেই হবে। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না মিঃ শর্মা।” তারপরেই কিন্তু তাঁর পিঠে হাত রেখে আশ্বাসের সুরে বললাম, “কেন এ কাজ করলেন বলতে পারেন?”

কোনো উত্তর না-দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন শিবকুমার। তাঁর কাঁধে হাত রেখেই বললাম, “নিশ্চয়ই জানতেন এ-ধরনের কাজের ফলাফল কি হতে পারে? তবুও এ-কাজ করলেন কেন?”

“একে বুদ্ধিভ্রংশ ছাড়া আর কি বলবো, মিঃ সরকার। এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।”

তাঁর কাজের সম্ভাব্য কারণ তো তাঁর আগের বলা কাহিনী থেকেই খানিকটা অনুমান করেছিলাম। তবু-যে প্রশ্ন করে চলেছি তার কারণ আমার নিজের কর্তব্য-বিমূঢ়তা। সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপানের পর বললাম, “শুনুন, ডক্টর ”

তড়িৎগতিতে মুখ তুলে তাকালেন শিবকুমার। সম্বোধন শুনে

চমকে উঠেছেন। যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের কানকে। "যে অপরাধ আপনি করেছেন, তার শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। আপনার সংসার নষ্ট হয়ে যাক, এমন দুরভিসন্ধি আমার নেই। ভবিষ্যতে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার একটি সুযোগ আপনাকে দিতে পারি। তবে বিনা শর্তে নয়।" থেমে গেলাম। প্রস্তুতির সময় দিলাম শিবকুমারকে আমার প্রস্তাব শোনার জন্য। উদ্‌গ্রীবদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাড়াহুড়ো না-করে, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপানের পর, সোজা হয়ে বসে দৃঢ় এবং শীতল কণ্ঠে ধীরে ধীরে শুরু করলাম, "প্রথমেই বলে রাখি, আমার প্রস্তাব নিঃশেষে মুছে দেবে আপনার বর্তমান। লাভ এইটুকু যে পুলিশে যেতে হবে না। বলুন, শুনতে চান আমার কথা ?"

বলির পশুর মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন শিবকুমার। তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া ঠিক ধরতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কানে এলো শিবকুমারের অত্যন্ত মৃদু আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর, "বলুন।"

"প্রথমত আপনাকে উপাচার্যের কাছে লিখতে হবে একটি রেজিগনেশন লেটার। হ্যাঁ ; আপনার নিজেরই রেজিগনেশন, ব্যক্তিগত কারণে। আর সেই সঙ্গে জানাতে হবে ন্যু ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের অসমর্থতা।"

এই তাহলে উদ্ধারের পথ! শিবকুমার দ্বিতীয় বার বলে উঠলেন, "ওঃ, মাই গড।"

"ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে আপনি ন্যু ইয়র্ক যাচ্ছেন। ভারতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রধান কার্যালয় রাজধানীতে। ফাউণ্ডেশনের অধিকর্তাকে লিখে দিতে হবে, আপনার ন্যু ইয়র্ক যাবার অক্ষমতা। প্যান-আমেরিকান দপ্তরে গিয়ে ফেরৎ দেবেন বিমান টিকিটটি।"

শিবকুমারের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আমাকে সামান্য শঙ্কিত করে তুললো। টেবিলের উপর রাখা মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি থর থর করে কাঁপছে। প্রস্তাব প্রকৃতই সুকঠিন। কিন্তু কারাবাস এবং পরবর্তী অবস্থার তুলনায়? প্রস্তাবের শেষ অংশ, যা সুকঠিন নয়, এক নাগাড়ে বিরামহীন বলে

যাবো বলে শুরু করলাম, "আপনার আর্থিক অবস্থা খুবই স্বচ্ছল। চেক বই আপনার সঙ্গেই রয়েছে দেখছি। দু হাজার টাকা আপনাকে দান করতে হবে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। এ্যাণ্ড লাস্টলি, যে জিনিসগুলি চুরি করেছেন এগুলি সব আপনাকে কিনে নিতে হবে।"

শাস্তির সম্পূর্ণ বিবরণ তাঁকে জানিয়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলাম। শিবকুমার নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না। কখনো উঠে দাঁড়াচ্ছেন, কখনো বসছেন। কিন্তু আমি অসহায়। বিনা শাস্তিতে তাঁকে মুক্তি দিতে পারি না। আমি তাঁর নাম পুলিশের নথীপত্রে না-লিখিয়ে আত্মসংশোধনের একটি সুযোগ তুলে ধরেছি মাত্র।

শিবকুমার এক সময় আসনে বসলেন, কিন্তু তখনও তিনি প্রকৃতিস্থ হননি। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে শূন্যে তাকিয়ে আপনমনে কি যেন বিড় বিড় করে বলে চলেছেন। কেমন মাঝে মাঝে কানে এসে বাজতে লাগলো, 'কনসাইণ্ড টু দ্য লিমবো'। আরো অনেক কিছু। সবকিছু বোধগম্য হলো না। মনে হলো কার কাছে যেন ক্ষমা চাইছেন। আমারও দেহে মনে ক্লান্তি। চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে একটু চোখ বুজলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠলো শিবকুমারের সুন্দর সাজানো জীবন তাসের ঘরের মতো দুলছে। ধূলিসাৎ হবার উপক্রম। কতো কথাই না মনে আসছিলো। বম্বেতে ম্যানেজিং ডিরেকটর সাহেব হয়তো বোর্ড অব ডিরেকটরের মিটিংয়ে ব্যস্ত। ডাক্তার গুলেরিয়া হয়তো একটি অপারেশন শেষ করে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিচ্ছেন। শিবকুমারের স্ত্রী হয়তো তাঁর সুটকেসে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছেন। হাতে বেশী সময় নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিবকুমারকে পালাম এয়ারপোর্টে যেতে হবে। তাঁরা কেউই জানেন না শিবকুমার এখন কোথায়, কি করছেন।

হঠাৎ শিবকুমারকে মাথা তুলতে দেখে আমার মন স্তব্ধ হয়ে গেলো। চোখের মধ্যে শাদা অংশ হয়ে উঠেছে জবা ফুলের মতো লাল। সোজা হয়ে বসে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখের পাতা যেন স্থির হয়ে গেছে। শরীরে নেই কোনো সাড়।

মনে হলো চেয়ারের উপর একটি পাথরের মূর্তি রাখা রয়েছে। ভাব-লেশহীন চোখ দেখে চমকে উঠলাম। এ যেন বিকৃতি মস্তিষ্কের চাহনি। স্থির করতে পারছিলাম না কি করা উচিৎ। মনের মধ্যে ভয়ও যে একটু দেখা দিলো না, এমন নয়। নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম এর পর শিবকুমার কি করেন দেখার জন্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার সকল আশঙ্কা দূর করে দিলো তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাস। আর সেই সঙ্গে তাঁর সারা শরীর যেন শিথিল হয়ে গেলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, "এক গ্লাস জল।" গ্লাসের জল এগিয়ে দিলাম। এক চুমুকে সবটুকু জল শেষ করে ফেললেন। তারপর আর একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে বললেন, "আপনার সব শর্ত মেনে নিলাম, মিঃ সরকার। এছাড়া আমার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।"

ঘটনার শেষ অধ্যায়ে হাজির হয়ে, মুহূর্তে স্থির করে নিলাম এগোবার পথ। আমার মেণ্টাল টেনশন মিলিয়ে গেলো। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম, "দ্যাটস্ গুড। বারোশো টাকা দিন। এই জিনিস-গুলির দাম চুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।"

শিবকুমারের দেওয়া বারোশো টাকা রতনলালের হাতে তুলে দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম তার কর্তব্য। টাকা এবং সমস্ত জিনিস একত্রিত করে নিয়ে রতনলাল কামরা ছেড়ে চলে গেলো। শিবকুমার ধূমপান করেন। সিগারেটের প্যাকেট তাঁর সামনে তুলে ধরতে বললেন, "ধন্যবাদ।"

টেবিলের উপর থেকে পাইপ তুলে নিয়ে তাতে তামাক ভরলেন শিবকুমার। অগ্নিসংযোগ করে কিছুক্ষণ ধূমপান করলেন। মানসিক চাপ কমিয়ে আনার জন্য এখন একটু নীরবতা দরকার। তাঁকে একটু সময় দিলাম। তারপর এক সময় কলম এগিয়ে দিয়ে বললাম, "ধরুন। চেক লিখতে দরকার হবে।"

চেক বই খুলে দু'হাজার টাকার একটি চেক সই করে আমার হাতে তুলে দিলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম চেকের দিকে। তারপর চেকের স্বাক্ষর মিলিয়ে নিলাম পাসপোর্টের স্বাক্ষরের সঙ্গে। মুখ তুলে দেখি, শিবকুমারের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আঘাত এবং অপমানের

চিহ্ন। বললাম, "আপনাকে অপমান করার জন্যে, আমি সই মেলাই নি, ডঃ শর্মা। দিজ আর ফরম্যালিটিজ। টাকার লেনদেনে এ মানতেই হয়।"

"ঠিক আছে। নেক্স্ট স্টেপ প্লিজ।"

হাত বাড়িয়ে এক গোছা শাদা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললাম, "প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে দিন। চেকের সঙ্গে পাঠাতে হবে। আপনার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি সবকিছু উল্লেখ করবেন চিঠিতে।"

লেখা শেষ করে মুখ তুল তাকাতেই বললাম, "বাকী রইলো পদত্যাগ পত্র এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশনে চিঠি। এ দু'টি লিখে দিলে আমি ডাকযোগে রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা করতে পারি। আপনার পোস্ট অফিসে যাবার কোনো দরকার নেই।"

বক্তব্য আমার সরল এবং ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। চিঠিগুলি তাঁকে আমার কাছে রেখে যেতে হবে। তিনি যদি ফের অপমানিত বোধ করেন কিংবা ক্ষুণ্ণ হন, তাহলে আমি নাচার। সাবধানতা আমাকে অবলম্বন করতেই হবে।

কোনো কথা না-বলে, শিবকুমার শাদা কাগজের উপর কলম এনে মাথা নীচু করে তৈরী হলেন লিখতে। কিন্তু লেখা শুরু করতে পারছেন না। হাত এমনই কাঁপছে যে একটি আঁচড়ও কাটতে পারছেন না। স্থিরদৃষ্টিতে কাগজের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে আছি প্রতীক্ষার ভঙ্গীতে। হঠাৎ দেখি টস্ করে এক ফোঁটা জল শাদা কাগজের উপর পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে শিবকুমার চেয়ার ছেড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। পিছন থেকে দেখতে পেলাম কোটের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছলেন। মায়া হলো। এ-যেন নিজের হাতে নিজের মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষর। কলমের কয়েকটি আঁচড়ে মুছে যাবে শিবকুমারের বর্তমান। না কি তাঁর প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যৎ! কিন্তু আমার কিছু করার নেই। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

শিবকুমার ধীরে ধীরে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। চোখে

এখনও একটু জলের আভাস। কিন্তু মুখে ফুটে উঠেছে ম্লান হাসি। বললেন, "ক্ষমা করবেন, মিঃ সরকার। লিখতে গিয়ে শাদা কাগজের ওপর আমার হতভাগা ছেলেটার মুখ ফুটে উঠেছিলো। তাই নিজেকে সামলাতে পারি নি।"

বলার কিছু ছিলো না, অস্বস্তি বোধ করা ছাড়া। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুতের মতো বয়ে গেলো যন্ত্রণার তরঙ্গ। কিছুক্ষণ পর রুমালে মুখ মুছে শিবকুমার বললেন, "কি যে আমি চাই! অ্যানাদার পাফ অফ স্মোক, পারহ্যাপ্‌স্। আপনার আপত্তি না-থাকলে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! নো হারি, প্লিজ ইওরসেলফ্।"

পাইপে পুনরায় অগ্নিসংযোগ করে, ঘন ঘন ধূমপান করতে লাগলেন শিবকুমার। তারপর জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তড়িৎগতিতে ফিরে এলেন নিজের আসনে। কলম তুলে শুরু করলেন রেজিগনেশন লেটার। হাত আর বিন্দুমাত্র কাঁপছে না। দাঁতের মধ্যে চেপে ধরা পাইপ। খস খস লেখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে তাঁর ধূমপান। একেবারে ছুটো চিঠিই শেষ করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

চোখ বুলিয়ে চিঠি ছুটি একবার দেখে নিলাম। সবই ঠিক আছে। শিবকুমারের হাতে তিনটি শাদা লেফাফা দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী, উপাচার্য এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ঠিকানা লিখে দিতে বললাম। ঠিকানা লেখা শেষ হতে, লেফাফাগুলির মধ্যে তিনটি চিঠি এবং চেক ভরে দিয়ে, মুখগুলি বন্ধ করে নিজের কোটের পকেটে রাখলাম। রতনলাল ফিরে এলো কাজ সেরে। হাতে একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স; সব জিনিস প্যাক করা। ক্যাশমেমো এবং বাকী টাকা শিবকুমারকে দিয়ে, রতনলালকে বিদায় দিলাম।

রতনলাল চলে যেতে, কামরার মধ্যে হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে এলো। ছুজনেই চুপচাপ। শিবকুমারের দিকে তাকিয়ে দেখি, বুকের কাছে তুলে ধরে তিনি নিজের ছু'হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে চলেছেন। মনে হলো

যেন আপন মনে বলছেন, 'যে হাত লিখেছে পি. এইচ-ডি-র থিসিস, সেই হাতই আজ যা করলো, তার সামাজিক নাম চুরি'। না কি সেই হাতে নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে চাইছেন ?

আমার কাজ তখনো অল্প বাকি। তন্তুবায় কেন্দ্রের চারটি সিল্ক টাইয়ের বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে। শিবকুমার হয়তো টাইয়ের কথা ভুলে গেছেন। সে-কথা মনে করিয়ে দিতে হলো, "আমাদের এখানে আপাতত কাজ তো শেষ হলো। এবার আপনাকে তন্তুবায় কেন্দ্রে একবার যেতে হবে।"

শিবকুমার আবার নতুন করে আঁতকে উঠলেন। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে বললাম, "ওদের ম্যানেজারকে ফোনে ডেকে পাঠাচ্ছি। তিনি আপনাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।"

এতোক্ষণে তিনি বুঝে গেছেন গ্যানট্‌লিট-এর দৌড় একবার শুরু হলে শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। যখন কথা বললেন, কণ্ঠস্বরে আত্মসমর্পণের উদাস সুর। তবু যেন খড়কুটো ধরে একটু বাঁচার চেষ্টা। "আমার কপালে ভবিষ্যতে কি লেখা আছে জানি না। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার কোনো পথ অবশিষ্ট আছে কি না, তারও স্থিরতা নেই। যেটুকু আশার আলো এখনো বাকি আছে, সেটুকু দয়া করে নিবিয়ে দেবেন না, মিঃ সরকার। যে নিষ্পাপ শিশুটিকে পৃথিবীতে আনার জন্যে আমি দায়ী, অন্ততঃ একবার তার কথা ভেবে দেখতে আপনাকে অনুরোধ করছি।"

শিবকুমারের আন্তরিকতা আমার অন্তস্থলে গিয়ে আঘাত করলো। এবার আমার মন সত্যিই কেঁদে উঠলো। সারা বিশ্বব্যাপী যখন হত্যাকারীকেও ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই দেবার আন্দোলন শুরু হয়েছে, তখন একজন উচ্চ-শিক্ষিত লোক, কিছুক্ষণেরজন্য বিপথগামী মানুষকে কি চরিত্র-সংশোধনের একটি সুযোগ দেওয়া যেতে পারে না! শিবকুমারের প্রতিটি কথা নিঃসন্দেহে সত্য। যা শাস্তি তিনি পেয়েছেন তার বাইরে আর কোন শাস্তি দিয়ে আইনের মান রাখবো ?

তন্তুবায় কেন্দ্রের চারটি টাই আমাকে ভাবিয়ে তুললো। কি করা যায় এগুলিকে নিয়ে! হঠাৎ সমাধানের একটি পথ দেখতে পেলাম।

কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে একটু মিথ্যাচারের গ্লানি। শিবকুমারের জন্য কে যেন আমাকে ঠেলে দিচ্ছে মিথ্যার আশ্রয় নিতে। বললাম, "আপনার কথা যদি-বা মেনে নিই কিন্তু এই টাইগুলি নিয়ে কি করবো বলতে পারেন?"

"আপনি রেখে দিন, ফেলে দিন, দান করুন, পুড়িয়ে ফেলুন, যা ভালো মনে হয় করুন। কিন্তু আমাকে দয়া করে রেহাই দিন।"

"কিন্তু মুশকিল এই যে, এর কোনোটাই আমি করতে পারি না। তন্তুবায় কেন্দ্রের শ'তিনেকের মতো টাকা লোকসানের প্রশ্নও এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। টাইগুলি ওদের ফেরৎ দিতেই হবে। তার চেয়ে বরং আমি যা বলি তাই করুন।"

"বেশ, তাই করবো।"

আবার কাগজের তাড়া আর কলম এগিয়ে দিয়ে বললাম, "তাহলে, একটি চিঠি লিখুন।"

"আবার চিঠি! এবার কাকে?"

"তন্তুবায় কেন্দ্রের ম্যানেজারকে।"

এ-যেন উটের পিঠের শেষ খড়। তাঁর মনে হলো এটা আমার এক নির্দয় পরিহাস, তাঁর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধরা-গলায় বললেন, "আমাকে তাহলে ধরিয়েই দিচ্ছেন, মিঃ সরকার! বেঁচে থাকার একটি মাত্র সুযোগও দিলেন না। বেশ, তাই হোক। আই গিভ আপ।"

আর কিছু বলতে পারলেন না। গলা বসে গেলো। দু'হাত উপর দিকে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিরুপায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গী। চেয়ার ছেড়ে তাঁর কাছে গিয়ে, পিঠে হাত রেখে, নীচু হয়ে আশ্বাসের সুরে বললাম, "ডক্টর শর্মা! কেন মিছে ভয় পাচ্ছেন? লিখুনই না, আমি যা ডিকটেট করি। এখন আপনি আমার সব কথা বুঝতে পারবেন না। লিখতে গিয়ে নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনার জন্যে একটি মাঝারি-রকম মিথ্যের আশ্রয় আমাকে নিতে হচ্ছে। তারপর যদি ইচ্ছে হয়, কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দেবেন চিঠি।"

শিবকুমার কোনো কথা বলতে পারলেন না। নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসতেই দেখি, কলম-হাতে তিনি আমার দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললাম, "দ্যাটস্ গুড। আপনার নাম, ঠিকানা লেখার দরকার নেই। কেবল কাগজের ওপরদিকে বসিয়ে দিন আজকের তারিখ।" লেখা শেষ হতে ধীরে ধীরে ডিকটেট করলাম :

"মাননীয় ম্যানেজার মহাশয়

তন্তুবায় কেন্দ্র।

প্রথমেই আপনার কাছে করজোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করি। আমি একজন কাপুরুষ হতভাগ্য শপ-লিফটার। সাহস নেই আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার।

আজ সকালে আপনাদের কেন্দ্র থেকে আমি চারটি সিল্ক টাই চুরি করি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ধরা পড়িনি। তারপর আমি চলে আসি ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রে, কয়েকটি উপহার কেনার জন্যে। কিন্তু এখানে আসার পর ধীরে ধীরে আমার মনে দেখা দিয়েছে অপরাধবোধ। ফলাফলের ভয়ে আপনার কাছে ফিরে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করার সাহস আমার নেই। অথচ বিবেকের দংশনে আমি ক্ষতবিক্ষত, অন্তর্দাহে মৃতপ্রায়। চুরি করা জিনিস ফেরৎ না-দিয়ে আমার উপায় নেই।

টাইগুলি আমার এই চিঠি সমেত শিল্পকেন্দ্র থেকে সংগৃহীত একটি কাগজের ব্যাগের মধ্যে বন্ধ করে, সকলের অজান্তে কোনো একটি বিভাগে রেখে যাচ্ছি। আশাকরি ব্যাগটি শিল্পকেন্দ্রের কোনো কর্মচারীর নজরে পড়তে দেরি হবে না, এবং নজর পড়া-মাত্রই তা শিল্পকেন্দ্রের ম্যানেজারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রের মাননীয় ম্যানেজার সাহেবকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তিনি যেন এ চিঠি পড়ার পর, ব্যাগটি তন্তুবায় কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা করেন। ধন্যবাদ। জনৈক অনুতপ্ত শপ-লিফটার।"

লেখা শেষ করে শিবকুমার বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কোনো কথা বললেন না। তার দরকারও ছিলো না। তাঁর নীরবতাই বাঙ্ময় হয়ে উঠলো। তাঁর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হতেই দেখি, লজ্জার ব্যূহ ভেদ করে মুখ তুলে আর আমার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরে, সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "ডক্টর, আপনার বাড়ী ফেরার সময় পেরিয়ে যেতে চলেছে। আর দেরী করা উচিৎ হবে না। আপনার জিনিসগুলি টেবিল থেকে উঠিয়ে নিন।"

যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন শিবকুমার। বললাম, "যাবার আগে ভালোভাবে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিন। আর সান গ্লাসটা পরে নিন।" শিবকুমারের কথা বলার শক্তি বোধহয় আর ছিলো না। নিঃশব্দে সব কাজ শেষ হতেই, তাঁর হাতে কার্ডবোর্ডের বাক্সটি তুলে দিয়ে বললাম, "চলুন, আপনাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।"

প্রবেশ পথ অতিক্রম করে পথে নেমে এসে আমি থমকে গিয়ে বললাম, "আমি এখান থেকেই বিদায় নেবো ডঃ শর্মা। আপনি এবার একা যেতে পারবেন, আশাকরি। নমস্কার।"

ফিরে দাঁড়িয়ে কামরার দিকে পা বাড়াতেই, শিবকুমার কার্ডবোর্ডের বাক্সটি মাটিতে রেখে আমার একটি হাত জড়িয়ে ধরলেন। রঙিন চশমার পিছনে দেখতে পেলাম না তাঁর চোখ, কিন্তু ঠোঁটের কাঁপুনি আর আর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলাম, আপ্রাণ চেষ্টা করছেন উচ্ছ্বাস দমনের। আমার অপর হাত শিবকুমারের জোড়া হাতের উপর চেপে ধরে উৎসাহ দিয়ে বললাম, "মুষড়ে পড়ার মতো কিছু তো হয় নি। আপনার জন্যে আমার আন্তরিক শুভ কামনা রইলো। চিয়ার আপ।"

মনে হলো শিবকুমার যেন শিশুর মতো কেঁদে ফেলবেন। হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে, মাটি থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্সটি তুলে ধরে প্রস্থানোদ্যত হতেই, যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে বলে উঠলাম, "এক মিনিট দাঁড়ান, ডক্টর শর্মা। আপনার দুটি জিনিস আমার কাছে রয়ে গেছে, নিয়ে যান।"

কোটের পকেট থেকে শিবকুমারের লেখা তিনটি লেফাফা বের করলাম। প্রধানমন্ত্রীর ঠিকানা লেখা লেফাফাটি আবার পকেটে রেখে দিয়ে, হাতে-ধরা বাকী দু'টি লেফাফার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ লেফাফা দু'টি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে, হতবাক্ ডক্টর শর্মার কোটের পাশ-পকেটে পুরে দিলাম।

মনে হলো, ঘটনার আকস্মিকতায় শিবকুমার শুধু বাক্‌শক্তি-রহিত নয়, চেতনাও হারিয়ে ফেলেছেন। স্থির হয়ে আমার দিকে সম্পূর্ণ সম্মোহিতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

তাঁর কোনো সাড় ফিরে আসার আগেই বিদ্যুৎগতিতে নিজের কামরার দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেলাম।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, শিবকুমার তখনও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। হাত তুলে হাসতে হাসতে তাঁকে জানালাম আমার বিদায় সম্ভাষণ, "বঁ ভোয়াজ্, ডঃ শর্মা, অঁ রোভোয়া।"

পিছন ফিরে না-তাকিয়ে কামরা পর্যন্ত বাকি পথটুকু পার হলাম পা চালিয়ে।

অনেক দিন আগেকার কথা। সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি। কি করে কে জানে, মাথায় খেয়াল চাপলো, সাহিত্য-চর্চা করবো। থার্ড ইয়ারের স্নুদীপ সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলো, তার পরামর্শ চাইলাম। স্নুদীপের সঙ্গে কল্লোলযুগের ছু'একজন সাহিত্যিকের জানাশোনা ছিলো,—তা ছাড়া ও নিজেও ছিলো সবজান্তা টাইপের, ওই বয়সেই অনেক কিছুর হাড়হদ্দ জানতো। শুনে বলল, "বহুত আচ্ছা, গো এ্যাহেড। অভিজ্ঞতা নেই, তবু লেখাটিকে ওয়েটি করে তুলতে হবে, এই তো? জেলেদের মাছ ধরার জাল দেখেছিস? খানিকটা জায়গা ছেড়ে ছেড়ে শিসের গুলি লাগানো থাকে, যাতে ভারী হয়, চট করে জলে ডোবে। তোকেও লেখার জন্যে মনের মধ্যে একটি ফ্যাক্ট-ফাইনডিং কমিশন বসাতে হবে। যা নিয়ে লিখবি, তার সঙ্গে কোনো-রকম সম্বন্ধ আছে, এমন রাশি রাশি প্রপার নেম সংগ্রহ করে নে। তারপর আর কি, ছোটো ছোটো কথার জাল দিয়ে ওগুলো বুনে দিলেই ব্যস, কম্ম ফতে।"

স্নুদীপের পরামর্শ সেদিন ভালোই লেগেছিলো, তবু আমার কলম দিয়ে প্রথম যে লেখাটি বেরুলো, তাকে বলা যায় ফ্রিক অব নেচার। ওই যে কে যেন বলেছিলেন না, জিনিয়স ইজ নাইনটি নাইন পারসেন্ট পারস্পিরেশন এ্যাণ্ড ওয়ান পারসেন্ট ইন্সপিরেশন? শতকরা নিরানব্বই ভাগ ঘাম আমি ঠিকই ঝরিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তো আর প্রতিভা নই,

তাই ওই একভাগ প্রেরণার দখিনা-বাতাস আর আমার পালে এসে লাগলো না। আমি চেয়েছিলাম লেখক ও পাঠকের মনের মধ্যবর্তী দুস্তর সমুদ্রের উপরে তৈরী করবো একটি সেতুবন্ধ-রামেশ্বর; কিন্তু ফ্যাকট্‌স্‌-এর ছড়া দিয়ে তৈরী করলাম যে-এ্যাডাম্‌স ব্রীজ, তার উপরে পা দিয়ে কেউ রামের সুবর্ণদ্বীপে পৌঁছতে পারে না।

এই ব্যর্থতাই বোধহয় আমার মনে এনে দিয়েছে চিঠি লেখার ঝোঁক, যা দিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটাই। না, অফিসিয়াল চিঠির কথা বলছি না, ওতো রোজ লিখতেই হয় কয়েক ডজন। আমি বলছি আমার ব্যক্তিগত চিঠির কথা। এখনো আমাকে মাঝে-মধ্যে চিঠি লেখে, এমন বন্ধু আছে বেশ কয়েকজন ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে; তার উপরে মাঝে-মাঝে দু-একটা সাগর-পেরোনো চিঠিও এসে পৌঁছয়, যাতে থাকে সমুদ্রের টাটকা নোনা স্বাদ। এ-সব চিঠির উত্তর লিখতে-লিখতে আমার সেই নানা রঙের দিনগুলির দিক থেকে একটি দমকা হাওয়া বয়ে আসে, যেগুলোকে কোনোক্রমেই সোনার খাঁচায় আটকে রাখতে পারিনি। এই সময়টুকুর জন্য আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীতের মধ্যে তলিয়ে যায়।

কিন্তু আজ যে কথা বলতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কোথায়? এ যে ধান ভানতে শিবের গীত! হতে পারে, না-ও হতে পারে। আসল কথা, গত কয়েকদিন ধরে কেজো চিঠির বাইরে কোনো চিঠিই পাচ্ছিনে, তাই জীবনটা কেমন ফাঁপা আর আলুনি লাগছিলো। এমন সময়ে এলো সেই বিশেষ দিনটি, যাকে কেন্দ্র করে আমার এই কাহিনী।

সেদিন সকালে বিশেষ কাজে যেতে হয়েছিলো ফরেন অফিসে। এসে দেখি টেবিলের উপর একগোছা লেফাফা। দেশবিদেশের চিঠি। বেশীর ভাগই অফিসিয়াল। হ্যাঙারে কোটটা টাঙিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালাম। কিছুক্ষণ পর লেফাফার গোছা তুলে ধরে অলস-গতিতে একটির পর একটি ঠিকানা দেখে টেবিলের উপর রাখছিলাম। এইভাবে কয়েকটি ঠিকানা দেখার পর, একটির উপর দেখতে পেলাম

টাইপ-করা আমার নাম। থমকে গেলাম। খামের উপরদিকে বাঁদিক ঘেঁষে একটি শাদা কাগজে পত্রপ্রেরিকার নাম আর ঠিকানা ছাপা স্টিকার; মিসেস ডেভিড গ্রাণ্ট, ২/২ পাইন গ্রোভ, মেলবোর্ণ, অস্ট্রেলিয়া। তার নীচে হাতে লেখা, পারসোনাল। উল্টেপাল্টে লেফাফাটি নাড়তে নাড়তে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, কবে, কোথায়, কোনসূত্রে পরিচয় হয়েছিলো এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে। সোজা হয়ে বসে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লেফাফাটি ছিঁড়ে কাগজ টেনে বের করে দেখলাম বাংলায় লেখা চিঠি:

"প্রিয় সোম,

অনেকদিন হয়ে গেলো। তুই হয়তো আমার কথা ভুলেই গেছিস। আমি তোর মারগারেট দিদি।"

মারগারেট দিদি! লেফাফাটি তুলে ধরে আবার ছাপা স্টিকারটি দেখলাম। অস্ট্রেলিয়া থেকেই লিখেছেন। কিন্তু মারগারেট দিদি অস্ট্রেলিয়ায় গেলেন কবে? যাবার আগে একবার জানালেন না আমাকে! তাড়াতাড়ি চিঠিটি চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

"ডেজমণ্ডকে নিয়ে আজ প্রায় ছ'বছর হলো তোর জামাইবাবুর কাছে চলে এসেছি। পারলাম না স্বদেশে থাকতে। ডেজমণ্ডের জন্যেই শেষ পর্যন্ত আমাকে মাইগ্রেশন নিতে হলো। তাকে সেই পুরানো আবহাওয়ার মধ্যে রাখতে আর সাহস পেলাম না।

তুই তো জানিস, কি চমৎকার গীটার বাজাতো ডেজমণ্ড। এখন দিনে চাকরী করে আর রাত্রে তিন ঘণ্টা গীটার বাজায় একটি নাইট ক্লাবে। খুব নাম করেছে ওদের দল। সম্প্রতি বিয়ে করেছে ডেজমণ্ড। আমার বউমা জেনি অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে, আর সেও নাইট ক্লাবেই গান গায়। বিয়ের পর চার্চের বাইরে তোলা ওদের একটি ফটো পাঠালাম।"

তাড়াহুড়োর মধ্যে লক্ষ্য করিনি লেফাফার মধ্যে ফটোও আছে। চিঠিপড়া বন্ধ রেখে, লেফাফার মধ্যে থেকে টেনে বের করলাম একটি রঙিন ফটো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ফটোর দিকে। ডেজমণ্ডকে কেবল সুস্থ সবলই মনে হলো না, অত্যন্ত সুপুরুষ হয়ে উঠেছে

ঠোঁটের কোণে লেগে আছে তার সেই মিষ্টি হাসি, যা তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। ফটো রেখে চিঠির বাকি অংশ পড়তে লাগলাম—

"ছবি দেখে আর আমার চিঠি পড়ে তুই খুশী হবি জানি। আজ যে ডেজমণ্ড কেবল বেঁচেই নেই, সুস্থ জীবনযাপন করছে, সে তো তোরই জন্যে।

ডাঃ দাসগুপ্ত, সোনাবৌদি আর রামচন্দ্রন সাহেবকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাস। তোর জন্যে পাঠালাম আমার বুকভরা ভালোবাসা আর আশীর্বাদ। এ-জন্মে তোর সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না। পরজন্মে তোকে ছোটোভাই হিসেবে পাবো, সেই আশায় দিন গুনছি। ইতি—তোর মারগারেট দিদি।"

এইখানেই চিঠিটা শেষ হলো না। তারপর 'পি এস' লিখে, যোগ করেছেন—

"আশার্কার এতোদিনে মিলি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসেছে পি. এইচ-ডি করে। আমার কপাল, এখানে চলে আসার আগে, মেয়েটার সঙ্গে একটি বারের জন্যও দেখা হলো না। কতো কথাই না বলার ছিলো তাকে। ঈশ্বরের কাছে সদা-সর্বদা প্রার্থনা জানাই, মিলি যেন তোকে বুঝতে পারে।"

চিঠির দিকে তাকিয়ে কতোক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম জানি না। সাত বছরের পুরোনো যে ঘটনার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, যে-সব দৃশ্য স্মৃতির অতলতলে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলো। মুহূর্তে সবকিছু চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

দেখতে পেলাম উন্মাদের মতো ছটফট করছে ডেজমণ্ড। দু'হাতে ছিঁড়ছে মাথার ঘন কোঁকড়ানো চুল। অমানুষিক যন্ত্রণায় বেরিয়ে এসেছে তার জিভ। মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছে লালা। সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার রামচন্দ্রন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডেজমণ্ডের দিকে, হাতে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। ফেড আউট, ফেড ইন।

এবার মারগারেটের ছবি। শান্ত ধীর স্থির মহিলা, কথা বলেন অল্প কিন্তু মনোভাব ফুটে ওঠে তাঁর আচারে ব্যবহারে, চোখে আর মুখে।

লেশমাত্র উচ্ছ্বাস ছাড়াও তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেন। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, 'মিঃ সরকার, আমি জানি ডেজমণ্ডকে কেবল আপনিই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। মিঃ রামচন্দ্রন জোর করে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

তারপর একের পর এক কতো দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠে মিলিয়ে গেলো। উকিলের চেম্বার, উপরাজ্যপালের দপ্তর, আদালত কক্ষ, সোনাবৌদি আর ডাক্তার দাসগুপ্ত। ডাক্তারের চেম্বারে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তার দাসগুপ্ত, মারগারেট, ডেজমণ্ড, সোনাবৌদি আর আমি। বিদায়-বেলা ঘনিয়ে এসেছে,—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ডেজমণ্ড চলে যাচ্ছে ক্লিনিক ছেড়ে। দেখতে পেলাম সোনাবৌদিকে ছেড়ে দিয়ে ধীরগতিতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মারগারেট। সেই সময়ই তো তাঁর অনুরোধে তাঁকে দিদি বলে প্রথম ডাকলাম।

চেয়ার ছেড়ে কখন উঠে দাঁড়িয়েছি জানি না। মন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন। দেখতে পেলাম অনতিদূরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর ঠোঁটে আমার-বহু-পরিচিত সেই মিষ্টি হাসি। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুট-কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'মারগারেট দিদি! তুমি কখন এলে?'

আমার কণ্ঠস্বর মারগারেটের কানে পৌঁছয়নি নিশ্চয়ই। আমাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে, তিনি যেন অবাক হয়ে গেছেন। দেখতে পেলাম, তাঁর শরীর নড়ে উঠলো, আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। ত্বড়িৎগতিতে তাঁর কাছে গিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, তাঁর গালের উপর গাল রাখতে, কানে এলো তীব্র ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর, "আরে, একি করছো তুমি! ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।"

দু'হাতে সবলে আমাকে ঠেলে দিয়ে, রাগে, দুঃখে আর অপমানে থর-থর করে কাঁপছে মিতালী। দৃষ্টিতে জ্বলছে অগ্নিশিখা। স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। একি হলো! আমি মারগারেট দিদির কথা ভাবছিলাম, জানিনা কখন মিতালী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একে কী বলবো—হ্যালুসিনেশন? কিন্তু মিতালী যে আমাকে ভুল বুঝলো। কানে এলো তার তীব্র কণ্ঠ, "হঠাৎ তোমার

এ অসভ্যতার কারণ কি? তুমি তো এমন ছিলে না কোনোদিন। মাথা নীচু করে থেকো না, জবাব দাও।"

লজ্জায় মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। মিতালীর চোখে ছোটো হয়ে গেলাম। কিন্তু কিভাবে বোঝাই আমার স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থার কথা। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা তুলে তার চোখের উপর চোখ রাখলাম। দৃষ্টিতে আমার নেই কোনো দ্বিধা, সংকোচ কিংবা লজ্জা। হাসিমুখে নিজের আসনে ফিরে আসতে আসতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি লাইন বলে ফেললাম—

'আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।'

আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়েই এই অতি-নাটকীয়তার আশ্রয় নিলাম। নিজের কানেই প্রায় ভাঁড়ামির মতো শোনালো আমার কণ্ঠস্বর। মিতালীর দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। সারা শরীরের রক্ত একত্রিত হয়ে মুখে এসে জমা হয়েছে। কাঁধে-ঝোলা কাপড়ের ব্যাগ সজোরে চেপে ধরে বিকৃতস্বরে বলে উঠলো, "একেবারে অধঃপাতে গেছো! রবিঠাকুরের কবিতা তোমার মুখে লাগছে একটি বিচ্ছিরি নোংরামির মতো।"

মনে হলো সে আর দাঁড়াবে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য তৈরী হতেই বলে উঠলাম, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও, মিতালী।"

ফিরে দাঁড়িয়ে দাঁতের উপর দাঁত চেপে গর্জে উঠলো সে, "না, তোমার কোনো কথা শোনার আমার আর সাধ নেই। তোমার মুখ দেখলেও গা ঘিনঘিন করে।"

"বেশ। তাহলে যেতে পারো। বাধা দেবার মতো জোর হয়তো এ-মুহূর্তে আমার নেই। কিন্তু কতো বড়ো অবিচার করে যে আজ চলে যাচ্ছো, সে-কথা যখন বুঝতে পারবে তখন ফিরে আসতে কুণ্ঠিত হয়ো

না। আমার দরজা খোলাই থাকবে।" শান্তকণ্ঠে কথাগুলি বলে, মারগারেটের চিঠিটি তুলে ধরে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "আর এই চিঠিটা নিয়ে যাও। পড়া হয়ে গেলে ডাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিও।"

মিতালীর মনে একটু দ্বিধা। মুহূর্তের জন্য কি যেন ভেবে নিলো। যেন কোনো রহস্যের ইঙ্গিত পেয়েছে। হাত বাড়িয়ে মারগারেটের চিঠি নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। আমার শেষ কথাগুলি যেন তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ধীরে ধীরে আমার চোখের উপর তার দৃষ্টি ফিরে আসতেই বুঝতে পারলাম, আমার সম্বন্ধে তার একটু আগের সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পারছে না। হঠাৎ মারগারেটের চিঠিটা খুলে পড়া শুরু করতে, একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। চিঠি শেষ করতে এতো সময় লাগা উচিৎ নয়, তার মানে বার বার পড়ে চলেছে মিতালী। তারপর একসময় মুখ তুলে প্রশ্ন করলো, "কে তোমার এই মারগারেট দিদি?"

"স্থির হয়ে যদি বসো, তাহলে সব বলতে পারি। কিন্তু তার আগে আমার ব্যবহারের জবাবদিহি শুনে নাও।"

টেবিলের অপরপ্রান্তে বসে পড়লো মিতালী। লক্ষ্য করলাম তার মুখের কঠিন পেশীগুলি নরম। চোখে একটু অপ্রতিভ ভাব।

গল্প বলার ভঙ্গীতে শুরু করলাম, "অনেকদিন আগের কথা। প্রায় বছর সাতেক আগে হঠাৎ একদিন যেমন আমার জীবনে দেখা দিয়েছিলেন মারগারেট দিদি, তেমনি হঠাৎই হারিয়ে গেলেন একদিন। আর দেখা হয়নি। পত্রালাপও না। যে সময় তাঁর সংস্পর্শে আসি, তখন তুমি অক্সফোর্ডে বসে থিসিস লিখতে ব্যস্ত।"

মিতালী নিঃশব্দে বসে রইলো। আমি একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। কথার সূত্র ফেলেছিলাম হারিয়ে। আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে মিতালী বলে উঠলো, "তারপর?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললাম, "মারগারেট দিদি হারিয়ে গেলেন আমার জীবন থেকে। তারপর একদিন তিনি চলেও গেলেন স্মৃতির অন্তরালে। কিন্তু আজ যখন তাঁর চিঠি পেয়ে জানতে পারলাম, ডেজমণ্ড সুস্থ স্বাভাবিক বিবাহিত-জীবন যাপন

করছে সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়, তখন আমার মন এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠলো। ডেজমণ্ড আমার জীবনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিলো। সে চ্যালেঞ্জ আমি ফিরিয়ে দিইনি। আজ যখন জানতে পারলাম জয় হয়েছে আমার, তখন নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। চিঠি শেষ করে, মুখ তুলেই দেখতে পেলাম, অদূরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক মহিলা। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি। আমি বোধহয় স্বপ্নাবিষ্ট ছিলাম। তাঁকে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে আমার মন নেচে উঠলো। অতি-পরিচিত এই হাসি। দিনের পর দিন দেখে-দেখে এ হাসির প্রতিবিম্ব আমার মনের মধ্যে একসময় গেঁথে গিয়েছিলো। এ আমার মারগারেট দিদির হাসি! ঘোর-না-কাটতেই এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে, কিন্তু তোমার চিৎকারে বাস্তবে ফিরে এলাম, ভেঙ্গে গেলো আমার নিমেষের স্বপ্ন। আমি তোমাকে দেখিনি মিলি, দেখেছিলাম আমার মারগারেট দিদিকে। কিন্তু এই মুহূর্তে এখানে তুমি কেন এলে, কি করে বলবো! হয়তো তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত।"

একনাগাড়ে কথাগুলি শেষ করে, চেয়ারে হেলান দিলাম। মিতালীর অনুসন্ধানী দু'চোখ কি যেন খুঁজে ফিরছে আমার চোখের মধ্যে। দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম না। দেখুক, ভালো করে দেখুক। হঠাৎ তার শরীর শিথিল হয়ে গেলো। চেয়ারের পিঠে শরীর এলিয়ে দিলো। ফুটে উঠলো সলজ্জ হাসি। বুঝলাম তার হারানো বিশ্বাস সে ফিরে পেয়েছে। আমাদের সম্বন্ধ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে।

হঠাৎ মাথা নীচু করে, কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তুলে ধরলো একটি জবাফুলের মালা। নিঃশব্দে আমার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো। জানি না কি হতে যাচ্ছে; কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। জবাফুলের মালাটি আমার মাথার উপর ঠেকিয়ে রাখলো কিছুক্ষণ। তারপর নলেন গুড়ের একটি সন্দেশ ব্যাগ থেকে বের করে আমার মুখে পুরে দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে ফিরে গেলো টেবিলের বিপরীত দিকে তার বসার জায়গায়। ব্যাগের মধ্যে মালাটি পুরে রেখে, মুখ তুলে

তাকালো। সারা মুখমণ্ডল যেন কিসের আনন্দে, কিসের তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত।

হালকাসুরে বললাম, "যাক্, বাঁচা গেলো বাবা। যা ভয় পেয়েছিলাম।"

"কেন ?"

"আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায়! এ-বয়সে বন্ধু-বিচ্ছেদের মতো ট্র্যাজেডি আর কি আছে ?"

হাত তুলে বাধা দিয়ে প্রসঙ্গটির উপর দাঁড়ি টেনে দিয়ে মিতালী বলল, "থাক ওসব কথা।" তারপর প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা সোম, বলতে পারো আজ বছরের কোন দিন ?"

ধরতে পারলাম না, কি বলতে চায় মিতালী। জানি না বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে আজকের বিশেষত্ব কোথায়। সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টে দু'হাত নেড়ে বললাম, "গড নোজ।"

"তাতো বটেই। আমার আশা করাই ভুল হয়েছিলো। সাহেবরা চলে যাবার সময় রেখে গেছেন তোমাদের মতো কিছু লোককে, যারা পঁচিশে ডিসেম্বর জানে, পয়লা জান্নুয়ারীর কথা ভোলে না, কিন্তু জানে না পয়লা বৈশাখ কিংবা শিবরাত্রি কবে আসে, কবে যায়। পোড়া কপাল আমার! যাইহোক, আজ পয়লা বৈশাখ। বছরের প্রথম দিনে কালীবাড়ীতে পূজো দিতে গিয়েছিলাম। তোমার জন্য প্রসাদী ফুল আনলাম।"

তাইতো! অন্তত জবাফুলের মালা দেখে আমার মনে আসা উচিৎ ছিলো। এই দিনে প্রতি বছরই প্রসাদী ফুল পাই। সে-কথা আমার মনে এলো না কেন ? বললাম, "মারগারেট দিদি আজ আমার সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিয়েছেন দেখছি। প্রতিবছর ফুল নিয়ে তুমি আসো। অথচ আশ্চর্য! সে-কথা আজ একবারও মনে এলো না! যাইহোক, বাকী কাজটা চট করে সেরে ফেলো। প্রণাম।"

"খুব শখ! তুমি আমার চেয়ে কতো বড়ো যে প্রণাম করতে হবে ?"

"বড়োছোটোর প্রশ্ন নয়। সেই কবে থেকে পেয়ে পেয়ে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। নিয়মে ব্যতিক্রম হবে কেন?"

ব্যতিক্রম হবার কথা ছিলো না, হলোও না। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তৃপ্তিভরে মিতালী বলল, "গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সকাল থেকে এক ফোঁটা চা-ও পেটে পড়েনি। চা এবং তার সঙ্গে কিছু নিরামিষ খাবার আনতে বলো। আজ আমিষ চলবে না।"

চায়ের কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে মিতালী বলল, "কই, তোমার মারগারেট দিদির কথা তো শেষ করলে না!"

"শেষ তো দূরের কথা, শুরু করলাম কখন? সে এক বিরাট কাহিনী। আমাকে বাদ দিলে, এ কাহিনীর সবটুকু জানেন কেবল তিনজন,—ডাক্তার কৃপাসিন্ধু দাসগুপ্ত, তাঁর স্ত্রী সোনাবৌদি আর সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার রামচন্দ্রন। মারগারেট দিদির কথা ভেবে, অতি সাবধানে এ-কাহিনী সকলের আড়ালে একান্তে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ মারগারেট দিদি এদেশে নেই। ফিরেও আর আসবেন না কোনোদিন। তুমি যদি শুনতে চাও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার কি সময় হবে? কলেজ আছে তো?"

"না, আজ ছুটি নিয়েছি।"

"আজ বছরের প্রথম দিনে পেলাম মারগারেট দিদির ভালবাসা এবং তোমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা; ডেজমণ্ডের শুভ-সংবাদ আর বিধাতার আশীর্বাদ। আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ। বোধহয় কেবল এমন একটি নিটোল মুহূর্তেই সেই বন্ধ ফাইলটি আবার মেলে ধরা চলে।"

এরপর আমি বক্তা এবং মিতালী শ্রোতা।

প্রায় বছর সাতেক আগের কথা। কিন্তু আজও আমার মনে আছে, সেদিন ছিলো শনিবার। শীতের সন্ধ্যা। শিল্পকেন্দ্র বন্ধ হতে তখনও কিছু সময় বাকী। কামরায় বসে কাগজপত্র দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হলো কে যেন দরজায় মৃদু টোকা দিচ্ছে। মাথা তুলে

অপেক্ষা করতে লাগলাম। এবার স্পষ্ট শুনতে পেলাম, টক, টক, টক। "প্লিজ, কাম ইন।"

দরজা ঠেলে ঢুকলো একটি বিদেশী যুবক। পিছনে প্রেমসিংকে দেখে যুবকের আসার কারণ বুঝতে বাকী রইলো না। শপ-লিফটার, চুরি করেছে। বিদেশী, কিন্তু হিপি নয়। উঠে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানালাম। কিন্তু মনে মনে বললাম, আর সময় পেলে না মানিক। একেবারে দিনের শেষে এ-কম্ম করে বসলে! বাড়ি ফেরার বারোটা তো বাজিয়ে দিলেই, আর তার ওপর জমা হলো দুর্ভোগ। কার কম, কার বেশী, সেটা দস্তুরমতো গবেষণার বস্তু। কিন্তু কী আর করা, যে বিয়ের যে মন্ত্র। সাধে কী আর মাঝে মাঝে মনে হয়, এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পলিটিক্সে গিয়ে ভিড়ি! সেখানে ফ্লোর-ক্রসিং-এর খেলায় হাজারো মজা। তার উপর যদি—

চিন্তাসূত্রে বাধা পড়লো। টেবিলের অন্য প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীমান। অভ্যাসমতো হাত বাড়িয়ে দিলাম। করমর্দন করতেই চমকে উঠলাম। বরফ-শীতল হাত, মৃদু কাঁপছে। হাত ছেড়ে শূন্য চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, "প্লিজ, সিট ডাউন।"

এক্ষেত্রে অনেকে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করে। কিন্তু ও বাধ্য ছেলের মতো আমার নির্দেশ মেনে নিয়ে বসে পড়লো। আড়চোখে দেখে নিলাম প্রেমসিং দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টিতে তার লাইন ক্লিয়ারের ইঙ্গিত। ছেলেটি বসতেই কোনোরকম গৌর-চন্দ্রিকা না-করে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, "চুরি করেছো কেন?"

অবাক হয়ে গেলো ছেলেটি। হয়তো ভাবছে চুরির কথা আমি জানলাম কি করে। উত্তর না-দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলো। উত্তরের জন্য চাপও দিলাম না। হিম-শীতল হাত স্পর্শ করেই টের পেয়েছিলাম, খুব ভয় পেয়েছে। যাকে বলে, স্কেয়াচ স্টিফ। এরকম ক্ষেত্রে আমার নীতি হলো সফট্ প্যাডলিং। নীরবতার ফাঁকে ওকে বরং একটু খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। নেহাৎ ছেলেমানুষ; টীন-এজের শেষ ধাপে পা দিয়েছে কি দেয় নি।

এ পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি ছেলেটি। বিদেশী, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কোন দেশীয়। পরিষ্কার ধবধবে গায়ের রং। ভাসাভাসা টানা চোখ। ঠোঁট দুটি সামান্য পুরু। এক মাথা ঘন লালচে ঢেউ তোলা বাবরী চুল। সব মিলিয়ে একটি মিষ্টি কচি মুখের ছেলে। শাদা টেরিকট সার্টের উপর চকোলেট রঙের ধারিকাটা করড্রয়ের কোট। পরনে গরম ট্রাউজার। গলায় বাঁধা ছাপা সিল্কের স্কার্ফ। কোটের উপর-পকেট থেকে শাদা রুমালের অংশ উঁকি দিচ্ছে। কোলের উপর হাত রেখে স্থির হয়ে বসে আছে। হাতের শিল্পীসুলভ সরু সরু আঙুলগুলি একটু লম্বা ধাঁচের, তাতে পুরুষের কঠিনতা নেই। সিগারেটের প্যাকেট খুলে ছেলেটির সামনে তুলে ধরতে, মাথা নাড়লো অর্থাৎ চলবে না। প্রশ্ন করলাম, "অভ্যাস নেই বুঝি ?"

"আছে, কিন্তু এখন ভালো লাগছে না।" তারপর টেবিলের উপরে দু'হাত রেখে কাঁপা গলায় মিনতি জানালো, "স্যার, জীবনে কোনোদিন এ-কাজ করিনি। আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করুন।"

"কতোদিন হলো এদেশে এসেছো ?"

"মানে ?"

"মানে জানো না ? তবে থাক। তোমার নাম কি ?"

"ডেজমণ্ড গ্রাণ্ট।"

"ন্যাশনালিটি ?"

"ইণ্ডিয়ান।"

"তুমি ভারতীয় ? ডু আই হিয়ার ইউ রাইট ?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

চেহারা দেখে মনে হয়েছিলো বিদেশী। কিন্তু বলছে ভারতীয়। কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেলো। এ-ধরনের চেহারা ভারতীয়দের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

প্রশ্ন করলাম, "কোথায় থাকো ?"

"বম্বে।"

"এখানে কবে এসেছো ?"

"আজ সকালে।"

"কোথায় উঠেছো?"

"এখনো কোথাও উঠি নি। কোনো একটা হোটেলে রাতটা কাটাবার ইচ্ছে আছে।"

"ক'দিন এখানে থাকবে?"

"ছু'একদিনের বেশী নয়।"

"কি কাজে এসেছো?"

"একটি কোম্পানীতে চাকরীর ইণ্টারভ্যু দিতে।"

"ইণ্টারভ্যু কবে?"

"কাল সকালে।"

"তোমার লাগেজ কোথায়?"

''লাগেজ বলতে কেবল একটি স্যুটকেস। স্টেশনে রেখে এসেছি।"

"স্টেশনে কার কাছে?"

"লেফ্ট লাগেজে।"

"লেফ্ট লাগেজের রসিদ দেখি।"

মাথা নীচু করে বসে রইলো ডেজমণ্ড। মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে জেনে বললাম, "কি হলো? চুপ কেন? কই, দেখি তোমার লেফ্ট লাগেজের রসিদ।" এবার কোনো কথা বললো না। বলার তো কিছু নেই। মাথা নীচু করে বসে থাকা ছাড়া আর কি করতে পারে! হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, "কি নাম যেন বলছিলে?"

"ডেজমণ্ড গ্রাণ্ট।"

আসল নামই তাহলে বলেছে। প্রশ্ন করলাম, "থাকো কোথায়?"

"গ্রীন পার্ক।"

"বাড়ীতে টেলিফোন আছে?"

"না, স্যার।"

"কে কে আছেন বাড়ীতে?"

"কেবল আমার মা।"

"তোমার বাবা?"

"মাইগ্রেশন নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন।"

"তুমি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"তোমরা মাইগ্রেশন নাও নি কেন?"

"মা মাইগ্রেট করতে চান না।"

"ক'জন ভাইবোন তোমরা?"

"আমি একমাত্র ছেলে। একজন বড়ো বোন আছে।"

"বোন কোথায়?"

"বিয়ে হয়ে গেছে। তারাও মাইগ্রেশন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে।"

ভাবছিলাম কে এই মহিলা, যাঁর স্বামী, কন্যা ও জামাতা এদেশ ছেড়ে চলে গেলেও তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিয়ে থেকে গেলেন এখানে? কিন্তু কোনো পারসোনাল প্রশ্ন ডেজমণ্ডকে করা উচিত মনে করলাম না। বিষয় পরিবর্তন করে বললাম, "চুরি করা জিনিসগুলো সব টেবিলের ওপর রাখো। কোনো জিনিস যেন পকেটে থেকে না-যায়।"

উঠে দাঁড়িয়ে ডেজমণ্ড অতি তৎপরতার সঙ্গে তার কোট এবং ট্রাউজারের পকেট থেকে একে একে সব জিনিস বের করে টেবিলের উপর রাখলো। মনে হলো তার স্নায়ুবল ফিরে এসেছে, হাতের কাঁপুনিও হয়েছে বন্ধ। জিনিসের পরিমাণ দেখে আমি অবাক। রুপোর জলে পালিশ করা দশটি চামচ, এগারোটি কাঁটা, তিরিশটি পিতলের উপর মীনা-কাজ করা ছোটো-বড়ো রেকাবী এবং দুটি ছোটো পিতলের মূর্তি। এক মুহূর্তের লোভের উস্কানিতে ডেজমণ্ড এ-কাজ করেনি। কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে-ঘুরে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এ তার ছকে-ফেলা অপকর্ম। একে শপ-লিফটিং না-বলে শপ-কল্পিং বলাই ভালো। খেপ্‌লা জালে মাছ ধরার মতো অনেককিছু জিনিস ছেঁকে তুলেছে। জিনিসগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন করলাম, "এই সব, না আরো কিছু আছে?"

"না স্যার, আর কিছু নেই। আপনি দেখতে পারেন।"

"বেশ।" চোখের ইশারায় প্রেমসিং কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এই ছেলেটিকে কতোক্ষণ ফলো করেছো?"

"প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক হবে, স্যার।"

প্রেমসিং-এর কথায় যা জানা গেলো:

বেলা তখন প্রায় চারটে। কেন্দ্রের এক মহিলা কর্মী প্রেমসিং-এর কাছে গিয়ে, ডেজমণ্ডের দিকে তার নজর আকর্ষণ করে বলল, "এই ছেলেটির দিকে একটু নজর রাখুন তো। কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। হয়তো এ্যালকহলিক।"

কোনো কথা না-বলে প্রেমসিং সরে গেলো। ছেলেটি শ্লথ-গতিতে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিনিস দেখা কিংবা কিছু কেনার কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। ক্বচিৎ-কখনো এক-আধটা জিনিস হাতে তুলে ধরে আবার রেখে দিচ্ছে যথাস্থানে। এইভাবে ঘণ্টাখানেকের উপর ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করার পরও কিছু অস্বাভাবিক লক্ষ্য করলো না প্রেমসিং। চলার গতি শ্লথ, কিন্তু আচরণ আপত্তিজনক নয়। একবার ভাবলো কাছে গিয়ে বলে, 'স্যার, আপনি এতো ঘুরেও কি কিনবেন স্থির করতে পারলেন না। আপনাকে কি কোনোরকম সাহায্য করতে পারি?' কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চক্ষুস্থির। একগোছা ছোটোবড়ো পিতলের রেকাবী তুলে বিদ্যুৎগতিতে কোটের পকেটে পুরে ফেলেছে ডেজমণ্ড। প্রেমসিং-এর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি একসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো। কিন্তু ডেজমণ্ডের হাবভাবে দেখা দিলো না কোনো পরিবর্তন। আগের মতোই অলসগতিতে শুরু হলো তার পরিক্রমা। প্রেমসিং বুঝতে পারলো, কার্যোদ্ধারের আগে এ-পর্যন্ত ডেজমণ্ড প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ছিলো ব্যস্ত। এতোক্ষণে শুরু হলো তার 'অপারেশন শপ-লিফটিং।'

বেশ কিছুক্ষণ আর-কিছু করলো না ডেজমণ্ড। ধাতুবিভাগ ছেড়ে এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে হাজির হলো কাট্‌লারি বিভাগে। উজ্জ্বল নিয়নের আলোতে ঝকমক করছে রুপোর জলে পালিশ-করা বিভিন্ন

আকারের ছোটোবড়ো কাঁটা, ছুরি, চামচ, হাতা, খুন্তি এবং আরো কতো কি! বিভাগের একপ্রান্তে একদল বিদেশী টুরিস্ট কাঁটা-ছুরি-চামচের সেট পছন্দ করতে ব্যস্ত। কেউ চায় বারো জনের সেট, কেউ ছয়, কেউ-বা চার। বিভাগের কর্মীরা জিনিস বাছতে বা যোগান দিতে ব্যস্ত। ডেজমণ্ড হয়তো একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে থাকবে। ওদের দেশে বলে না, জল ঘুলিয়ে উঠলে মাছ ধরা। ছ'খেপে হাতে যা এলো তুলে কোট এবং ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিলো ডেজমণ্ড। প্রেমসিং যেন হাসি চাপতে পারছিলো না ডেজমণ্ডের নির্বুদ্ধিতা দেখে। মনে পড়লো এক-চোখ হরিণের কথা। বিভাগের কর্মীরা একধারে টুরিস্টদের নিয়ে ব্যস্ত, সুতরাং ওর দিকে কারুর নজর নেই! অপরপ্রান্তে প্রেমসিং যে ওৎ পেতে রয়েছে, এ-কথা জানে না ডেজমণ্ড। প্রেমসিং স্থির করলো, এরপর কোনো জিনিস তোলামাত্র চেপে ধরবে ওকে।

ডেজমণ্ড হস্ত-লাঘব দেখিয়ে চলছিলো ঠিকই, কিন্তু তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছিলো এমন নয়। বরং মনে হচ্ছিলো যেন কোনো বাইরের শক্তি তাকে পরিচালনা করছে (একথা প্রেমসিং বলেনি, তার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয়েছিলো)। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পিতলের ছুটি মূর্তি কোটের পকেটে রাখামাত্র, প্রেমসিং মুহূর্তে তার হাত চেপে ধরে হকচকিয়ে দিলো তাকে। এক-চোখ হরিণের গায়ে শিকারীর তীর এসে বিঁধলো নদীর উপেক্ষিত দিক থেকে। মুখ দিয়ে তার কোনো কথা বেরুলো না। নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলো প্রেমসিং-এর দিকে। খদ্দের-ভরা কেন্দ্রের মধ্যে কোনো অপ্রিয় দৃশ্যের সৃষ্টি না-করে, ডেজমণ্ডের হাত ছেড়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে প্রেমসিং বলল, "স্যার, অনেক হয়েছে, আর না। এবার দয়া করে আমাদের ম্যানেজারের দপ্তরে চলুন।" সুবোধ বালকের মতো, বিনা-প্রতিবাদে ডেজমণ্ড হাজির হলো আমার কামরায়।

প্রেমসিং থামতেই ডেজমণ্ডকে বললাম, "ঘণ্টা দেড়েক ঘুরে বেড়িয়ে এতোগুলো জিনিস যখন তুলেছো, তখন চুরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েই এখানে এসেছিলে, নয় কি?"

ডেজমণ্ড কবুল করলো, "হ্যাঁ, স্যার; চুরি করতেই এসেছিলাম। যে করেই হোক, কিছু টাকা তোলবার দরকার হয়ে পড়েছিলো।"

অবাক হয়ে গেলাম স্বীকারোক্তি শুনে। লেফ্‌ট লাগেজ সম্পর্কে মিথ্যা ধরা পড়ার পর, ও-পথে না-যাওয়াই হয়তো স্থির করে থাকবে। পরিণাম যাই হোক, সত্যি কথা বলার সৎ সাহস দেখিয়েছে। প্রায় সব শপ-লিফটাররাই ধরা পড়লে প্রথম দিকে একের পর এক মিথ্যা বলে যায়। তারপর সেই মিথ্যাগুলিকে ঢাকার চেষ্টায় অসংখ্য মিথ্যার জালে জড়িয়ে ফেলে নিজেদের। ডেজমণ্ড যেন একটি ব্যতিক্রম। ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করলাম না। বললাম, "চোরাইমাল বিক্রি করে টাকার চাহিদা মেটাতে চাও কেন? তোমার মায়ের কাছে চাইলেই তো পারতে। তোমার চুরির কথা তিনি যখন জানতে পারবেন, তখনকার কথা কিছু ভেবেছো?"

ডেজমণ্ড নিরুত্তর। কিন্তু টাকার এমন কি প্রয়োজন, যা সে তার মাকে জানাতে পারে না? কোথায় যেন রহস্য রয়েছে।

বললাম, "তুমি এর আগে চুরি করেছো কি না জানি না। টাকার প্রয়োজনের কথা তোমার মাকে জানাতে কোথায় বাধা, তা-ও জানি না। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার জানার কোনো দরকার নেই। কিন্তু যে অপরাধ তুমি করেছো, তার পরিণাম যে সশ্রম কারাদণ্ড, আশা-করি সে-কথাটা জানো। সারা জীবন তোমার সামনে পড়ে রয়েছে। আমি চাই না তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাক জেলখাটা কয়েদীর টীকা মাথায় লাগিয়ে। নিজেকে সংশোধন করার একটি সুযোগ তোমাকে দিতে পারি।"

থামতেই দেখি, ডেজমণ্ড টেবিলের উপর সামান্য ঝুঁকে পড়ে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে আমার প্রস্তাব শোনার আশায়। টেবিলের উপর জিনিসগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, "যদি এই সবগুলো জিনিস পুরো দাম দিয়ে কিনে নাও, তাহলে তোমাকে আর পুলিশের হাতে তুলে দেবো না।"

"কিন্তু স্যার, এতো টাকা কোথায় পাবো আমি? হাতে টাকা থাকলে তো এ-কাজ করতামই না।"

"সে মাথা-ব্যথা আমার নয়। ভিক্ষে করো, ধার করো, যা ইচ্ছে হয় করো। কিন্তু জিনিসগুলো সব কিনে নিতে হবে তোমাকে। টাকার জন্যে যদি কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাও, তাহলে সামনেই টেলিফোন রয়েছে। ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার মাকে খবর দেওয়া উচিত।"

ডেজমণ্ড মাথা নীচু করলো। যেন কিছু চিন্তা করছে। তাকে একটু সময় দেওয়ার উদ্দেশ্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালাম। একবার যদি ডেজমণ্ডের মা আসেন তাহলে আমার কর্তব্য ভালোভাবে শেষ হয়, কোনো অপ্রিয় কাজ আর করতে হয় না। সিগারেট প্রায় শেষ হতে চললো, কিন্তু ডেজমণ্ডের মুখে রা নেই। চিন্তিত হয়ে উঠলাম। কলঙ্কের বোঝা মাথায় না-চাপে এবং ভবিষ্যৎ নষ্ট না-হয়, এমন একটি মুক্তিপথের সন্ধান দিলাম, কিন্তু ডেজমণ্ডের দিক থেকে কোনো উৎসাহ দেখছি না। মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় না। হাতঘড়ি দেখে বললাম, "দেখো ডেজমণ্ড, বেশ কিছুক্ষণ হলো কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। আর সময় নষ্ট করতে পারবো না। তোমার জন্যে আমরা সকলে আটকে পড়েছি। হয় তোমাকে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই জিনিসগুলো কিনে নিতে হবে; নইলে তোমায় পুলিশের হাতেই তুলে দিতে হবে আমাকে। বাড়ীতে টেলিফোন আছে, এমন কোনো প্রতিবেশীর নাম ঠিকানা দাও, তাঁর মারফৎ আমি তোমার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।"

"আমাকে কেউ টাকা দেবে না, স্যার, মাও-না।"

"তাহলে তো তোমার পুলিশে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই।"

এর উত্তরে ডেজমণ্ড আর একপ্রস্থ ক্ষমা চাইলো। আমি কোনো আশ্বাসই তাকে দিতে পারলাম না। বললাম, "না ডেজমণ্ড, তা হয়না। সংস্থার নীতি-বিরুদ্ধ কাজ আমি করতে পারি না।"

পুলিশে টেলিফোন করার আগে ডেজমণ্ডের সার্চটা সেরে নেওয়া দরকার। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "এদিকে একবার এসো ডেজমণ্ড। নিয়ম মাফিক তোমার সার্চটা সেরে নিতে চাই।"

ডেজমণ্ড কাছে এসে দাঁড়ালো। তখন জানতাম না এই সার্চ আমাকে

কোন অতল গহ্বরের সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। এমন দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে, যা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। এমন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে যা স্বপ্নেও ভাবিনি।

ডেজমণ্ডের ট্রাউজারের পিছন-পকেট থেকে শুরু করে সবকিছু ভালোভাবে তল্লাসী নিলাম। সে বিন্দুমাত্র বাধা দিলো না। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ তার কোটের বুক-পকেটের দিকে নজর পড়লো। উঁকি দিচ্ছে শাদা ধবধবে রুমালের কিয়দংশ। মনে পড়লো, তার বুক-পকেট এখনও দেখা হয়নি। কিছু না-ভেবে, হঠাৎ রুমালটি তুলে নিতেই ডেজমণ্ড ছিটকে দু'পা পিছিয়ে গেলো। তার এই প্রতিক্রিয়া আমার মনে ছড়িয়ে দিলো সন্দেহের বীজ। বুক-পকেটে নিশ্চয়ই কোনো চোরাইমাল লুকিয়ে রেখেছে, যা বের করে টেবিলের উপর রাখেনি ডেজমণ্ড। ইচ্ছা করেই রাখেনি, রুমালের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বুক-পকেটকে নিরাপদ ভেবে নিয়েছিলো। ওর কপাল ঘেমে উঠেছে, আর কে যেন মুখের শেষ রক্তবিন্দুও শুষে নিয়েছে। হাত-পা কাঁপছে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কিন্তু ওর অবস্থা আমার মনকে ভেজাতে পারলো না। তার ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায় আমি ক্ষিপ্ত। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠলাম, "সরে গেলে কেন? বললাম যে কাছে এসে দাঁড়াও।"

কম্পিতকণ্ঠে কোনোমতে সে বলল, "স্যার, বিশ্বাস করুন, ওখানে কোনো চোরাইমাল লুকিয়ে রাখিনি।"

"শাট্ আপ্। বিশ্বাস করা আমার কাজ নয়, আমার কাজ সার্চ।"

"বিশ্বাস করুন, স্যার, বুক-পকেটে আমার একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত জিনিস আছে, লজ্জায় আপনাকে দেখাতে পারছি না।"

থমকে গেলাম। কি এমন জিনিস যা দেখাতে লজ্জা! কৌতুহল দমন করে শান্তস্বরে বললাম, "কিন্তু আমাকে দেখাতে না-চাইলেও, পুলিশ তো দেখবে। তখন আমিও দেখতে পাবো।" কোনো উত্তর না-দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্বাসের সুরে বললাম, "তেমন কোনো ব্যক্তিগত অথবা ইনক্রিমিনেটিং জিনিস হলে, এখুনি বরং দেখিয়ে দাও। দরকার হলে পুলিশ আসার আগেই সরিয়ে

ফেলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না। ডেজমণ্ড নিরুত্তরে দাঁড়িয়েই রইলো। তার এই দ্বিধায় জিনিসটি সম্পর্কে নানা সম্ভাবনা আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলো। আমার আর তর সইলো না, প্রায় ধমকে উঠলাম, "নিজে থেকে কাছে এসে দাঁড়াবে, না জোর করতে হবে?"

সঙ্গে সঙ্গে ফল পেলাম। ধীরগতিতে কাঁপা-কাঁপা পা ফেলে ডেজমণ্ড কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি আর কথা বললাম না; কোটের বুক-পকেটে সোজা আঙুল ঢুকিয়ে টেনে বের করলাম কার্ডবোর্ডের ছোটো একটি শাদা বাক্স। সিগারেটের বাক্সের মতো। শিল্পকেন্দ্রের জিনিস নয় ঠিকই; ডেজমণ্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নেড়ে চেড়ে বাক্সটি দেখতে লাগলাম। কিন্তু কি এমন রহস্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, যার জন্য ডেজমণ্ড লজ্জিত! মুখ তুলে দেখি, ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে সে। থর-থর করে কাঁপছে তার সারা শরীর। প্রেমসিং ওকে চেয়ারে বসিয়ে না-দিলে হয়তো পড়েই যেতো।

তারপর সন্তর্পণে বাক্সের ঢাকনাটি খুলে ফেললাম। ভিতরটা দেখা যেতেই ভয়ে এবং বিস্ময়ে অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, "কি সর্বনাশ!" যে জিনিস আজ আমাদের দেশে বিভীষিকার মতো ছড়িয়ে পড়েছে, ক্ষয়রোগের মতো কুরে খাচ্ছে আজকের যুবসমাজকে, যে বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রায় দেখা যায় আলোচনা, সেই জিনিস হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি! চোখের কাছে তুলে ধরে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম। বাক্সর মধ্যে তুলো দিয়ে সাজানো রয়েছে চারটি মরফিন এ্যাম্পুল এবং একটি ছোটো হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। মুখ তুলে তাকাতে দেখি, ডেজমণ্ড চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে আছে, দু'হাতে মুখ ঢাকা। নিঃশব্দে চেয়ারে বসে পড়লাম। একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো।

ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলাম ডেজমণ্ডের চুরির কথা। আমার সামনে বসে রয়েছে একজন ড্রাগ-এ্যাডিক্ট, যার অবস্থা প্রায় চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। সদা-সর্বদা মরফিন এবং সিরিঞ্জ সঙ্গে রাখে, প্রয়োজন

মতো নিজেই শট নেয়। এতোদিনে হয়তো চিকিৎসার বাইরে চলে গিয়ে থাকবে। মরফিন বিষাক্ত, নিষিদ্ধ ড্রাগ। ডাক্তারের বিনা প্রেসক্রিপসনে কিনতে পাওয়া যায় না। কেবল ড্রাগ-এ্যাডিক্টরাই জানে এর বেআইনী গোপন বিক্রয় কেন্দ্রগুলির সন্ধান। অত্যন্ত চড়া দামে কিনতে হয় তাদের। কিন্তু যতো দামই হোক, যে উপায়েই হোক, কিনতেই হবে তাদের। ডেজমণ্ডের চুরির কারণ এখন দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। চোরাই মাল জলের দরে বেচে, সেই টাকায় কিনবে এই বিষ। মাকে সংযোগ না-করার কারণও বোঝা যাচ্ছে। হয় তিনি এখনও অন্ধকারে আছেন, নয়তো তিনি ছেলের আশা ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

চেয়ার ছেড়ে ডেজমণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে দিতে দেখি গাল বেয়ে নেমেছে চোখের জলের ধারা।

তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "কতোদিন এই সর্বনাশা রোগ তোমায় ধরেছে?"

"প্রায় তিন বছর।"

"ধরলে কেন?"

"বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে।"

"কতোদূর লেখা-পড়া করেছো?"

"গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারি নি।"

"এখন কি করো?"

"কিছু না। কিছুতে মন দিতে পারি না। জাস্ট লোফিং অ্যাবাউট।"

"চমৎকার! দিনে ক'টা শট নাও?"

"ঠিক নেই। দু'তিনটে তো হয়েই যায়।"

আঁতকে উঠলাম—"বল কি! মরে যাবে যে।"

হঠাৎ ডেজমণ্ড সজোরে কেঁদে উঠলো। ঝুঁকে পড়ে আমার দু'হাত চেপে ধরে বলল, "আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচান আপনি।"

"তোমার মা এসব জানেন?"

"জানেন, সব জানেন। প্রথম প্রথম আমাকে অনেক বুঝিয়েছেন,

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথাও বলেছেন। কিন্তু আমি কোনো কথা শুনিনি। এখন আর কিছু বলেন না। আপনি আমাকে বাঁচান, প্লিজ।”

কে এই মহিলা! চুরির জন্য নয়, ডেজমণ্ডের এই মারাত্মক রোগের জন্য অন্তত একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত বলে মনে হলো। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, কি দরকার অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে। নিজেকে ডেজমণ্ডের চুরির ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রাখবো স্থির করলাম।

বললাম, “আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ডেজমণ্ড। এ-কাজ আমার নয়। রোগের ব্যাপারে তোমাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারবো না। তোমার যা অবস্থা দেখছি, তাতে করে কিছু করা যেতে পারে কি না সন্দেহ। মে বি ইউ আর বাই নাউ পাস্ট এনি ট্রিটমেণ্ট।”

ডেজমণ্ড আবার দু'হাতে মুখ ঢাকলো। কিন্তু হায়, কান্নায় অভিভূত হবার দিন অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য নিজেকে তৈরী করে তুললাম। একজন নিরপেক্ষ ন্যায়াধীশের বিচারে ডেজমণ্ড কেবল চুরির অপরাধেই নয়, বেআইনীভাবে নিষিদ্ধ ড্রাগ সঙ্গে রাখার জন্যও দণ্ডিত হবে। টেলিফোন তুলে সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার রামচন্দ্রনকে বললাম, “মিঃ রামচন্দ্রন? নমস্কার। শিল্পকেন্দ্র থেকে সরকার বলছি। কেমন আছেন?”

“ফাইন। আপনি কেমন।”

“সো-সো।”

“কিন্তু এ-সময় বাড়ী না-ফিরে অফিসে বসে কি করছেন?”

“সাধ করে নয়। ইন এ স্ন্যাপ।”

“বুঝেছি। দ্য ওল্ড স্টোরি। কেউ ধরা পড়েছে নিশ্চয়ই।”

“হ্যাঁ; কিন্তু আজকের ব্যাপারটা একটু আলাদা। যিনি ধরা পড়েছেন, তিনি একজন কনফার্মড্ ড্রাগ-এ্যাডিক্ট।”

“ড্রাগ-এ্যাডিক্ট! নো!”

“ঠিক তাই, মিঃ রামচন্দ্রন। ছেলেমানুষ, বছর কুড়ির মতো বয়েস। মামুলি শপ-লিফটিং কেস হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। কিন্তু ড্রাগ-এ্যাডিক্ট দেখে মনে হলো, আপনি হয়তো ইণ্টারেস্টেড হবেন।”

"কিন্তু কি করে বুঝলেন ড্রাগ-এ্যাডিক্ট ?"

"পকেটে মরফিন এ্যাম্পুল আর হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ পেয়েছি। তার ওপরে ও স্বয়ং কবুল করেছে।"

"মরফিন !" মনে হলো অপর প্রান্তে রামচন্দ্রন যেন চমকে উঠলেন। কোনো কথা না-বলে, অপেক্ষা করে রইলাম, তাঁর পরবর্তী বক্তব্য শোনার আশায়। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "ঠিক আছে। একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।"

টেলিফোন কেটে গেলো। বেশ কিছুক্ষণ হলো শিল্পকেন্দ্র বন্ধ হয়েছে। কর্মীরা সকলেই চলে গেছে। রয়ে গেছে কেবল তারাই, কেন্দ্রে তালা লাগাতে যারা সাহায্য করে আমাকে। ইতিমধ্যে তারা সকলেই আমার কামরায় জড়ো হয়েছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখছে ডেজমণ্ডকে আর শুনছে আমাদের কথাবার্তা। হাত ঘড়িতে দেখলাম এখন রাত প্রায় আটটা। ঘণ্টা দেড়েক হলো ডেজমণ্ড আমার কামরায় এসেছে। কিন্তু একি হলো তার ? স্থির হয়ে যেন বসতে পারছে না। কেবল উসখুস করছে। মাঝে মাঝে দু'হাত দিয়ে মাথা, ঘাড় এবং মুখের উপর ঘষছে। কি রকম যেন অস্বাভাবিক মনে হলো। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো নাকি ? মহা ঝামেলায় পড়ে গেলাম। এই রাত্রে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার-ঘর করতে হবে নাকি ! প্রেমসিংকে জল আনতে বললাম। এক নিশ্বাসে সবটুকু জল শেষ করে, টেবিলের উপর একটু অনাবশ্যক জোরে গেলাসটি রাখলো ডেজমণ্ড। ছেড়ে দিলো না ; হাতের মুঠোর মধ্যে গেলাসটি ধরেই রইলো। টেবিলের উপর কাঁটা, চামচ আর ছুরিগুলি ঝনঝনিয়ে উঠলো। এভাবে গেলাস রাখার জন্য, তার মুখে উচ্চারিত হলো না কোনো দুঃখ প্রকাশের শব্দ। ভাবছিলাম কি হলো ছেলেটার ! পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছি বলে হয়তো এটা ইচ্ছাকৃত অসৌজন্য। প্রথমে যাকে ভেবেছিলাম অসুস্থ, তার এই আচরণ দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটি বেশ কড়া কথা বলার জন্য তৈরী হতেই, হঠাৎ দরজা ঠেলে ঢুকলেন সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার জি. রামচন্দ্রন। পিছনে

ইন্‌সপেক্টর এবং দু'জন কনস্টেবল। হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে বললাম, "আসুন মিঃ রামচন্দ্রন।" করমর্দন সেরে ডেজমণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, "ডেজমণ্ড গ্রান্ট—এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।"

ডেজমণ্ড চেয়ারে বসেই রইলো। হাতের মুঠোর মধ্যে তখনো জলের গেলাস ধরা। রামচন্দ্রন কামরায় ঢুকতে ডেজমণ্ড উঠে দাঁড়িয়ে সাধারণ শিষ্টাচারটুকুও প্রকাশ করলো না। পরিচয় করিয়ে দিতে, একবার মুখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত। বিরক্তিতে মন আমার ভরে উঠলো। স্থির করলাম যত তাড়াতাড়ি হোক ডেজমণ্ডকে বিদায় করার ব্যবস্থা করবো। ওকে যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

মাথার বেরেট টেবিলের উপর রেখে, রামচন্দ্রন শাদা কার্ডবোর্ডের বাক্সটি হাতে তুলে নিয়ে ডেজমণ্ডের মুখোমুখি শূন্য চেয়ারে বসে পড়লেন। একটু ঝুঁকে পড়ে সরাসরি শুরু করলেন জিজ্ঞাসাবাদ, "কোথা থেকে মরফিন সংগ্রহ করো?" উত্তর না-দিয়ে, দু'হাতে গেলাস চেপে ধরে উসখুস করতে লাগলো ডেজমণ্ড। তারপর গেলাস ছেড়ে দু'হাত দিয়ে মাথা, ঘাড় এবং মুখের উপর হাত বুলোতে লাগলো। ঠোঁট নাড়া দেখে মনে হলো আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলেছে। মনে হলো অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে।

হঠাৎ রামচন্দ্রন কড়া স্বরে বলে উঠলেন, "বেশী সময় নেই, ডেজমণ্ড। তোমার কি অবস্থা আমি জানি। তাড়াতাড়ি জবাব দাও। কোথা থেকে মরফিন আনো?"

রামচন্দ্রনের কথা আমার কাছে সম্পূর্ণ হেঁয়ালী। বুঝতে পারলাম না তার মর্মার্থ। নিঃশব্দে বসে-বসে দেখতে লাগলাম তাঁকে। ইতিমধ্যে কার্ডবোর্ডের বাক্সটি নিজের পকেটে রেখে রামচন্দ্রন উঠে ডেজমণ্ডের দু'কাঁধ ধরে দাঁড়িয়েছেন। ডেজমণ্ড জুম্মা মসজিদের নিকটবর্তী একটি গলির নাম করতেই রামচন্দ্রন বলে উঠলেন, "আই গেট ইউ। কাশীপতির দোকান।"

মুহূর্তে যেন ডেজমণ্ডের অস্বস্তি কেটে গেলো। বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠলো, "আপনি কি করে জানলেন? কাশীপতি তো দোকানে কাপড় বিক্রি করে!"

রামচন্দ্রনের ঠোঁটের কোণে ক্ষণিকের জন্য হাসির ঝিলিক ফুটে উঠে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। বললেন, "ওটা তো একটা ব্লাইণ্ড। ও-দিয়ে পুলিশকে ঠকানো যায় না। আমাদের অনেক খোঁজ রাখতে হয়।" তারপর একটু থেমে, "আর কোথা থেকে কেনো ?"

আমতা-আমতা করে ডেজমণ্ড মিনতি জানালো, "যদি জানতে পারে আমি পুলিশকে নাম ধাম সব বলে দিয়েছি, তাহলে ওরা আমাকে একেবারে শেষ করে দেবে। ওরা সব পারে।"

"তোমার সিকিউরিটির দায়িত্ব আমার। তোমার কোনো ভয় নেই। মেক এ ক্লিন ব্রেষ্ট অব এভরিথিং।" রামচন্দ্রনের কণ্ঠে আশ্বাসের সুর। তাঁর কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আমার কান এড়িয়ে গেলো না। হঠাৎ এ পরিবর্তনের কারণ সেদিন বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরে সবকিছু স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সে-কথা রেখে, ঘটনা যে-ভাবে ঘটেছিলো, সেই ভাবেই বলি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, কয়েকবার ঘন-ঘন ঢোক গিলে, ডেজমণ্ড রাজধানীর উত্তর ভাগের একটি পশ কলোনীর ঠিকানা সমেত দুটি নাম উল্লেখ করলো। রামচন্দ্রন তাঁর ট্রাউজারের পকেট থেকে একটি চটি নোটবুক তুলে ধরে পাতা উল্টোতে উল্টোতে প্রশ্ন করলেন, "কি যেন নাম বললে ?"

"ডাক্তার আশানন্দ, চামেলী দেবী।"

নোটবুক বন্ধ করে রামচন্দ্রন প্রশ্ন করলেন, "এ-ছাড়া আর কোথায় যাও এ-বিষ কিনতে ?"

"আর কোথাও নয়, স্যার।"

হঠাৎ রামচন্দ্রন উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, "মিঃ সরকার, আমি একটু টেলিফোন ব্যবহার করতে চাই। তবে আপনারটা নয়। আশে-পাশে নিরিবিলিতে কোথাও টেলিফোন নেই ?"

সেক্রেটারীর কামরার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, "ওই দরজা দিয়ে পাশের কামরায় চলে যান। ওখানে টেলিফোন আছে।" রামচন্দ্রন দরজা ঠেলে চলে গেলেন, পিছনে ইন্‌সপেক্টর। কোনো

কথা না-বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে রামচন্দ্রনের ফেরার আশায় বসে রইলাম। ডেজমণ্ড আবার উসখুস করছে। যাকে বলে, ফিজেটি। রামচন্দ্রনের সঙ্গে বেশ ভালো ভাবেই কথা বলছিলো। কিন্তু উনি পাশের কামরায় চলে যেতে আবার নতুন করে অস্বস্তি দেখা দিলো কেন? তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে যেন বেড়ে চলেছে তার ছটফটানি। মাঝে মাঝে ঠোট দুটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরছে আর জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছে। তার টানা টানা চোখ, নিটোল নাক আর অল্প পুরু ঠোট যেন বলতে-না পারা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে। কিসের যন্ত্রণা জানি না। ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলাম, "হোয়াট এইল্‌স ইউ?"

টেবিলের উপর দু'কনুই তুলে, দু'হাতে মাথা চেপে ধরে অসহিষ্ণু কণ্ঠে চিৎকার উঠলো, "ফর গড্‌স্ সেক, স্টপ দিস বেগটিং। হোয়াই কাণ্ট্ ইউ জাস্ট লেট মি বি।"

হকচকিয়ে গেলাম। বলার মতো কোনো কথা মনে এলো না। ইতিমধ্যে পাশের কামরার দরজা ঠেলে রামচন্দ্রন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিছুক্ষণ ডেজমণ্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে সকলের অজান্তে আমার হাতে মৃদু চাপ দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, "ডেজমণ্ডের কথায় কান দেবেন না। আপাতত চুপ করে শুধু দেখে যান। পরে সব কথা হবে।"

ডেজমণ্ডের বিপরীত দিকে আবার তিনি জম্পেশ করে বসে পড়লেন। সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন। ডেজমণ্ড দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মুখ নীচু করে বসে আছে। কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে কোথায়? কিসের এক অজানা যন্ত্রণায় ক্রমাগত ছটফট করছে। এ্যাশট্রেতে সিগারেট রেখে অত্যন্ত মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করলেন রামচন্দ্রন, "আচ্ছা ডেজমণ্ড, দলে তোমরা ক'জন?

"হোয়াটস্ দ্যাট টু ইউ? প্রভোক মি ফারদার এ্যাণ্ড আই মে ডু সামথিং ড্রাসটিক।"

ডেজমণ্ডের উগ্রতা এবং আপাত-অশালীনতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে

অবিচলিত অথচ সমবেদনাভরা কণ্ঠে রামচন্দ্রন বলে উঠলেন, "তোমার যেমন চিকিৎসার দরকার, তোমার দলের ছেলেদের জন্যেও তো কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।"

"অসম্ভব। বৃথা চেষ্টা। আর কিছু হবে না। এইভাবে একদিন মরে যাবো।"

"হোয়াট রট! দেখতে চাও দু'চারজনকে যারা সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে?"

"আমার আর কিছু হবে না। ইউ আর টরমেন্‌টিং মি। এ-যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন, প্লিজ।"

"দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও।" মুক্তির নাম শুনে, ডেজমণ্ড যেন একটু চাঙ্গা হয়ে নড়েচড়ে বসলো। তার জিজ্ঞাসু চোখ রামচন্দ্রনের দিকে। রামচন্দ্রন শুরু করলেন, "তোমরা দলে ক'জন?"

"পাঁচজন ছিলাম, আমাকে ধরে। এখন চারজন।"

"বাকী সকলের অবস্থা কি রকম?"

"একজন মরে গেছে। বাকী সকলের অবস্থা আমারই মতো।"

"তোমরা সকলেই শট নাও?"

"না, আমি আর বাসুদেব অরোরা কেবল শট নিই। বাকীরা গাঁজা আর চরস। একজন এল. এস. ডি নিতো মরে গেছে। সুইসাইড করেছে। একদিন আমিও মরে যাবো।"

"না, তোমাকে কিছুতেই মরতে দেবো না। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। আচ্ছা, বন্ধুদের নাম ঠিকানা বলতে পারো?" একে একে সকলের নাম ঠিকানা তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়ে রামচন্দ্রন বললেন, "আপাততঃ তোমাকে আর কোনো প্রশ্ন করার নেই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? এ-ভাবে তিলে-তিলে নিজের জীবনটা শেষ করতে চাও, না বাঁচতে চাও?"

মুক্তির আশায় এতোক্ষণ নিজেকে কোনোমতে সংযত রেখেছিলো ডেজমণ্ড, কিন্তু আর পারলো না। হঠাৎ টেবিল থেকে জলের গেলাসটা

তুলে ধরে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলো, "হোয়াট আর ইউ আপ টু ? পিগ-স্টিকিং ? আপনার প্রশ্নের জবাব তো দিয়েছি। এবার আমাকে শট দিয়ে মুক্তি দিন। আমি আর পারছি না।"

পকেট থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্সটি বের করে রামচন্দ্রন হাইপোডামিক সিরিঞ্জ হাতে তুলে ধরে ডেজমণ্ডের দিকে তাকালেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। ক্রোধের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই তাঁর মুখে। ডেজমণ্ডের দুর্ব্যবহারের কোনোরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই তাঁর ব্যবহারে। হঠাৎ সজোরে দু'হাত নাড়তে-নাড়তে আতঙ্কিত কণ্ঠে ডেজমণ্ড প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠলো, "না না, আমি নেবো না, আমি কিছুতেই নেবো না। আমি বাঁচতে চাই, কিন্তু কি করে ? কিছুতেই যে ছাড়তে পারি না। হোয়াট, ইফ আই কিল মাইসেলফ্ !"

"ছিঃ, ও-কথা বলতে আছে ? তুমি নিশ্চয়ই বাঁচবে। একটু চেষ্টা করলেই এ-সব ছেড়ে দিতে পারো। কোনোদিন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে ?"

"না, আমার আর কিছু হবে না। আমি মরে যাবো। প্লিজ, আমাকে একটি শট নিতে দিন।" আকুল মিনতি ডেজমণ্ডের কণ্ঠে।

"বেশ, তুমি নিজেই যদি বাঁচতে না-চাও, আমার কিছু বলার নেই। তুমি চুরি করেছো, তোমার কাছে বেআইনী মরফিন পাওয়া গেছে। তোমার কপালে বেশ কিছুদিন হাজত বাস আছে। কিন্তু তারপর কি যে হবে, জানি না।"

ডেজমণ্ড প্রায় চিৎকার করে উঠলো, "আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু সে-পথ বন্ধ। বরং একটি শট,—হ্যাঁ, আমাকে একটি শট নিতে দিন।"

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে, টলে পড়লো ডেজমণ্ড। তাকে তুলে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, রামচন্দ্রন সুচ-লাগানো সিরিঞ্জ-হাতে দাঁড়িয়েই রইলেন। শট দেবার কোনো উৎসাহ লক্ষ্য করলাম না। ডেজমণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলো না। কোনোমতে টেবিল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে, রামচন্দ্রনের দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন এখুনি তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দু'চোখ তার ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু রামচন্দ্রন নির্বিকার। সিরিঞ্জ

হাতে দাঁড়িয়েই আছেন, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা মিলিয়ে যায় নি।

ফিরে ফিরে একবার রামচন্দ্রন তারপর ডেজমণ্ডের দিকে দেখছিলাম। জীবনে কোনোদিন ড্রাগ-এ্যাডিক্টের সামনা-সামনি হতে হয় নি। এ-আমার নতুন অভিজ্ঞতা। যে ডেজমণ্ড আমার কামরায় এসেছিলো, তাকে আর চেনা যায় না। চুরির কথা ভুলে গিয়ে ড্রাগ-এ্যাডিক্টকে দেখছিলাম। প্রতি মুহূর্তে পট পরিবর্তিত হতে লাগলো। ইতিমধ্যে ডেজমণ্ড যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তু'হাতে ছিঁড়ছে মাথার চুল। শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ যেন কামারের হাপর। হঠাৎ তু'হাতে মাথা চেপে ধরে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লো। ক্লান্তিতে জিভ বের-করা তার কুকুর-হাঁপানো শরীর যেন চোখে দেখা যায় না। কুকুরের মতোই জিভ দিয়ে ঝরে পড়ছে লালা।

কিন্তু আশ্চর্য! রামচন্দ্রনের মধ্যে কোনো পরিবর্তনই দেখা দিলো না। সিরিঞ্জ হাতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডেজমণ্ডের দিকে। ঘন ঘন কেবল হাতঘড়ি দেখছেন। মনে হলো কিসের জন্য যেন অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছেন। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না এ-দৃশ্য। কামরার মধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি, সকলেরই মুখে ফুটে উঠেছে যন্ত্রণা। এ-দৃশ্য যেন সকলের কাছেই হয়ে উঠেছে অসহ্য। মনে হলো এ নরক যন্ত্রণা থেকে ডেজমণ্ডকে মুক্তি দেওয়া উচিত। রাম-চন্দ্রনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডেজমণ্ডকে যন্ত্রণামুক্ত করার অনুরোধ জানাতে, তিনি এক হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, "প্লিজ, কিপ কোয়ায়েট।" মনের কথা মনেই থেকে গেলো, কিন্তু অত্যন্ত নৃশংস মনে হলো রামচন্দ্রনকে। হঠাৎ ভাবলাম, তিনি কি বিকৃত রুচি স্যাডিষ্ট! ডেজমণ্ডের নরক যন্ত্রণা উপভোগ করছেন! বিরক্তির সঙ্গে একটু ঘৃণাও হলো। কিন্তু তখন তাঁর ঘনঘন হাতঘড়ি দেখার কারণ ধরতে পারি নি।

হঠাৎ দরজা ঠেলে একদল মানুষ আমার কামরায় ঢুকলো। প্রথমে একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর। তাঁর পিছনে তুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। সবশেষে চারজন পুলিশ কন্‌স্টেবল্। মহিলা এবং তুজন

পুরুষই সুসজ্জিত; কিন্তু মহিলার সাজসজ্জা অত্যাধুনিক এবং কিঞ্চিৎ উগ্র। মিহি সীফন শাড়ী এবং খাটো পাতলা চোলীর অন্তরালে শরীরের প্রতিটি কার্ভ সুস্পষ্ট। আমার ভগ্নীপতি সুরসিক শরদিন্দুর ভাষায়, নাথিং লেফট্ টু ইমাজিনেশন্। কিন্তু এরা কারা, কোথা থেকে আসছে, পুলিশ-সমেত আমার কামরায় এ-সময়ে আসার কারণ কি? রামচন্দ্রনের বজ্রকণ্ঠ মনের মধ্যে ঠেলে-ওঠা আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিলো, "ইউ স্কাউনড্রেল! এসে পড়েছো তোমরা! নিজেদের চোখে দেখো, পয়সার লোভে কি করেছো এই বাচ্চা ছেলেটার অবস্থা।"

কোথায় গেলো রামচন্দ্রনের হাসি আর স্নেহভরা কণ্ঠস্বর! রাগে মুখের প্রতিটি পেশী হয়ে উঠেছে কঠিন, চোখে ফুটে উঠেছে তার ঘৃণা। হঠাৎ টেবিলের উপর সিরিঞ্জটা রেখে এগিয়ে গিয়ে সদ্য-আগত দু'জন পুরুষের মধ্যে একজনের গলার টাই ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "চাবুক মেরে তোমার গায়ের চামড়া তুলে দেবো আজ। অনেকদিন চেষ্টা করছি কাশীপতি, তুমি পাঁকাল মাছের মতো ফস্কে গেছো। এবার তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে।"

রামচন্দ্রনের কথা শেষ হতেই, এক ঝটকায় মাথা তুলে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালো ডেজমণ্ড। কোটের আস্তিনে মুখের লালা মুছতে-মুছতে কাশীপতির দিকে ছুটে যেতেই, রামচন্দ্রন ক্ষিপ্রগতিতে তাকে জড়িয়ে ধরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। ডেজমণ্ডের গলা থেকে কতকগুলি অসংলগ্ন শব্দ বেরিয়ে এলো, "কাশীপতি···আশানন্দ ·· ব্লাডি-সোয়াইন · খুন করে ফাঁসী যাবো ড্যাট্ বাঁচ চামেলী ··" তারপর গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না। দু'হাত টেবিলের উপর রেখে লুটিয়ে পড়লো ডেজমণ্ড। মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিলাম। চোখের উপর অভিনীত হচ্ছে হৃদয়স্পর্শী একটি নাটক। একটু মেলোড্রামাটিক কিন্তু মানবিক স্পর্শও কম নেই। তাকিয়ে আছে কেন্দ্রের উপস্থিত কর্মীরা, নিয়েছে রুদ্ধবাক দর্শকের ভূমিকা।

বুঝতে পারলাম রামচন্দ্রনের পাশের কামরায় গিয়ে গোপনে টেলিফোন করার কারণ। বেআইনী ড্রাগ চালানের একটি দল রামচন্দ্রনের জালে

ধরা পড়েছে। এতোক্ষণে তাঁর আচরণের অর্থ বোঝা গেলো। ডেজমণ্ডের নরক-যন্ত্রণা তিনি কাশীপতিদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। ঘটনার উপর পরিসমাপ্তি টানার উদ্দেশ্যে মৃদুকণ্ঠে রামচন্দ্রনকে বললাম, "মিঃ রামচন্দ্রন, উই হ্যাভ হ্যাড এনাফ ফর এ ডে! দয়া করে এবার আপনি ডেজমণ্ডকে থানায় নিয়ে গিয়ে যা করার করুন।"

রামচন্দ্রনের সস্নেহ হাত নেমে এলো আমার কাঁধে। তারপর সহকর্মীদের দিকে ফিরে হুকুম দিলেন, "আশানন্দ, কাশীপতি আর চামেলীকে থানায় নিয়ে গিয়ে লকআপে পুরে দাও।"

যে ইন্‌সপেক্টরটি তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেহেতা, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। বাকী সকলকে থানায় ফিরে যেতে বলো। আমাদের ফিরতে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে।"

হাতঘড়ির দিকে তাকাতেই অস্ফুটকণ্ঠে আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে গেলো, "ন'টা বেজে গেছে। আরও দু'ঘণ্টা!"

রামচন্দ্রন হেসে বললেন, "তা লাগবে বৈকি, মিঃ সরকার। এ-অবস্থায় ছেলেটাকে কি করে নিয়ে যাই, আপনিই বলুন। একটু সুস্থ করে তুলি, তারপর নিয়ে যাবো। বেচারা!"

ইতিমধ্যে কাশীপতিদের নিয়ে পুলিশের দল কামরা ছেড়ে চলে গেছে। টেবিলের উপর লুটিয়ে আছে ক্লান্ত, অবসন্ন, বাহ্যজ্ঞানহীন ডেজমণ্ড। কস বয়ে টেবিলের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে তার মুখের লালা।

কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে রামচন্দ্রন একটি এ্যাম্পুল তুলে নিয়ে, তার মাথা ভেঙ্গে, সিরিঞ্জে মরফিন তুলে নিয়ে ডেজমণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে তাকে নাড়া দিয়ে সম্বিত ফিরিয়ে আনলেন। কোনোমতে রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকালো ডেজমণ্ড। রামচন্দ্রনের হাতে মরফিন-ভর্তি সিরিঞ্জ দেখে একটু যেন খুশী হয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিলো। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো রামচন্দ্রন তার বাহুতে ঢুকিয়ে দিলেন হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের তীক্ষ্ণ সূচ।

অস্ফুটস্বরে মিতালী দু'চোখ বন্ধ ক'রে বলে উঠলো, "উঃ, মাগো!"

কিন্তু সে-দিনের এই শট দেওয়ার ব্যাপারে রামচন্দ্রন একটি কাজ

সেরেছিলেন সকলের অলক্ষ্যে। বহুদিন পর তিনি সে-কথা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে তাঁর চরিত্রের একটি গোপন অংশ আমার কাছে হয়েছিলো উন্মীলিত। তাঁর প্রতি আমার ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধা আরো একধাপ উপরে উঠেছিলো।

সে-দিন রাত্রে টেলিফোনে ডেজমণ্ডের কাছে মরফিনের এ্যাম্পুল এবং হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে শুনে, তিনি চমকে উঠে-ছিলেন। এর তাৎপর্য বুঝতে দেরী হয়নি তাঁর। যে-কোনো সময়ে ডেজমণ্ডের শট নেবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু মরফিন দিলে সারারাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে ডেজমণ্ড। তার মানে অনুসন্ধানে পড়বে বাধা। তাই শিল্পকেন্দ্রে আসার পথে, তিনি একটি ওষুধের দোকান থেকে এনেছিলেন হালকা ট্রানকুইলাইজারের কয়েকটি এ্যাম্পুল। আমার কামরায় ঢুকেই বুঝে নিয়েছিলেন ডেজমণ্ডের শট নেবার সময় আসন্ন। পাশের কামরায় টেলিফোন করতে গিয়ে কার্ডবোর্ড বাক্সের মরফিন এ্যাম্পুলগুলো সরিয়ে ফেলে, সে-জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন সঙ্গে-আনা হালকা ট্রানকুইলাইজারের এ্যাম্পুল-গুলো। সেদিন মরফিনের বদলে তারই শট দিয়েছিলেন ডেজমণ্ডকে। ডেজমণ্ড ভেবেছিলো তাকে মরফিন দেওয়া হয়েছে। এই রদবদলের পিছনে রামচন্দ্রনের একটি উদ্দেশ্যও ছিলো। তিনি ডেজমণ্ডের মনস্তত্বও পরীক্ষা করেছিলেন। তার অভ্যাস-রোগের মূল কতোটা গভীর তাও যাচাই করেছিলেন।

কাজ শেষ করে রামচন্দ্রন যেন দায়মুক্ত হয়ে গেলেন, ফিরেও তাকালেন না ডেজমণ্ডের দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে টেবিলের উপর দু'বাহুর মধ্যে মাথা রেখে ঝিমিয়ে পড়লো ডেজমণ্ড। শান্ত, ধীর, স্থির। শরীরের মধ্যে নেই কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা। কামরার মধ্যে দেখা দিলো একটি শান্তি ও স্বস্তির আবহাওয়া। রাতের গাঢ় অন্ধকারে জানলার বাইরে কিছু দেখা যায় না। ছাদের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি রামচন্দ্রন চেয়ারে হেলান দিয়ে ধূমপানে রত ; নিবিষ্টমনে কি যেন ভাবছেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সারা কামরায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তটস্থ

হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা আমার সহকর্মীদের লক্ষ্য করে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। ঘণ্টা দু'য়েক লাগবে ডেজমণ্ডের সম্বিত ফিরে আসতে। আপনারা সবাই বসে ততক্ষণ বিশ্রাম করুন।"

দাঁড়িয়েছিলাম আমিও। তিনি আমাকেও বসার নির্দেশ দিলেন। আসলে খেয়ালই হয়নি সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কেউ ধরিয়ে না-দিলে হয়তো আরো থাকতাম। রামচন্দ্রনের কথায় চটকা ভাঙলো। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়লাম। একেবারে হা-ক্লান্ত অবস্থা।

রামচন্দ্রন লক্ষ্য করে বললেন, "মনে হচ্ছে এরকম অভিজ্ঞতা আপনার এই প্রথম। কিন্তু আমার ?" তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্মৃতিচারণের ভঙ্গীতে বললেন, "এ-রকম কতো ডেজমণ্ডকেই না-দেখলাম! জানেন, মিঃ সরকার, এই ছোঁড়াগুলোর জন্যেই মাঝে মাঝে চাকরী ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। এদের কষ্ট, এদের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না। মনে হয়, আর সব ছেড়ে দিলেও সমাজের একজন মানুষ হিসেবে এর কিছুটা দায়ভাগ যেন আমারও।"

আমি তাঁর কথায় সায় দিলাম। বললাম, "কিন্তু এইসব প্রতি-শ্রুতিবান তরুণেরা তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে দেখেও আমরা কেবল নীরব-দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয়ভাবে তাকিয়েই থাকবো! আমাদের কি কিছুই করার নেই, মিঃ রামচন্দ্রন ?"

কণ্ঠে আমার উত্তেজনা। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার বুঝলেন আমার মনের কথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অত্যন্ত এক্সপেনসিভ। তার জন্যে কিছু লোককে এগিয়ে আসতে হবে। ভালো সাইকিয়্যাট্রিস্টের চিকিৎসায় রাখতে পারলে, হয়তো এদের বাঁচার সম্ভাবনা আছে। আমি নিজে এই সামাজিক দুষ্টক্ষতগ্রস্ত কিছু লোককে রিক্লেমড হতে দেখেছি।"

কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। অসহায় দৃষ্টিতে ডেজমণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কানে রামচন্দ্রনের কণ্ঠস্বর বেজে উঠতে চমকে উঠলাম। এ-যেন তাঁর কণ্ঠস্বর নয়। মনে হলো রাতের অন্ধকারের গহ্বর থেকে যেন ভেসে আসছে কার হৃদয়-নিংড়ানো

আন্তরিক আবেদন, "ডেজমণ্ডের জন্যে আমরা আর কিছু করতে না-পারি, অন্তত ঈশ্বরের কাছে তার জন্যে প্রার্থনা জানাতে পারি নিশ্চয়ই। যতোক্ষণ না ডেজমণ্ডের চেতনা ফিরে আসে, আসুন আমরা সকলে মিলে একসাথে ঈশ্বরের কাছে তার জন্যে প্রার্থনা জানাই। এতোগুলো মানুষের একান্ত সমবেত প্রার্থনা নিশ্চয়ই বৃথা যাবে না।"

একজন পুলিশ অফিসারের মুখ থেকে এমন কথা প্রায় চমকে দেওয়ার মতো। রামচন্দ্রনের আন্তরিকতা উপস্থিত সকলের হৃদয় স্পর্শ করলো। পুলিশের উর্দির নীচে তাঁর বুকে যে একটি তাজা মানব-দরদী হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে, তার পরিচয় পেলাম আমরা। আর রামচন্দ্রনের পৌরোহিত্যে সেই কামরায় যেন একটি প্রার্থনা-সভা বসে গেলো। আলপিন পড়লেও শোনা যায়, এমন একটি নিশ্ছিদ্র নীরবতায় কেটে গেলো কয়েকটি মুহূর্ত।

হঠাৎ কানে এলো ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, "জল।"

ডেজমণ্ড জল চাইছে। ত্বড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়ালাম। ডেজমণ্ডের মাথা তখনো দু'বাহুর মধ্যে। রামচন্দ্রন কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার দু'কাঁধ ধরে বললেন, "কি রকম লাগছে, ডেজমণ্ড।"

ডেজমণ্ড মুখ তুলতেই দেখলাম, চোখের ঘোলাটে ভাব পুরোপুরি না-কাটলেও মুখের উপর টেনশনের চিহ্ন প্রায় মিলিয়ে এসেছে। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে তার মিষ্টি হাসি। কিঞ্চিৎ ম্লান। ঘাড় তুলে একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো রামচন্দ্রনের মুখের দিকে। যেন কিছু খুঁজছে। তারপর ধীরে ধীরে থেমে-থেমে বলল, "অনেক ভালো, স্যার। কিন্তু বড়ো ক্লান্ত। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।"

রামচন্দ্রনের মুখ অন্যদিকে ফেরানো। বোধহয় পুলিশের পোড়-খাওয়া অফিসারও কখনো-কখনো আবেগ দমন করতে পারে না।

জল খাওয়া হলে ডেজমণ্ড জিজ্ঞেস করল, "ক'টা বাজে?"

"প্রায় মাঝরাত।"

"আমার বাড়ীতে একটা খবর দেওয়া কি সম্ভব হবে?"

"নিশ্চয়ই হবে। আগে আমার অফিসে চলো। তোমার ঠিকানা,

পরিচয় ইত্যাদি কিছুই তো এখনো জানা হয় নি। সেগুলি জেনে, তোমার বাড়ীতে খবর দেবো।”

সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার এবার কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার উদ্দেশ্যে বললেন, “ডেজমণ্ডকে এবার নিয়ে যেতে হবে। আপনি আপনার রিপোর্ট লিখে দিন, মিঃ সরকার।”

কাগজ টেনে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লেখা শেষ করে রামচন্দ্রনের হাতে তুলে দিলাম।

রিপোর্ট পড়ে তিনি তারিফ করলেন। বললেন, “চমৎকার হয়েছে। চাকরী-না করে ওকালতি করলে বোধহয় ভালো করতেন। ড্রাগ আর চামেলীদের কথা উল্লেখ না-করে, আমার অনেক সুবিধে করে দিলেন। অন্যদিক দিয়ে আবার কিছুটা বিপদেও ফেললেন বৈকি! রিপোর্ট যথেষ্ট নরম করে দিয়েছেন, কিন্তু ডেজমণ্ডকে নিয়ে কি করবো বুঝতে পারছি না। যাইহোক, এখন তো আমার সঙ্গে চলুক, তারপর দেখা যাবে।” একটু থেমে সেকেণ্ড থট্‌-এর মতো বললেন, “তাছাড়া আপনি তো রইলেনই।”

আমি থেকে কি সুরাহা হচ্ছে, ঠিক বুঝলাম না। এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলাম দু'দিন পর। মাথায় বেরেট পরে, ইন্‌সপেক্টর মেহতার হাতে রিপোর্টটি তুলে দিয়ে বললেন, “চলো, আমরা যাই, মেহতা। বুঝতেই পারছো, বাকী রাতটুকু বিশ্রাম লেখা নেই কপালে।”

ডেজমণ্ড উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, “মিঃ সরকার, এই বোধহয় আপনার সঙ্গে শেষ দেখা। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন।” কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে গেলো। কয়েকবার দ্রুতগতিতে কেঁপে উঠলো তার কণ্ঠনালী। কাঁধে হাত রেখে কাছে টেনে নিলাম ডেজমণ্ডকে কিন্তু উত্তরে কিছু বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর, রামচন্দ্রনকে লক্ষ্য করে বলল, “কাশীপতিরা আমার মতো কতো ছেলে-মেয়ের সর্বনাশ করেছে, আপনি ধারণা করতে পারবেন না। এ্যাণ্ড ছাট ফিলদি হোর চামেলী, ওয়েল পাস্ট হার প্রাইম! ভদ্রঘরের বিবাহিতা স্ত্রী, আজ পেশাদারের ভূমিকায় নেমেছে। নিজের অর্দ্ধেক-বয়সী অনভিজ্ঞ ছেলেদের মনে যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে দলে ভেড়ানোই

ওর কাজ। ডেকয়-ডাক হিসেবে ওর জুড়ি নেই। খুব ভালো টোপ।”

বাধা দিয়ে রামচন্দ্রন বললেন, “গল্প পরে হবে। ইট উইল কিপ। অনেক রাত হলো, এবার যেতে হয়।”

রামচন্দ্রন, মেহতা এবং ডেজমণ্ডকে কেন্দ্রের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। তিনজনে জীপে উঠলেন। ড্রাগ-এ্যাডিক্ট ডেজমণ্ডের জন্য মন ভারাক্রান্ত। নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, বিদায় সম্ভাষণ জানাবার মতো একটি শব্দও মনে এলো না। হঠাৎ এক সময় ডেজমণ্ডকে নিয়ে জীপগাড়ী রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। এক-দৃষ্টিতে জীপের রক্তবর্ণ ব্যাক-লাইটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কতোক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে প্রেমসিং-এর কথা কানে এলো, “স্যার, ছেলেটা মরে যাবে!”

চমকে উঠলাম। আমার মনের কথারই যেন প্রতিধ্বনি। দেখি সহকর্মীরা সকলেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। সকলেরই মন বোধহয় আমার মতোই এই হতভাগ্য মৃত্যু পথযাত্রী ড্রাগ-এ্যাডিক্ট ডেজমণ্ড গ্রান্টের জন্য বিষাদাচ্ছন্ন। এইটুকু বলে একটু বিরতি দিলাম।

টেবিলের অন্যদিকে বসে মিতালী শুনছে। আমার এই কাহিনীটি কাশীরাম দাস-ভনিত মহাভারতের কথা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মিতালী আমাকে পরে বলেছিলো, শুনতে-শুনতে ওর নাকি নিজেকে পুণ্যবতী বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু ওর কৌতূহলকে বাড়িয়ে তুলতে আমি বিরতি দিই নি। কোনো নাটকীয়তা-সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য ছিলো না। তবে নাটকের একটি অঙ্ক শেষ হলে, যেমন ড্রপ-সীন আপনা-থেকেই নেমে আসে, এখানে ঠিক সেই নিয়মেই ছেদ পড়লো। ইতিমধ্যে এমন কি মিতালীর উপস্থিতিও ভুলে গেছি।

জানালার বাইরে দৃষ্টি চলে গেলো। দূর গাছের ছায়ায় যেন ডেজমণ্ডকে বসে থাকতে দেখলাম। চোখ বুজে আপন মনে তন্ময় হয়ে গীটার বাজাচ্ছে। কানের মধ্যে বেজে উঠলো মধুর সুরের ঝঙ্কার।

কি সুর জানি না, কিন্তু তৃপ্তিতে মন ভরে উঠলো। আমার ঘোর কেটে গেলো যেন কার ডাকে, "সোম ...... এই সোম।"

অনুভূতির জগৎ থেকে বাহ্যজগতে ফিরে এলাম। দৃষ্টি ফেরাতে দেখি, টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে মিতালী তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, "অমন করে জানলা দিয়ে কি দেখছিলে তুমি? কতবার ডাকলাম। শুনতে পাচ্ছিলে না আমার কথা?"

এ-কথার উত্তর হয় না। সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললাম, "ও কিছু না। এমনি দেখছিলাম।"

যদিও মিতালী আর কিছু বলল না, কিন্তু চোখে যেন অবিশ্বাসের চিহ্ন। সোজা হয়ে বসে দু'হাতে তার এলো চুল একত্রিত করে আলগা খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলল, "কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলে কেন? তারপর কি হলো ডেজমণ্ডের?"

"বলছি। কিন্তু তার আগে একটু দাঁড়াও। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই। চা না কফি?"

"কফি।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে বললাম, "অন্যান্য শপ-লিফটারদের মতো ডেজমণ্ড-কাহিনী এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এ-আখ্যায়িকার শেষের দিকে আছে একটি পুনশ্চ, যাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। বরং এর তাৎপর্য মূল গল্পাংশের থেকে বেশি। তখন কল্পনাও করতে পারি নি, পরবর্তী কয়েক মাস ডেজমণ্ডের জীবনের সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে। কিন্তু পরের কথা আগে নয়। ঘটনা যেভাবে ঘটেছিলো, ঠিক সেইভাবে বললেই বোধহয় সকলের প্রতি সুবিচার করা হবে।"

উইক-এণ্ডে সাধারণতঃ শহর থেকে দূরে কোনো নির্জন ডাক-বাংলোয় চলে যাই। একাকীত্ব তখন আমার একমাত্র সাথী। বস্তুতই আমি তাকে ভালোবাসি, উপভোগ করি তার নিবিড় সঙ্গ। রবিবারের সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর, সোমবার সকালে যখন কেন্দ্রে এলাম, তখন

ডেক্সমণ্ডের কথা মনের পিছন দিকে চলে গেছে। কেন্দ্র খুলতেই নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দুপুরের পর কামরায় বসে সিগারেট ধরিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, এমন সময়, অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে এক বিদেশী মহিলা কামরার মধ্যে এক পা রেখে স্মিতহাস্যে বললেন, "আসতে পারি, মিঃ সরকার ?"

মহিলার মুখে নিজের নাম শুনে বুঝতে পারলাম কামরায় ঢোকার আগে দরজার গায়ে আঁটা নেমপ্লেটটি দেখেছেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "মোস্ট ওয়েলকাম এ্যাণ্ড গুড আফটারনুন, ম্যাম।"

"থ্যাংকস, গুড আফটারনুন। সামান্য দরকারে এসেছি একটু সময় দিতে পারেন ?"

"আপনার জন্যে আমার সময়ের কোনো ঘাটতি নেই, ম্যাডাম। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, প্লিজ বসুন।"

মহিলা বসতেই তাঁকে এক ফাঁকে 'বিহঙ্গাবলোকন' করে নিলাম। সুবেশা। টারকয়েজ ব্লুতে ছাপা সিল্কের ড্রেস। প্রকৃত সুরূপা। ধবধবে ফর্সা পরিষ্কার মুখের উপর দীর্ঘ আইব্রোর নীচে জ্বলজ্বল করছে একজোড়া নীল চোখ। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের প্রলেপ। কিন্তু সব থেকে যা আকর্ষণ করে, সেটি তাঁর অপূর্ব মিষ্টি হাসি। হাসলেই দু'গালে ফুটে ওঠে টোল। বয়স অনুমান করা কঠিন। হয়তো চল্লিশের আশে-পাশে। চেহারা এবং বচনভঙ্গী সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় জাতে ইংরেজ। অনেক বিদেশী টুরিস্টের মতোই কোনো সমস্যা নিয়ে হাজির হয়ে থাকবেন আমার কামরায়। বললাম, "আপনার জন্যে কি করতে পারি ?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে বললেন, "অনেকদিন পর শিল্পকেন্দ্রে এলাম। অনেক অদল-বদল হয়েছে দেখছি। একেবারে ঢেলে সাজিয়েছেন। সত্যিই অপূর্ব আপনাদের দোকান সাজাবার পদ্ধতি।"

"থ্যাংকস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট। আপনি মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়াতে বেড়াতে আসেন বুঝি ?"

মহিলার গালে টোল পড়লো। কোনো জবাব না দিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি

হাসতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম না এ-হাসির কারণ। তাই কোনো কথা না-বলে মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, তিনি কি উত্তর দেন শোনার আশায়। শেষে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই আমাকে বিদেশী টুরিস্ট ভেবেছেন, তাই না? কিন্তু আসলে আমি টুরিস্ট নই।"

"টুরিস্ট নন?"

"একেবারেই না, মিঃ সরকার। আমি আপনার মতোই একজন ভারতবাসী। রাজধানীর স্থায়ী বাসিন্দা।"

"বাট সিওরলি ইউ আর ইংলিশ!"

"সে-কথা অবশ্য ঠিক। তবে আমি ন্যাচারালাইজড ইণ্ডিয়ান। ভারতবর্ষই আমার স্বদেশ, বিদেশ হয়ে গেছে ইংল্যাণ্ড।"

"শুনে খুব খুশী হলাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে কয়েকজন বিদেশী মহিয়সী মহিলা নিজেদের এদেশবাসী বলে গর্ব অনুভব করতেন।আমাদের ইতিহাসের পাতায়-পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে তাঁদের নাম।"

"জানি। আপনি এ্যানি বেসান্ত, সিস্টার নিবেদিতা, মীরা বেনের মতো মহিয়সীদের কথা বলছেন।" জবাব দিলেন মহিলা হাসিমুখেই। কিন্তু পরমুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য উদাস হয়ে গেলেন। প্রায় স্বগতোক্তির মতো একটু নীচু গলায় বললেন, "মাঝে মাঝে ভাবি, আমার নাম মারগারেট না-রেখে অন্যকিছু রাখতে পারতেন গুরুজনেরা। ভাগ্যের কি পরিহাস! যে মারগারেট সিস্টার নিবেদিতার পূর্বনাম, সেই নাম রাখা হলো আমার। কিন্তু তাঁর কণামাত্র গুণ পেলাম না।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনের বিষাদাচ্ছন্নতা কাটাবার আশায় বিষয় পরিবর্তন করে বললাম, "ক'দ্দিন এদেশে এসেছেন?"

"কতোদিন? বরং জিজ্ঞেস করুন, ক'পুরুষ, মিঃ সরকার।"

"বলেন কি!"

"বাট ইট ইজ লিটারালি ট্রু, মিঃ সরকার। কিন্তু যেতে দিন ও-সব কথা। আপনার বৃথা সময় নষ্ট করছি। যে-কাজে এসেছিলাম, তাই-ই বরং বলি।"

ইতিমধ্যে তাঁর সম্পর্কে আমি বোধ করছি বাধা-না-মানা কৌতূহল। কে এই মহিলা, কি তার পরিচয়? আলাপী মিষ্টভাষিণী মহিলাটিকে শুরু থেকেই ভালো লেগেছে। পরিচয় জানার যে দরজা তিনি নিজের হাতে সামান্য খুলে দিয়েছেন, সে-দরজা বন্ধ করতে দিলাম না তাঁকে। বললাম, "কাজের কথা তো পালাচ্ছে না। আগে আপনার কথা আরেকটু হোক না।"

"ছেড়ে দিন, মিঃ সরকার। কি হবে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের কথা শুনে। আর বলারই বা কি আছে!"

"আপনার যদি ইচ্ছে আর অবসর না-থাকে, তাহলে অবশ্য অন্য কথা।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি বলবেন তা ভেবে নিলেন। তারপর মাথা-তুলে বললেন, "বেশ তাহলে শুনুন। বোরিং লাগলেই বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবো।"

আই. সি. এস পরীক্ষায় পাস করে মারগারেটের ঠাকুরদা যৌবনের শুরুতেই একদিন বাংলা মুলুকে আসেন। সঙ্গে সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী। তখন ঘোর স্বদেশী যুগ। কয়েক বছর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাটানোর পর, চাকুরীজীবনের অবশিষ্টকাল কাটালেন কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। শেষে রিটায়ার করে স্বদেশে ফিরে যান।

মারগারেটের বাবার জন্ম বাংলার মাটিতে। ঠাকুরদা তাঁর একমাত্র ছেলেকে ছোটো থাকতেই লণ্ডনে পঠিয়ে দেন লেখাপড়ার জন্য। তিনিও একদিন আই. সি. এস হয়ে সস্ত্রীক ফিরে এলেন বাংলায়। সেটা ছিলো ঠাকুরদা মশাইয়ের রিটায়ার করার কিছু আগে। কর্মজীবনের প্রথম কয়েক বছর ডিস্ট্রিক্টে কাটিয়ে একদিন মারগারেটের বাবা হেনরী রবিনসন এলেন কলকাতায়। বসবাস ময়রা স্ট্রীট এবং কর্মস্থল রাইটার্স বিল্ডিংস।

মারগারেটের বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম দিনগুলি কেটেছিলো কলকাতায়। একটি ছোটো ভাই ছিলো। অল্পবয়সেই মারা যায়। হেনরী রবিনসন ছিলেন অত্যন্ত উদারপন্থী। মেয়ের পছন্দমতো

মেলামেশাতে তিনি কোনো বাধা দিতেন না। দেশ স্বাধীন হবার কয়েক মাস আগে হেনরী রবিনসন চাকুরীজীবন থেকে অবসর নিলেন। কিন্তু স্বদেশে আর ফিরে গেলেন না। পাঞ্জাবের কুলু উপত্যকায় কয়েক বিঘে জমি কিনে গড়ে তুললেন আপেলের বাগান,—'রবিনসন অর্চার্ড'। খুব বোলবোলাও হয়েছিলো এই বাগানের। এখানেই একটু আগে-পরে রবিনসন দম্পতি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বাগানের একপ্রান্তে মাটির নীচে পাতা আছে তাঁদের শেষ শয্যা।

মারগারেট ষোল বছর বয়সে বাপ-মায়ের সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে আসেন সুদূর কুলু উপত্যকায়। পিছনে পড়ে রইলো ময়রা স্ট্রীট, লরেটো কনভেন্ট, ক্যালকাটা ক্লাব, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হগ মার্কেট আর রেস কোর্স। পড়ে রইলো যদুবাবুর বাজার, কালী-ঘাটের মন্দিরের কাছে তাঁর বাঙ্গালী বান্ধবীদের ঘরবাড়ী। চোখের জলে বিদায় নিলেন তাঁর বাঙ্গালী বান্ধবীদের কাছে। বাল্য, কৈশোর আর প্রথম যৌবনের শহর কলকাতাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে-ছিলেন মারগারেট। একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন কলকাতার সঙ্গে। জীবনে কখনো স্বদেশে যাননি, ইংল্যাণ্ড তাঁর কাছে পরদেশ।

কয়েকবছর পর ভারতীয় বিমান বাহিনীর উদীয়মান পাইলট, ফ্লাইং অফিসার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক ডেভিডের প্রেমে পড়ে, বিয়ে করলেন তাঁকে। তাঁদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ডেভিড ছিলেন মেধাবী, পরিশ্রমী এবং বে-পরোয়া পাইলট। দোষের মধ্যে মারগারেটের ভারতপ্রেম, তাঁর একটু বাড়াবাড়ি মনে হতো। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পদোন্নতি হতে লাগলো ডেভিডের। পাকিস্তানের যুদ্ধে উইং কমাণ্ডার ডেভিড প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। বীরত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ পেলেন পরম-বীর-চক্র এবং উন্নতির পথে আর এক ধাপ উঠে হলেন গ্রুপ-ক্যাপ্টেন। ইতিমধ্যে তাঁদের মেয়ে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেকে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়ায় মাইগ্রেট করলো। তারপর হঠাৎ একদিন চাকরী ছেড়ে দিয়ে ডেভিডও মাইগ্রেশন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পথে পাড়ি দিলেন।

মারগারেট তাঁর পারিবারিক জীবন-কাহিনী শেষ করে বললেন, "আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে যেতে পারলে হয়তো দেখতে-শুনতে ভালো হতো। কিন্তু আমি ভারতীয়, আমি কেন দেশ ছেড়ে যাবো? আমার দেশ গরীব, হয়তো কিছু দোষত্রুটি আছে এখানকার জনসাধারণের। কিন্তু এরাই আমার আপনজন। কেন অন্যদেশে গিয়ে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হয়ে বসবাস করবো, বলতে পারেন মিঃ সরকার? টাকাই কি জীবনে সব! আমি গেলাম না, ছেলেকে নিয়ে নিজের দেশেই থেকে গেলাম। অনেক চেষ্টা করেছিলাম ডেভিডের যাওয়া বন্ধ করতে। কিন্তু পারলাম না। ডেভিডের এ-দেশের জলবায়ুর ওপর আস্থা ছিলো না। তার ধারণা, জীবনের ফাগ এণ্ড এদেশে কাটালে বার্ধক্যের আগেই হাড়ে মরচে ধরে যাবে। ওর মুখে প্রায়ই শুনতাম, দীস্ ইজ নো ল্যাণ্ড ট ডাই ইন।" একটু থেমে কিছুক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, "ডেভিডের সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয় নি। বিয়েকে আমি কনট্রাকট নয়, স্যাক্রোমেণ্ট বলেই ভাবি। তাছাড়া আজও আমি তাকে ভালোবাসি। কিন্তু জীবন-ধারণের জন্যে আমি তার ওপর নির্ভরশীল নই। চাকরী করে যা উপার্জন করি, তাতে স্বচ্ছলভাবে আমাদের চলে যায়।"

কথা শেষ করে হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন মারগারেট।

একটি বিদেশী মনের আমূল পরিবর্তন দেখে আমি স্তম্ভিত। ভাবলাম মারগারেটের ঠাকুরদা যখন এদেশে এসেছিলেন, তখন কল্পনাও করতে পারেন নি নিশ্চয়ই, তাঁর নাতনী স্বদেশে আর কোনোদিন ফিরবে না। তিনপুরুষের বসবাসের জায়গা এই ভারতের মাটিকেই মাতৃভূমি বলে আঁকড়ে ধরবে। ইংল্যাণ্ড হয়ে যাবে পরদেশ।

বললাম, "আপনি সত্যিই ব্যতিক্রম। আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগলো। আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।"

করজোড়ে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললেন, "অনেকদিন পর কারুর কাছে নিজের কথা বললাম। কেন জানি না, আজ যেন খুব হালকা লাগছে নিজেকে, খুব শান্তি বোধ করছি মনে।"

"আপত্তি যদি না থাকে, তাহলে মাঝে মাঝে সময় পেলে নিশ্চয়ই আসবেন। খুব খুশী হবো।" উত্তর না-দিয়ে, মারগারেট ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। কিন্তু যে-কাজে তিনি এসেছিলেন, সে-কথা এখনো বাকী। মনে হলো সেটা তিনি ভুলে গেছেন। মনে করিয়ে দিয়ে বললাম, "এবার কাজের কথাটা বলতে পারেন।"

"বলার জন্যেই তো আসা। কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না কিছুতেই। এখন নিজেকে তৈরী করে নিয়েছি। এবার বোধ হয় বলতে পারবো।" মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ধীরে ধীরে বললেন, "মিঃ সরকার, আমি মারগারেট গ্রাণ্ট, ডেজমণ্ড গ্রাণ্ট-এর মা।"

শরীরের সবগুলো স্নায়ু একসাথে ঝনঝনিয়ে উঠলো। ডেজমণ্ডের মা, মারগারেট গ্রাণ্ট! বিস্ফারিত চোখে তাঁর দিকে চিত্রার্পিতের মতো তাকিয়ে রইলাম। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অস্ফুটস্বরে বললাম, "কি বললেন ?"

স্থির হয়ে বসে আছেন মারগারেট। চোখের পলক যেন পড়ছে না। তারপর আচমকা সাড়া জাগলো। শূন্য চোখের পাতা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো, ঠোঁটদুটি উঠলো থরথরিয়ে। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। বুঝলাম কাঁদছেন। এ কান্নায় শুধু নিজেকে লুপ্ত করে দেবার তাগিদ, লুপ্ত করে দিয়ে যেন ডেজমণ্ডকে উদ্ধার করতে চান। বোবার মতো তাঁকে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কি বলবো, কি আশ্বাস দেবো! শনিবারের ঘটনা একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর মারগারেট মাথা তুলে তাকাতে বললাম, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিসেস গ্রাণ্ট। কিন্তু পুলিশে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিলো না। আমি বারবার আপনার ছেলেকে বলেছিলাম আপনাকে খবর দেওয়ার জন্যে কিন্তু ডেজমণ্ড কিছুতেই রাজী হলো না। সেদিন যদি একবার আসতেন, তাহলে পরিণতি হয়তো এরকম হতো না।"

"মিঃ রামচন্দ্রনের কাছে সব আমি শুনেছি। তিনি আমাকে জোর করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। ডেজমণ্ডকে জামিনে ছাড়িয়ে, আপনার কাছে এসেছি।"

"আমার কাছে! কিন্তু কেন?"

"মিঃ রামচন্দ্রন বলেছেন, একমাত্র আপনিই ডেজমণ্ডকে বাঁচাতে পারেন। কেবল কারাবাসই নয়, ডেজমণ্ডকে সুস্থ করে তুলতে, মিঃ রামচন্দ্রনের চেনা-জানাদের মধ্যে, একমাত্র আপনিই নাকি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।"

পুলিশ অফিসারের কঠিন আবরণ ভেদ করে রামচন্দ্রনের একটি কোমল, স্পর্শকাতর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি, যা শনিবার আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিলো, তা আবার নতুন করে চোখের সামনে ফুটে উঠলো। রামচন্দ্রন নিজের হাতে কোনো সাহায্য না-করে আমাকে দিয়ে করাতে চান। উত্তর না-দিয়ে একটু আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হলাম। ডেজমণ্ডের কথা শুনে মনে হয়েছিলো, ছেলের সম্পর্কে মারগারেট সব আশা-ভরসা ত্যাগ করেছেন। তবে আজ সেই ছেলেকেই রক্ষা করার জন্য এতো উতলা হয়ে উঠেছেন কেন? মাত্র দুটি রাত্রির ব্যবধানে এমন কি ঘটেছে, যার ফলে হতাশার বদলে দেখা দিয়েছে আশার আলো, তা অনুমান করতে পারলাম না। অত্যন্ত নিরীহভাবে আক্ষেপের সুরে বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন ডেজমণ্ডের অবস্থা খুব আশা করবার মতো নয়। হয়তো ইতিমধ্যে চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। তবে তো তাকে সুস্থ করে তোলার কথাই উঠবে না।"

"ও-কথা বলবেন না, মিঃ সরকার! সব দোষ আমার। নিজেকে ভারতবাসী বললে কি হবে, আমার ধমনীতে বইছে খাঁটি ইংরেজ রক্ত। পশ্চিমের পারমিসিভ সমাজের কথা আপনি শুনে থাকবেন। ওদেশে সাবালক ছেলেমেয়েদের চালচলনে বাধা দেয় না বাপমায়েরা। ন্যায়-অন্যায় বুঝিয়ে দেন মাত্র। আদর্শের সংঘাত হলে, ছেলেমেয়েরা পৃথক বসবাস করে থাকে। কারুর ব্যাপারে কেউ মাথা গলায় না। আমিও ঠিক তাই করেছি। যখন আমার কথা শুনলো না, তখন ডেজমণ্ডের সঙ্গে

কথা বলা বন্ধ করে দিলাম। আর সেইটাই হলো আমার ভুল। আমি ভারতীয়, ভারতের আবহাওয়ায় বড়ো হয়েছে ডেজমণ্ড, কিন্তু তার সঙ্গে ব্যবহার করেছি বিদেশী মায়ের মতো।" থেমে গেলেন মারগারেট। মনে হলো অনুশোচনায় পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে তাঁর অন্তর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে, ধীরে ধীরে বলে চললেন, "মিঃ রামচন্দ্রনের সঙ্গে কথা বলার পর, আমার চোখ খুলে গেলো। দেখলাম নিতান্ত অনাত্মীয়, অপরিচিত ড্রাগ-এ্যাডিক্ট ডেজমণ্ডের জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা, তাঁর সহানুভূতি। তাঁর চিন্তাধারা আমার মনে ঝড় বইয়ে দিলো। একি করলাম আমি! স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। বিদেশে এবং ভারতে সাবালক সন্তানদের সঙ্গে মা-বাপের সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা। আকাশ-পাতাল তফাৎ। আজন্ম সে-কথা জেনেছি, দেখেছি। কিন্তু নিজের বেলায় সে-কথা কেন যে ভুলে গেলাম জানি না। মনে হয় জন্মসূত্রে পাওয়া আমার পূর্ব-পুরুষের সংস্কার আমাকে ভুল পথে চালিয়েছে। কিন্তু এখন আমার ঘোর কেটেছে, মিঃ সরকার। দেরি হয়ে গেছে জেনেও আমি স্থির থাকতে পারছি না। যদি কিছু হয়ে যায়!" বলতে বলতে মারগারেটের স্বাভাবিক আত্মসংযম যেন হারিয়ে গেলো। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে আমার হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ছেলেটাকে বাঁচান, মিঃ সরকার। ও-চলে গেলে আমার কবরে এক মুঠো মাটি দেবার কেউ থাকবে না। মরেও আমি শান্তি পাবো না।"

মন কেঁদে উঠলো আমার। মনে হলো বলি, "সব ঠিক হয়ে যাবে।" কিন্তু আমি কতদূর কি করতে পারবো তা যে নিজেই জানি না। অনেক আশা নিয়ে তিনি আমার কাছে এসেছেন। কিছু না-করতে পারলে, রামচন্দ্রনের মাথাও নীচু হয়ে যাবে। বড়োমুখ করে তিনি মারগারেটকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার উপর বিশেষ ভরসা না-থাকলে, তাঁর মতো দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী এ-কাজ করতেন না। একদিকে রামচন্দ্রন আর একদিকে মারগারেট। দুজনের দৃষ্টিই আমার দিকে ফেরানো। এ এমন একটি চ্যালেঞ্জ, যার দায়দায়িত্ব

একটি দায়সারা গোছের আশ্বাস দিয়ে মেটানো যায় না। তাকিয়ে দেখি হাত ধরে তখনো মারগারেট আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আগে একটু চা খাওয়া যাক, আসুন। তারপর কথা বলা যাবে। কি বলুন ?"

মাথা নেড়ে মারগারেট সম্মতি জানাতে, ইণ্টারকম তুলে সেক্রেটারীকে চায়ের কথা বললাম। তারপর চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু হালকা হয়ে নেওয়া দরকার। আমার ও মারগারেটের, দুজনেরই।

মারগারেট যখন চায়ে চিনি মেশাতে ব্যস্ত, তখন আমি চেয়ারে ফিরে এসে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালাম। অনেকগুলো প্রশ্ন দেখা দিলো মনের মধ্যে। পুলিশ ডাইরীতে ডেজমণ্ড সম্পর্কে রিপোর্ট কিভাবে লেখা হয়েছে ? মরফিনের কথা নিশ্চয়ই লেখা নেই। ডেজমণ্ডের কারাবাস রোধ করার একটিমাত্র পথ খোলা আছে। কিন্তু উপরাজ্যপাল কি ডেজমণ্ডের অপরাধ মকুব করতে রাজী হবেন ? তারপর প্রশ্ন উঠবে তার চিকিৎসার। এ-বিষয়ে কেবল একজনেরই দ্বারস্থ হতে পারি। তিনি ডাক্তার কৃপাসিন্ধু দাশগুপ্ত! ডাক্তারকে সবিস্তারে বললে, তিনি কি ডেজমণ্ডের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন ? সর্বোপরি চিকিৎসার ব্যয়ভার ? মারগারেট কি এ-বোঝার পুরোটা বহন করতে পারবেন ? চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে মারগারেটের কাছে কিভাবে এসব কথা তোলা যায় ভাবছিলাম, এমন সময় তিনিই যেন আমার মনের কথা টের পেয়ে, সকল সমস্যার সমাধান করে দিলেন। মারগারেট বললেন, "আমি জানি, মিঃ সরকার, ডেজমণ্ডের কারাবাস একমাত্র আপনিই রোধ করতে পারেন। মিঃ রামচন্দ্রন বারবার সে-কথা আমাকে বলেছেন। কিন্তু তার পরের চিন্তা আমার। ডেজমণ্ডকে সুস্থ করে তুলতে আমার সাধ্যের শেষ-সীমানা পর্যন্ত যেতে আমি রাজী। পাপ করেছি ; এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে পিছু হঠবো কেন ? ওর চিকিৎসার জন্যে দরকার হলে, একবেলা খেয়ে থাকবো, গ্রীন পার্কের ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবো, রাতদিন পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করবো, কিন্তু কারো কাছে

অর্থ সাহায্যের জন্যে হাত পাতবো না। এমন কি ডেজমণ্ডের বাবার কাছেও না। যে পাপ আমার, তার প্রায়শ্চিত্তের দায়ও একলা আমার।”

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে একটু থামলেন মারগারেট। প্রবল উত্তেজনায় তাঁর ফর্সা ধবধবে মুখ হয়ে উঠেছে রাঙ্গা। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কণ্ঠস্বর শুনে এবং মানসিক উত্তেজনা দেখে অবাক হলাম না। যিনি গত তিন বছর নীরব-দর্শক হিসেবে দিনের পর দিন একমাত্র পুত্রের ধীরগতিতে মৃত্যু-পথযাত্রা দেখেছেন, আজ যদি তিনিই ছ'হাত ছড়িয়ে দিয়ে সেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে বুঝতে হবে, তাঁর হৃদয়ের উৎস-মুখ থেকে একটা ভারী পাথর কেউ সরিয়ে দিয়েছে। কে আর? ওই অদ্ভুতকর্মা, রামচন্দ্রন। পুরাণের রামচন্দ্রের মতোই তিনি জলে শিলা ভাসিয়েছেন। আপন মনে এইসব কথা যখন ভাবছিলাম, হঠাৎ কানে এলো মারগারেটের কণ্ঠস্বর, “কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে আপনার ওপর মিঃ সরকার। মিঃ রামচন্দ্রন বলেছেন, শহরের সুপ্রসিদ্ধ একজন সাই-কিয়্যাট্রিস্ট আপনার বিশেষ বন্ধু। তাঁকে ডেজমণ্ডের দায়িত্ব নিতে রাজী করানোর ভার আপনার। আপনি কিন্তু 'না' বলতে পারবেন না।”

তিনি এখানেই থামলেন না। উঠে এসে আমার হাত ধরলেন। সেই স্পর্শে তাঁর মাতৃহৃদয়ের আকুতি আমার রক্তে ছড়িয়ে পড়লো। সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। রামচন্দ্রন কোনো কথাই বাদ দেন নি। আমার জন্য তিনি একটি ভূমিকা স্থির করে দিয়েছেন, আমার মতামতের অপেক্ষা রাখেন নি। সে ভূমিকায় আমাকে কেমন মানাবে জানি না, কিন্তু পালাবার পথ খুঁজে পেলাম না। সে চিন্তায় আমার মনেও সায় নেই। যেন একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এমনভাবে ছ'হাত তুলে বললাম, “ইউ উইন, মিসেস গ্র্যান্ট। কিন্তু আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আগামীকাল সকালে একবার আসবেন। কথা দিচ্ছি, সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। তবে হয়তো অনেকগুলো হার্ডল পার হতে হবে। লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট, বাট প্লিজ রিমেমবার, আই প্রমিস নাথিং, অ্যাবসলিউটলি নাথিং। যদিও আমি বিশ্বাস করি,

আপনার মতো সবকিছু বিসর্জনের সংকল্প নিয়ে কেউ যখন এসে দাঁড়ায়, তখন পর্বতপ্রমাণ বাধাও তার পথ থেকে সরে যায়।"

মারগারেট যেন একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, "অশেষ, অশেষ ধন্যবাদ, মিঃ সরকার। আমি জানি আপনিই পারবেন। গড ব্লেস ইউ।"

মারগারেট চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলাম। তাঁর শেষ কথাগুলি বার বার আমার কানে বাজতে লাগলো। তারপর কামরার মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো তাঁর সর্বস্ব পণের দৃঢ়সংকল্প।

রিসিভার তুলে ডাক্তার দাশগুপ্তর নম্বর মেলাতে কানে এলো তাঁর সেক্রেটারীর কণ্ঠস্বর, "গুড আফটারনুন। ডাক্তার দাশগুপ্ত'স্ ক্লিনিক।"

"একবার ডাক্তার সাহেবকে দিন, প্লিজ? আমি সোমেশ্বর সরকার কথা বলছি।"

"ওঃ, সরকার সাহেব, প্লিজ, একটু ধরুন।" তারপর কানে এলো "কি সংবাদ, মিঃ ডিক্সন? বহুদিন দেখা নেই। আছো কেমন?"

ডাক্তার দাশগুপ্ত আমার নামকরণ করেছেন মিঃ ডিক্সন। ওঁর ধারণা, আমি একজন ছোটোখাটো দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, খুঁজতে জানলে আমার পোষাকের কোনো গোপন অংশ থেকে বেরিয়ে পড়বে একটি ঝুলি বা থলে, আর তা এমন সব রহস্য কাহিনী দিয়ে ঠাসা, যা রূপকথার মতোই রোমাঞ্চকর।

উত্তর দিলাম, "ভালো। একটু দেখা করার সময় চাইছি।"

"ইন আদার ওয়ার্ডস্, এ্যাপয়েন্টমেণ্ট! আমার ফী নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। যদি বাই এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেখা করতে চাও, তাহলে ট্যাঁকে যেন মালকড়ি থাকে। আর বিনা এ্যাপয়েন্টমেণ্টে দেখা করতে হলে, বাড়ীতে রাত আটটার পর। চয়েস্ ইজ ইয়োরস্।" হেসে উঠলেন প্রাণ খুলে। তারপর বললেন, "যাই হোক, কবে আসছো বলো?"

"আজ রাত্রে এলে অসুবিধে হবে?"

ভারী গলায় আওয়াজ এলো. "ভীষণ।" তারপরই গলা বদলে, "ইউ আর ওয়েলকাম। রাতের আহারের বেসরকারী নিমন্ত্রণ রইলো। হ্যাভ এ পট লাক উইথ আস। গল্পের স্টক কি রকম?"

"ভিজিটের ফীটা তাহলে আমাকেই দিচ্ছেন, অফ কোর্স ইন কাইণ্ড।"

আবার একচোট প্রাণ খুলে হেসে বললেন, "ধরতে পারলে না তো? ব্যবসাদার মানুষ হয়েও ধরতে পারলে না! এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করতে চাইছিলে না? অর্থাৎ, আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবার মতলব। তার ফীর সঙ্গে খাওয়াটা জুড়ে দিয়ে, তোমার গল্প বলার পাওনা শোধ করছি। আসলে কি জানো? এটা একটা বার্টার। আমার মেডিকেল এ্যাডভাইস-এর বদলে কানাকড়ি বুঝে নেবো। লোকসানের কারবারে আমি নেই। ভালো চাও তো তোমার বৌদির জন্যে কিছু ভালো স্টক নিয়ে এসো। বুঝলে?"

"বেশ তাহলে এখন ছাড়লাম। বাই।"

রিসিভার ক্রেডেলে রেখে আপনমনে হাসলাম। ডাঃ দাশগুপ্ত যদি জানতেন কি কারণে আজ যাচ্ছি। ডেজমণ্ডের চিকিৎসা করতে যদি তিনি রাজী হন, তাহলে ডেজমণ্ড-কাহিনীর শেষ অংশের বর্ণনা একদিন তাঁকেই দিতে হবে।

সেদিন রাত্রে কেন্দ্র বন্ধ করে সোজা হাজির হলাম গ্রেটার কৈলাশে, ডাক্তার দাশগুপ্তর বাড়ীতে। শৈবাল চৌধুরীকে কেন্দ্র করে এই পরিবারটির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত। সময়ের সাথে সে-পরিচয় গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। শৈবাল চৌধুরী একদিন ক্লিনিক থেকে ছুটি পেলেন, তাঁর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হয়নি। কিন্তু আমি যে কখন দাশগুপ্ত পরিবারের একজন হয়ে গেছি, জানতে পারলাম না। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী সোনালী দাশগুপ্তর স্নেহের পাত্র হয়ে উঠলাম আমি। ছুটি মিললো না আমার।

এখানে, বুঝলে মিলি, সমালোচকদের ভাষায় একটু ডাইগ্রেসন করবো। ডাক্তার দাশগুপ্ত সম্পর্কে তোমার একটু জানা দরকার। চেম্বারে ডাঃ দাশগুপ্তর গম্ভীর, প্রফেশনাল মুখ দেখলে কে বলবে ইনিই শাদা পোষাকে এমন মজাদার মানুষ। ডাক্তারীর শেষ ডিগ্রী নিয়েছেন ভিয়েনা থেকে। ডিগ্রী পাবার পরও পুরো দু'বছর কন্টিনেণ্টে

ছিলেন। সে-সময়কার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তখন নাকি ছিলেন চার্বাক-নীতিতে বিশ্বাসী, যাকে বলে ড্রিংকিং লাইফ টু দি লীস। একবার তো হিচ-হাইক করে গিয়েছিলেন বার্লিন থেকে অসলো পর্যন্ত। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত হৈ চৈ করতেন। ওঁর ভাষায় "ব্যাকানেলিয়ান ওরজি।" চলতি কথার বদলে, উনি একটু বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। চা কখনও বলবেন না, অথচ ও-জিনিস তাঁর ঘন-ঘন চাই। চায়ের জায়গায় উনি বলেন বোহিয়া। শব্দটা অবশ্যি অভিধান থেকেই পাওয়া, তবু উনি মজা করে বলেন, "একেবারে বয়ে যাচ্ছিলাম হে। তারপর তোমার বৌদি এসে হাল ধরলেন। তখন থেকে আমার চার-দিককার সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে গেলো: বৌ, বোহিয়া, বই আর বৃত্তি। শেষেরটি হলো আমার প্রফেশান অর্থাৎ ডাক্তারী। পঞ্চমকার থেকে একটানে এসে পড়লাম চতুর্বকারে। একেবারে পুনর্জন্ম বলতে পারো।"

আমি বলেছিলাম, "ধরুন আমার মতো যদি কেউ এসে যায় সেই ম্যাজিক সার্কেলে? তাকে কোথায় বসাবেন?" উনি একেবারে হাজির-জবাব। "নো প্রব্লেম এ্যাট্ অল। তাকে বসাবো এ্যান্টিরুমে, রুগীর আসনে। তুমি হয়তো বন্ধুর স্বীকৃতি চাইছো, যাতে আর একটা বকার বাড়ে। না হে ডাক্তারের বন্ধুরাও সব রুগী। মনোরুগী। 'দিল'-এর কিছু গোলমাল না-হলে কি আর ডাক্তারের সঙ্গে 'দিল্লাগী' করতে আসে কেউ?"

এই হলো ডাঃ দাশগুপ্তর একটি রূপ। ইনফরম্যাল কথাবার্তায় একটু শিব্রামী পান উনি পছন্দ করেন। কিন্তু নীতির ব্যাপারে বড়ো এক-বগ্‌গা লোক। হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না। সেইজন্যেই ভাবনা হচ্ছিলো। বুঝতে পারছিলাম না, ডেজমণ্ডের ভার নিতে চাইবেন কি না।

যাইহোক, দাশগুপ্ত দম্পতি যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ী দাঁড়াতেই দুজনে এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা জানাতে। ড্রইং-রুমে পা দেওয়া মাত্র সোনাবৌদি ভুরু কুঁচকে বললেন, "কি ব্যাপার,

সোম ? তোমাকে শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে তুমি যেন আজ খুব চিন্তিত। হয়েছেটা কি ?”

“না, কিছু না। সারাদিন আজ বড়ো ধকল গেছে। তাই হয়তো টায়ার্ড দেখাচ্ছে।”

“চট করে হাত মুখ ধুয়ে নাও। কফির যোগাড় করছি।”

কিছুক্ষণ পর সোনাবৌদি ফিরে এলেন, পিছনে ট্রে-হাতে বেয়ারা। টিপয়ের উপর ট্রে রাখতেই দেখি, ছ'প্লেট ভর্তি সিঙ্গাড়া আর রাজভোগ। অনুরোধের অপেক্ষা না-করে প্লেট ছুটি কাছে টেনে নিলাম। কিছুক্ষণ পর একটি রাজভোগ শেষ করে, একটু টেনে টেনে একটা মোক্ষম কথা বলার ভঙ্গীতে বললাম, “যার সোনাবৌদি নেই, তার কেউ নেই।”

সঙ্গে সঙ্গে সোনাবৌদির উত্তর, “পারবে, তুমি পারবে। অফিসে স্বয়ংবর সভায় থেকে মেয়েদের মনযোগানো কথা বলতে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছো তো !”

আমার অফিসকে স্বয়ংবর সভা নাম দিয়েছেন সোনাবৌদি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, “কেন ?”

“কেন আর ? ওখানে চমৎকার চমৎকার জিনিসগুলো থরে-থরে সাজানো থাকে-না, স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রিত বরদের মতো ? তারপর সে-গুলোর মধ্যে থেকে মনের মতো জিনিস বাছাই করে নিয়ে যায়-না খদ্দেররা ? আর খদ্দেরই তো লক্ষ্মী।”

সোনাবৌদির ঠাট্টা গায়ে মাখলাম না। কফি শেষ করে টিপয়ের উপর পেয়ালা রাখতে রাখতে সোনাবৌদি বললেন, “অনেকদিন তোমার গল্প শোনা হয় নি। এনি নিউ ক্যাচ ?”

টিপয় চাপড়ে ডাঃ বললেন, “অবজেকশন। বলো ‘হাল’, ধীবর বৃত্তিতে সোমের হাত যশ আছে।”

আমি অভিভূত। মৃদু হেসে বললাম. “ধরা তো প্রায় রোজই পড়ে। কিন্তু বেশীর ভাগই চুনোপুঁটি। বড়ো জোর স্টিকলব্যাক।” (এটা ট্যাংরা মাছের ডাক্তারের প্রিয় শব্দ)

“তা কি করে হবে। গল্প-বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তুমি

ডাক্তারকে। ফী-র একভাগ তো আগে ভাগেই পেটে পুরে দিলে। তোমাকে ছাড়ছি না।"

সোনাবৌদির কথা শেষ হতেই, কানে এলো ডাক্তার সাহেবের প্রাণ-খোলা হাসি। অতি সন্তর্পণে ডেজমণ্ডের কথা শুরু করতে হবে। বুক দুরুদুরু করে উঠলো। ডাক্তার দাশগুপ্ত সাইকিয়্যাট্রিস্ট। বেফাঁস কোনো কথা যদি মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় এবং অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায় অত্যুৎসাহ, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটি কিভাবে তিনি নেবেন বলা শক্ত। তাই স্থির করলাম এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসেন ডেজমণ্ডের সাহায্যে। সাবধানে শুরু করলাম, "সোনাবৌদি ঠিকই ধরেছিলেন। একটি শপ-লিফটিং কেস নিয়ে বড়োই দুশ্চিন্তায় আছি। কি যে করা উচিত, স্থির করতে পাচ্ছি না। এখান থেকে হয়তো আমাকে আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হতে পারে।"

থেমে গেলাম। ডাক্তার দাশগুপ্ত পাইপে কয়েকবার টান দিয়ে বললেন, "কি ব্যাপার ডিক্সন! শপ-লিফটারদের তুমি তো বেশ সুষ্ঠু-ভাবেই হ্যাণ্ডেল করো। কিন্তু আজ যেন ব্যাপার তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না। এনিথিং রং?"

কোনো উত্তর দেবার আগেই সোনাবৌদি হঠাৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, "তোমার কি খুব চেনা-জানা কেউ ধরা পড়েছে? আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ?"

"না, সোনাবৌদি, বরং ঠিক উল্টো। ধরা পড়েছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত, অনাত্মীয় একটি ছেলে—ছেলেমানুষই বলা যায়—বছর কুড়ির মতো বয়েস।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সোনাবৌদি বললেন, "যাক, বাঁচালে! যা ভয় পেয়েছিলাম!"

ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, "তাহলে এতো চিন্তিত হবার কি আছে? শুরু করে দাও, শুরু করে দাও, ভায়া। হয়তো দেখবে আমরা সকলে মিলে তোমার মুশকিল আসান করে দিয়েছি।"

"যদি তা করেন, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো আপনাদের কাছে।"

সোনাবৌদি যেন অধৈর্য হয়ে উঠলেন। কথা নিয়ে এই শিকারী বেড়ালের খেলা তার অসহ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু তিনি তো জানেন না, কতো সাবধানে, যাকে ইংরেজিতে বলে, মেজারিং এভরি ট্রেড, আমাকে এগোতে হচ্ছে। বলে উঠলেন, "বড্ডো ভনিতা তোমার সোম! এবার শুরু করো দেখি।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, সোফায় হেলান দিয়ে, পায়ের উপর পা তুলে, ডাক্তার দাশগুপ্ত একমনে পাইপ টানছেন। ডার্ক ব্রাউন ফ্রেমের পুরু লেন্সের পিছনে ভালোভাবে তাঁর চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দুই ভুরুর মধ্যস্থলে দেখা দিয়েছে সামান্য কুঞ্চন। মনে হলো বেশ চিন্তামগ্ন।

তারপর ধীরে-ধীরে শনিবার সন্ধ্যায় ডেজমণ্ডের ধরা-পড়া থেকে শুরু করে, সে-দিনের দুপুরের পর মারগারেটের আমার কামরা ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত সব বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ দিলাম। ঘটনা যেভাবে ঘটেছিলো, ঠিক সেইভাবে বললাম। ডাক্তার দাশগুপ্তকে প্রভাবিত করার জন্য কিংবা সহানুভূতি আকর্ষণের আশায়, ঘটনার উপর অনাবশ্যক রং চড়ানোর দরকার মনে করলাম না। বিবরণ শেষ করে বললাম, "বলুন সোনাবৌদি, এখন আমি কি করি?"

কোনো উত্তর পেলাম না তৎক্ষণাৎ। সোনাবৌদি গালে হাত রেখে মাথা নীচু করে বসে আছেন। ডাক্তার দাশগুপ্ত কপালের উপর চশমা তুলে দিয়ে শূন্যে তাকিয়ে আছেন। মুখে তাঁর পাইপ, কিন্তু তামাক পুড়ে কখন ছাই হয়ে গেছে খেয়াল নেই। ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। বুঝতে পারলাম দাশগুপ্ত দম্পতীর হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত পড়েছে। নিঃশ্বাস চেপে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হঠাৎ মনের মধ্যে হালকা বোধ করলাম। সারাদিনের পুঞ্জীভূত টেনশন কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো। মারগারেটকে কথা দিয়েছিলাম, আমার কর্তব্য আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছি। এখন তাঁর ভাগ্য এবং ঈশ্বরের অদৃশ্য হাতের নির্দেশ। সোফার পিঠে ঘাড় ঠেকাতে, ক্লান্তিতে কখন যে চোখ বুজে গেলো জানতে পারলাম না।

হঠাৎ কপালে শীতল স্পর্শ অনুভব করতে ধড়ফড়িয়ে সোজা হয়ে বসলাম। দেখি সোনাবৌদি ঝুঁকে পড়ে আমার কপালে হাত রেখে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। হাসিমুখে বললেন, "বোকা ছেলে! এতো ভাবনার কি আছে! সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শেষ কথাগুলি কানে যেতেই চমকে উঠলাম। এই 'সব ঠিক হয়ে যাবে' কথাটাই মারগারেটকে বলতে চেয়েছিলাম সেদিন তুপুরে, কিন্তু পারিনি। সোনাবৌদির এই আশ্বাস যেন ডাক্তার দাশগুপ্তর সিদ্ধান্তের পূর্ব-সূচনা। নিশ্চিন্তে এখন মারগারেটকে আশ্বাস দিতে পারি, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কোনো কথা বলার আগেই সোনাবৌদি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, "তুমি যদি ডেজমণ্ডের কারাবাস বন্ধ করতে পারো, তাহলে তোমার দাদা ডেজমণ্ডের চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবেন।"

মুখে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু মনে মনে বললাম, 'সোনা-বৌদি, ইউ আর ওয়ার্থ ইয়োর ওয়েট ইন গোল্ড'। ডাক্তার দাশগুপ্ত কি-যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। মনে হলো তু'হাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠি, 'রামচন্দ্রন, উই হ্যাভ মেড ইট। যা চেয়েছিলে তাই হলো'। কৃতজ্ঞতায় উপছে-পড়া চোখের জলকে রোধ করতে গিয়ে সোনাবৌদির তু'হাত জড়িয়ে ধরে একটু টেনে টেনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠলাম, "যার সোনাবৌদি নেই, তার কেউ নেই।"

কৃত্রিম রোষে সোনাবৌদি চোখ পাকিয়ে তর্জন করলেন, "আবার?" কিন্তু পরমুহূর্তে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, আর কিছু না-বলে সোফায় ফিরে গিয়ে বসে পড়লেন।

ডাক্তার দাশগুপ্ত অনেকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। পাইপে তামাক ভরে লাইটার জ্বাললেন। ড্রেসিং গাউনে ঢাকা দীর্ঘ দেহ নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁতের মধ্যে পাইপ চেপে ড্রইংরুমের মধ্যে পদচারণা শুরু করলেন। তু'হাত তাঁর ড্রেসিং গাউনের পকেটের মধ্যে সেঁধানো। বেশ কিছুক্ষণ পদচারণার পর, হঠাৎ থেমে আমার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। মুখের পাইপ হাতে নেমে এসেছে।

তারপর আমার কাছ-ঘেঁষে সোফায় বসলেন। মুখে হাসি ফুটে উঠলো। চকিতে একবার সোনাবৌদির দিকে তাকিয়ে, আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ও.কে। ডেজমণ্ডের চিকিৎসার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারো।"

আমি যেন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম, আর দু'হাতে ডাক্তার দাশগুপ্তর হাঁটু চেপে ধরলাম। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারিত হলো না। গলার মধ্যে কি যেন আটকে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তিনি আমার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, "ইউ সেন্টিমেণ্টাল অ্যাস! যাইহোক, যতো তাড়াতাড়ি পারো পুলিশের ঝামেলা চুকিয়ে, ডেজমণ্ডকে আমার ক্লিনিকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করো। যা শুনলাম, তাতে করে মনে হয় অবস্থা তার খুবই সঙ্গীন। আই ওনলি হোপ ইট ইজ নট টু-উ লেট।"

"কিন্তু, ডাক্তারসাহেব, ক্লিনিকে ভর্তি করার আগে একটা কথা বলার আছে।"

উনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "কোনো দরকার নেই। তুমি কি বলতে চাও জানি। তোমার প্রশ্নের উত্তর শুনে নাও। মিসেস গ্রাণ্টকে আমি চিনি না। ডেজমণ্ড তোমার কেস, ক্লিনিকের কাগজপত্তরে অভিভাবকের নাম থাকবে তোমার। সুতরাং ঘরভাড়া, ডায়েট এবং চিকিৎসার যাবতীয় খরচখরচা তোমাকেই বইতে হবে।"

এরজন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আতঙ্কিত কণ্ঠে বললাম, "কিন্তু···"

হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ডাক্তার দাশগুপ্ত, "বাট মি নো বাট। দাঁড়াও আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয় নি। একসাথে এতোটাকা দেওয়ার ক্ষমতা যে তোমার নেই, তা জানি। তাই, অ্যাজ এ ভেরী ভেরী স্পেশাল কেস, আমি ডেফারড পেমেণ্ট-এ রাজী।"

আর স্থির থাকতে পারলাম না। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলাম, "কিন্তু ডাক্তার সাহেব, মিসেস গ্রাণ্ট···"

"কেন বাধা দিচ্ছো সোম? জাস্ট ওয়েট। সব কথা আগে শোনো। তারপর যা বলার বলবে।" হঠাৎ তাঁর চোখদুটিকে যেন কৌতুকে নেচে

উঠতে দেখলাম গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, "তোমার শপ-লিফটিং-এর গল্প বলার ফীজের দরুন ডেজমণ্ডের ট্রিটমেণ্ট-এর যাবতীয় খরচা এ্যাডজাষ্ট হবে ফ্রম টাইম-টু টাইম। জীবনভরের মতো তোমাকে গল্প-বলার জালে বেঁধে দিলাম। আশাকরি এ-ব্যবস্থায় কোনো আপত্তি নেই তোমার।"

গাম্ভীর্য আর বজায় রাখতে পারলেন না। হো হো করে হেসে উঠে সারা ড্রইংরুম কাঁপিয়ে তুললেন ডাক্তার দাশগুপ্ত। সোনাবৌদি শাড়ীর আঁচলে মুখ চেপে আছেন কিন্তু তাঁর চোখ দুটি হাসিতে যেন ফেটে পড়ছে। আর ঘাম-দিয়ে যার জ্বর ছেড়ে গেলো, সে ব্যক্তিটি হচ্ছি আমি।

তারপর হঠাৎ ডাঃ দাশগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। পাইপ হাতে পদচারণা করতে করতে বললেন, "কিন্তু ব্যাপার কি জানো, সোম? আমি জাত সাইকিয়্যাট্রিস্ট। আমি কেবল ডেজমণ্ডেরই চিকিৎসা করবো না, তোমার চিকিৎসাও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মিসেস গ্রাণ্ট এবং রামচন্দ্রন এখানে হাজির নেই। কিন্তু তোমার মাধ্যমে তাঁদের চিকিৎসাও চলেছে। তুমি তাঁদের কাছে আজকের সবকথা বলবে নিশ্চয়ই। এ্যাণ্ড দ্যাট্ ইজ দ্য বিগিনিং অফ মাই ট্রিটমেণ্ট ফর দেম্।" তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সোনাবৌদির দিকে স্থির-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "সোনালী, ইউ টু-উ আর আনডার মাই ট্রিটমেণ্ট।"

সোনাবৌদি কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু ভয়ে-ভয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, "তার মানে?"

"তুমি তো সাইকোলজির ছাত্র ছিলে না, তাই আমার কথা ঠিক বুঝবে না। তুমি যখন ডেজমণ্ডের কথা বলছিলে, আমি তখন তোমাদের প্রত্যেকের কথা, প্রতিক্রিয়া এবং মন্তব্য নিজের মনে বিশ্লেষণ করে চলেছিলাম। দেখলাম, তোমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো কারণে মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছো। বিশ্লেষণে সুবিধে হয়েছিলো, কারণ তোমার বলার ধরনটা খুব সুন্দর। ইউ হ্যাভ এ্যান আই ফর দ্য মাইনিউটেস্ট ডিটেলস্। খুঁটিনাটি বাদ দাও না। এই খুঁটিনাটির প্রয়োজনীয়তা কেবল সাইকিয়্যাট্রিস্টরাই জানে। এ-ধরনের সহযোগিতা

পেলে আমরা নির্ভুল সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারি। যাক্, ও-সব কথা। সুবিধে মতো একবার রামচন্দ্রনকে নিয়ে এসো। তাঁকে একবার দেখতে চাই।"

বলার মতো কোনো কথা মনে এলো না। শুধু চুপ করে রইলাম। আরো কিছুক্ষণ পদচারণার পর ডাক্তার দাশগুপ্ত সোফায় বসে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার আর সোনালীর কথাই ধরা যাক না কেন। তোমাদের যদি মানসিক অসুস্থতা না-ঘটে থাকতো, যদি তোমরা ডেজমণ্ডের জন্যে মনে-মনে কেঁদে আকুল না-হতে, তাহলে নিশ্চয়ই একবার ওই বড়ো ওয়াল ক্লকটা তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। বাহ্যজ্ঞান যদি না-হারাতে, তাহলে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ঘড়ির মিষ্টি চাইম তোমাদের কানের ভিতর দিয়ে নিশ্চয়ই মরমে পৌঁছোতো। রাত একটা বেজে গেছে কিন্তু সে-কথা তোমরা কেউই জানতে পারলে না।"

সেদিন শেষরাত্রে যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন মন খুব হালকা, টেনশনের চিহ্নমাত্র নেই। সোনাবৌদি আর ডাক্তার সাহেবের কথা ভাবতে-ভাবতে একসময় ঘুমের কোমল অন্ধকারে ডুবে গেলাম।

যেন সত্যি-সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছি—এমনভাবে আমার কণ্ঠস্বর আপনা-আপনি থেমে গেলো।

মিলি বলল, "থামলে কেন ? ফর এফেক্ট, না ক্লান্তি লাগছে ?"

বুঝলাম এমন একটা সাসপেনসের মুখে বিরতি ওর পছন্দ নয়। তাই ছেঁড়া সুতো আবার জোড়া দিলাম।

পরের দিন সব কথা শুনে মারগারেট নিষ্পলক দৃষ্টিতে বসে রইলেন। দৃষ্টি নিষ্পলক কিন্তু শুকনো নয়। সে চোখের জলে যেমন কৃতজ্ঞতার নম্রতা, তেমনি আশার আনন্দ, সেই জলই দেখলাম তাঁর চোখে। তারপর একসময় রুমালে চোখ মুছে, ধীরপায়ে কাছে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর এই নিরুচ্ছ্বাস কৃতজ্ঞতা জানাবার ধরন আমাকে মোহিত করে দিলো। নিজের আসনে ফিরে যাবার আগে, তাঁর নিজের ধরনে আমার শিরশ্চুম্বন

করে রুদ্ধকণ্ঠে ফিস-ফিস করে মন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গীতে বললেন, "গড্ ব্লেস ইউ, গড্ ব্লেস ইউ।"

সময় অল্প। ডেজমণ্ডকে যতো তাড়াতাড়ি হোক, ডাক্তার দাশগুপ্তর ক্লিনিকে ভর্তি করতে হবে। সেদিন সন্ধ্যায় ডেজমণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে উকিলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। খুনের কেস নয়। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই মানবিক কারণে আসামীকে অব্যাহতি দিতে পারেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের মতিগতি আগে থাকতে বোঝা মুশকিল, আর উকিলের পক্ষেও প্লিডিং-এর বাইরে তাঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা বে-আইনী। কিন্তু সে তো পরের কথা। কেস যদি কিছুদিন ধরে চলে, তবে খালাস হয়ে ফিরে এলেও ডেজমণ্ড হয়তো চিকিৎসার বাইরে চলে যাবে। তাই উকিলের পরামর্শ মতো উপ-রাজ্যপালের নামে মারগারেটের তরফ থেকে একটি মারসি পিটিশন লিখলাম। আবেদনে মারগারেটের পূর্ব-পুরুষের পরিচয় দিয়ে গ্রুপ-ক্যাপ্টেন ডেভিড গ্রাণ্টের কথা লিখলাম। পরিশেষে ডেজমণ্ডের রোগ এবং ডাক্তার দাশগুপ্তর চিকিৎসার কথা জানিয়ে, চুরির অপরাধের জন্য ভিক্ষা করলাম মার্জনা এবং কারামুক্তি। ব্যক্তিগত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন শেষ করলাম। স্বাক্ষর করতে গিয়ে মারগারেটের হাত আতঙ্কে একটু কেঁপে উঠলো। আবেদন যদি গ্রাহ্য না হয়, তবে? উপ-রাজ্যপালের নামে শিল্পকেন্দ্রের সুপারিশপত্র, মারগারেটের আবেদনের সঙ্গে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলাম যথাস্থানে।

কিছুদিন উদ্বেগে কেটে যাবার পর, উপ-রাজ্যপালের দপ্তর থেকে একটি চিঠি পেলাম। ব্যক্তিগত সাক্ষাতের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। নির্ধারিত দিনে মারগারেটকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলাম উপ-রাজ্যপালের দপ্তরে। ডেজমণ্ডের ফাইল তাঁর সামনে টেবিলের উপর রাখা ছিলো। ফাইল খুলে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, যথাস্থানে স্বাক্ষর করে দিলেন। সামান্য দু'চারটি কথাও বলেছিলেন। একবার আমার দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে জানালেন, শিল্পকেন্দ্রের সুপারিশ পড়ে তিনি খুশী হয়েছেন। মারগারেটকে বললেন, "আমার মন্তব্যসহ আপনার

আবেদন পত্রটি আজই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চলে যাবে। আগামীকাল ছেলেকে নিয়ে তাঁর আদালতে আপনার উকিল মারফৎ আবেদন জানালে, তিনি আপনার ছেলের বিরুদ্ধে মামলা খারিজের যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। আপনার শুভ কামনা করি, মিসেস গ্রান্ট।"

ফেরার পথে গাড়ীতে একটি কথাও বললেন না মারগারেট। সারাক্ষণ মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আড়চোখে কয়েকবার তাকাতে মনে হলো, তাঁর মন দূর-দূরান্তরে কোথায় যেন বিচরণ করছে।

কোর্ট-কাছারীর ঝামেলা চুকিয়ে ডেজমণ্ড আর মারগারেটকে সঙ্গে নিয়ে একদিন হাজির হলাম গ্রেটার কৈলাশের সেই দোতলা বাড়ীতে, যার গায়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা আছে, ডাক্তার দাশগুপ্ত'স্ ক্লিনিক।" আগেই বলা ছিলো, ডাক্তার সাহেব তাঁর চেম্বারে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি ডেজমণ্ডের হাত ধরে সোজা ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমাদের সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। মারগারেটের এই প্রথম ডাক্তারের চেম্বারে আসা। তাঁর সঙ্গে পরিচয় তো দূরের কথা, একটি সম্ভাষণ পর্যন্ত জানালেন না ডাক্তার। সেদিন মারগারেটের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো জানি না, কিন্তু মনে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম আমি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এলেন ডাক্তার দাশগুপ্ত, হাতে একগোছা কাগজ। মারগারেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটু হেসে বললেন, "ফিরে আসতে দেরী দেখে নিশ্চয়ই খুব ভাবনায় পড়েছিলেন, না? আমি ডেজমণ্ডকে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করেছি। ছ'মাস, ওনলি সিকস্ মান্থস আমাকে সময় দিন। ডেজমণ্ড তার মধ্যে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে। আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হবেন না। আপনার ছেলে এখন কেবিনে বসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে চা খাচ্ছে আর গল্প করছে।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ডাক্তার দাশগুপ্তর দিকে। কি অদ্ভুত মানুষ। মারগারেটের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম দেখা, কিন্তু এমনভাবে কথা বলছেন, যেন কতোদিনের আলাপ, কতোদিনের পরিচয়! মারগারেট

বোধহয় তাঁর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ঝড়ের গতিতে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ডাক্তার দাশগুপ্ত। হাতে-ধরা কাগজের গোছা দেখিয়ে বললেন, "আপনার ছেলের কাছ থেকে কেস হিস্ট্রি জেনে নিয়েছি। আপনাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার আছে। একবার কাইগুলি, এই পাশের কামরায় আসবেন?"

যন্ত্রচালিতের মতো মারগারেট অনুসরণ করলেন ডাক্তার দাশ-গুপ্তকে। সিগারেট ধরিয়ে একাকী বসে রইলাম ডাক্তারের চেম্বারে। কতো কথাই না মনে আসছিলো, কতো ছবিই না ভেসে যাচ্ছিলো চোখের উপর দিয়ে। হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, সোনাবৌদির ক্লিনিকে আসার কারণ কি? আর, আমার সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করলেন না! ডেজমণ্ডের কাছেই বা বসে আছেন কেন? তবে কি ডেজমণ্ডের অবস্থা ভালো নয়? ডাক্তার দাশগুপ্ত কি তবে শুধু স্তোকবাক্য শুনিয়ে গেলেন? আতঙ্ক দেখা দিলো মনে। যদি ডেজমণ্ড সুস্থ হয়ে না ওঠে? এখানেই যদি তার মৃত্যু হয়? নানান জল্পনা-কল্পনায় দু'কান গরম হয়ে উঠলো, ঝিমঝিম করতে লাগলো মাথা। স্থির হয়ে আর বসে থাকতে পারলাম না। চেম্বারের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দেয়ালের গায়ে বিচিত্র রকমের চার্ট। আলমারীগুলোতে ঠাসা বই। টেবিলের উপর একগোছা দেশবিদেশের মেডিকেল জর্নাল। দুর্বোধ্য জেনেও একটি জর্নাল তুলে ধরে উল্টে চলেছিলাম, এমন সময় কানে এলো, "তাহলে ওই কথাই রইলো মিসেস গ্রাণ্ট।"

ফিরে তাকাতে দেখি এ্যান্টিরুম থেকে বেরিয়ে আসছেন মারগারেট এবং ডাক্তার দাশগুপ্ত। চেয়ারে বসে, ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, "প্রথম একমাস ডেজমণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারবো না। তারপর প্রতি সপ্তাহে পনেরো মিনিটের জন্য একবার দেখা করতে পারেন। কিন্তু, নো টক্ অ্যাবাউট হিজ ইলনেস এ্যাণ্ড ট্রিটমেণ্ট।" একটু থেমে যোগ করলেন, "একটা কথা উঠেছিলো না, এ ওয়ার টু এণ্ড এ ওয়ার? আমাদের ডাক্তারদেরও তেমনি হৃদয়ের অনুশাসন মানতে গিয়েই একটু হৃদয়হীন হতে হয়। যা কিছু করছি, ইন দি ইনটারেস্ট

অব ডেজমণ্ড। আপনার কো-অপারেশন নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।”

“আপনি যা বলবেন তাই হবে ডাক্তার দাশগুপ্ত। দরকার হলে যতোদিন বলবেন ততোদিন না-দেখা করে থাকবো। আমি অবুঝ নই। আমি এর থেকে ঢের কঠিন অগ্নি পরীক্ষার জন্যে তৈরী।”

মারগারেটের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো। তিনি কিছুক্ষণের জন্য আত্ম-সংযম হারিয়ে ফেললেন। কোনো কথা বললেন না ডাক্তার দাশগুপ্ত। হাত তুলে আমাকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন।

কিছুক্ষণ পর মারগারেট মুখ তুলে তাকালেন। মনে হলো মন তাঁর হালকা হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে সলজ্জ হাসি, ছু'গালের উপর দেখা দিয়েছে টোলের আভাস। সলজ্জে বললেন, “ক্ষমা করবেন। হঠাৎ জল এসে গেলো চোখে। কিন্তু সে-জন্য আমার কোনো সঙ্কোচ নেই আপনাদের কাছে। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। আপনাদের হাতে ডেজমণ্ড নিশ্চয়ই নতুন মানুষ হয়ে উঠবে।”

তারপর একমাস ছেলের সঙ্গে দেখা করতে না-পেরে, কিভাবে মারগারেট দিন কাটিয়েছেন, তা কেবল আমিই জানি। প্রতি সপ্তাহে অতন্ত ছু'একদিন আমার অফিসে আসতেন। কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। তারপর কোনো কথা না-বলে এক সময় নিঃশব্দে উঠে চলে যেতেন। কদাচিৎ কোনো প্রশ্ন করতেন ডেজমণ্ড সম্পর্কে। রামচন্দ্রন ফোনে নিয়মিত ভাবে খবর নিতেন ডেজমণ্ডের। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার ডাক্তার দাশগুপ্তের চেম্বারে গিয়েছি কিন্তু একবারও অনুমতি মেলেনি ডেজমণ্ডের সঙ্গে দেখা করার। একদিন ডাক্তার সাহেব বললেন, “কেন এতো ভাবছো বলো দিকি, সোম! নার্সিং-এর ভার তোমার সোনাবৌদি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। ডেজমণ্ড ভর্তি হবার পর থেকে উনি চব্বিশ ঘণ্টা ক্লিনিকেই আছেন। এটাই এখন তাঁর ঘরবাড়ী।”

আমার কাছে এটা নতুন খবর। বেশ চমকে দেবার মতো। সোনাবৌদি তাঁর স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ডেজমণ্ডকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায়। কিন্তু কেন? এ-প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজে পেলাম

না। পরেও কোনোদিন পাইনি। ডাক্তার দাশগুপ্তর সেই কথাটাই শুধু মনে হয়েছিলো, "সোনালী, ইউ টু-উ আর আণ্ডার মাই ট্রিটমেণ্ট।"

একমাস পার হতেই ডেজমণ্ডের সঙ্গে মারগারেটের প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্য আজও আমার কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু কেবিনে ঢুকে সোনাবৌদিকে দেখতে না-পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অথচ তিনি নাকি চব্বিশ ঘণ্টা ক্লিনিকেই থাকেন, এটাই নাকি এখন ওঁর ঘরবাড়ী। কেবিনের দরজার কাছে ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ালেন মারগারেট। ধীরে ধীরে কট্ থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ডেজমণ্ড। মাথায় আগেকার সেই কোঁকড়ানো লালচে বাবরী চুলের চিহ্ন নেই। শীর্ণতার প্রতিমূর্তি। মনে হলো প্রচুর ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে তার শরীর ও মনের উপর দিয়ে। দুর্বল শরীর নিয়ে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। শক্তি গেছে, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু মিলিয়ে যায়নি। আজ যেন সেই হাসি আরো মিষ্টি লাগলো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, এ-হাসির সঙ্গে মারগারেটের হাসির কি অপূর্ব মিল। একেবারে যেন মায়ের হাসি! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মারগারেটের মুখে হাসি নেই। ঠোঁট দুটি তাঁর অল্প-অল্প কাঁপছে। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সংযত করে, হাসিমুখে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ডেজমণ্ডকে। ভেঙ্গে পড়লো ডেজমণ্ড তাঁর শরীরের উপর। আস্তে আস্তে কটে বসিয়ে দিয়ে তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে তার পাশে বসলেন মারগারেট। মাথা, ঘাড়, বুক, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করলেন, "কেমন আছো?"

"অনেকটা ভালো। তবে বড়ো দুর্বল হয়ে গেছি, মা। সোনা-আন্টি অবিশ্যি বলেছেন, আমি নাকি খুব শীগগিরই চলে-ফিরে বেড়াবো।"

"সোনা-আন্টি কই? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"এইমাত্র তো এখানেই ছিলেন। তোমরা আসতে কোথায় গেলেন, জানি না।"

মারগারেট কোনো প্রশ্ন করলেন না ডেজমণ্ডের শরীর কিংবা চিকিৎসা সম্পর্কে। কেবল সে-দিনই নয়, পরেও কোনোদিন তাঁকে এ-প্রশ্ন তুলতে শুনিনি। প্রতিবার সাক্ষাৎকালে পারিবারিক কথাবার্তার মধ্যে নিজেকে

সীমাবদ্ধ রাখতেন। আমার উপস্থিতিতেই ঘটতো তাঁদের সাক্ষাৎকার। আমার এই উপস্থিতির পিছনে ছিলো ডাক্তার দাশগুপ্তর গোপন নির্দেশ।

ডেজমণ্ডের ক্লিনিকে ভর্তি হবার পর, প্রথম একমাস মারগারেট আমার অফিসে আসা-যাওয়া করেছেন, কিন্তু কোনোরকম কথাবার্তা হয়নি বলা যেতে পারে। তারপর প্রতি সপ্তাহে একবার তাঁকে ক্লিনিকে নিয়ে গেছি। প্রথমদিকে সারা রাস্তা গম্ভীরভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। তারপর ডেজমণ্ডের শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের হাসিও আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে লাগলো। তখন এক নাগাড়ে কতো কথাই না বলতেন। নিজের কথা, বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের নানা রঙের দিনগুলির কথা। বান্ধবীদের কথা, নামগুলি এখনো মনে আছে। চন্দনা, সুপর্ণা, মন্দিরা, কেতকী আরও কতো। ডেজমণ্ডের বাল্যকালের কাহিনী, বিবাহিত জীবনের টুকিটাকি, মেয়ে-জামাই আর স্বামীর কথা। ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় রাতের অন্ধকারে ডেভিড বিমান নিয়ে উড়ে যেত, কিভাবে একলা সারারাত জেগে বসে থাকতেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে উঠতেন। তিনি আমার বিষয়ও সবকিছু জেনে নিয়েছিলেন। এইভাবে কবে যে পরস্পরের মধ্যে আড়ষ্টতা এবং শুষ্ক সৌজন্যের পর্ব কেটে গিয়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিলো, তার দিন-ক্ষণ কেউ লিখে রাখি নি। মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসাও করতেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর মার্জিত কথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা সূক্ষ্ম-ভাবে ফুটে থাকতো। অফিস বন্ধ করে ক্লিনিকে যেতাম। ফ্লাস্কে চা এবং নিজের হাতে তৈরী কেক সব সময় সঙ্গে নিয়ে আসতেন।

এইভাবে ছ'মাস কেটে যেতে একদিন ডাক্তার দাশগুপ্ত আমাদের তাঁর চেম্বারে নিয়ে গিয়ে ঘোষণা করলেন, "মিসেস গ্রাণ্ট, আগামীকাল ডেজমণ্ডের ছুটি। হি ইজ কম্প্লিটলি কিওর্ড। আর কোনোদিন মরফিনের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষবে না। কনগ্রাচুলেশন। নাউ, ইফ দিস ইজ নট এ্যান অকেশন ফর এ সেলিব্রেশন, আই ডু নট নো হোয়াট ইজ। ডেজমণ্ডকে নিয়ে যাবার আগে, আগামীকাল বিকেলে এই চেম্বারে

একসঙ্গে বসে চা পান করবো। এগ্রিড?" মারগারেট হাসিমুখে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

পরের দিন ক্লিনিকে যাবার জন্য মারগারেট যখন গাড়ীতে উঠে পাশে বসলেন, পরনে ছিলো তাঁর চাঁপা রঙের সিল্কের শাড়ী, সিল্কের ব্লাউজ, প্রায় গায়ের রং ঘেঁষা। এই প্রথম তাঁকে শাড়ী পরতে দেখলাম। সূক্ষ্ম দুটি ভুরুর মধ্যস্থলে জ্বলজ্বল করছে টকটকে লাল টিপ। গাড়ীতে স্টার্ট দিতে ভুলে গেলাম। সপ্রশংস চোখে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে রইলাম। কী যে এলিগান্ট লাগছিলো তাঁকে! আমাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে, তিনি যেন প্রথমে একটু বিব্রত বোধ করলেন। তারপর তাঁর দু'গালে দেখা দিলো টোল।

শাড়ীর আঁচল মাথায় তুলে দিয়ে একটু ঘাড় হেলিয়ে প্রশ্ন করলেন, "অমন করে কি দেখছেন মিঃ সরকার? যদি বাঙ্গালী মহিলা বলে নিজেকে চালাতে চাই, আপনার কাছে পাস-মার্ক পাবো?"

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বললাম, "চালাতে চাইলে নম্বরের কথা ভেবে দেখবো। কিন্তু চালাতে যাবেন কোন্ দুঃখে। আপনি তো হাণ্ড্রেড পারসেন্ট বাঙ্গালী মহিলা।"

তিনি যে ভারতীয়, সে-কথা তিনিই একদিন আমাকে বলেছিলেন। আজ আমার মুখে তাঁর বাঙ্গালীত্বের স্বীকৃতি পেতে কি যেন একটা হলো। মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সারাপথ আর একটি কথাও বললেন না।

ডাক্তার দাশগুপ্তর চেম্বার যেন চেনা যায় না। আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। চেম্বার তো নয়, যেন তাঁর বাড়ীর ড্রইংরুমে এসে ঢুকলাম আমরা। সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন সোনাবৌদি। অন্য একটিতে পাইপ-মুখে ডাক্তার দাশগুপ্ত একটি বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন। আমাদের সাড়া পেয়ে দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। একেবারে সোজা সোনাবৌদির সামনে গিয়ে আহত কণ্ঠে অভিযোগ জানালাম, "বলুন, কি অপরাধ করেছি আমি? ছ'মাস ক্লিনিকে রয়েছেন, এর মধ্যে

একদিনের জন্যেও দেখা দিলেন না! অথচ প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার এখানে এসেছি। আমার কি অন্যায় হয়েছে, বলুন।"

"তোমার কোনো অপরাধ আছে বলে তো জানি না। কিন্তু কি করবো বলো, ভাই। আমি তোমাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তারের বিনি-পয়সার বাঁদী—এ বণ্ড স্লেভ অন হিজ ম্যাজেস্টি'স সারভিস।" ডাক্তারের দিকে কুর্নিশ করে আবার শুরু করলেন, "একদিন হুকুম হলো, নার্সিং-এর লোক দরকার ক্লিনিকে, চলো সোনালী। এলাম। আসামাত্র পরবর্তী হুকুম, কারো সাথে দেখা করবে না, কথাও বলবে না, সোনালী। বিশেষ করে তোমার পেয়ারের ওই সোম ছোঁড়াটার সাথে। কুর্নিশ করে হিজ ম্যাজেস্টিকে জবাব দিলাম, জো হুকুম, জাঁহাপনা। আজ সকালে হুকুম হলো, আমার চেম্বারে আজ সন্ধ্যায় চায়ের আসর বসবে, ব্যবস্থা করো, সোনালী। বেচারী সোনালীকে ব্যবস্থা করতে হলো। বাড়ীর ড্রইংরুম তুলে এনে বসিয়ে দিলাম চেম্বারে। কিন্তু খুঁতখুঁতে ডাক্তারকে খুশী করা ভার!"

হাত-মুখ নেড়ে, কখনো কথা টেনে টেনে, কখনো ডাক্তার সাহেবের গলার আওয়াজ নকল করে, সোনাবৌদি তাঁর কথাগুলি শেষ করামাত্র হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার দাশগুপ্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে কানে এলো মহিলাকণ্ঠের মিষ্টি হাস্য ধ্বনি। ফিরে তাকাতে দেখি, মারগারেট হাসিতে ফেটে পড়েছেন! চোখাচোখি হতেই অপ্রস্তুত ভাবে থেমে গেলেন। মারগারেট হেসে উঠলেন কেন? সোনাবৌদি কথা বললেন বাংলায়, অথচ হেসে উঠলেন মারগারেট! আমি তো থ'। তখন ধরতে পারিনি এ-হাসির কারণ, কিন্তু পরে সবকিছু বুঝতে পেরেছিলাম। তখন বড়ো জোর মনে হয়েছিলো, সোনাবৌদির নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা বলাই তাঁর হাসির খোরাক যুগিয়েছে।

কথা শেষ করে সোনাবৌদি এবার এগিয়ে গিয়ে মারগারেটকে জড়িয়ে ধরে মুখচুম্বন করলেন। দুজনের মধ্যে নিয়মমাফিক পরিচয় করিয়ে দেয়ার সুযোগ হয় নি। এই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ, কিন্তু সে-কথা কে বলবে! দেখে মনে হয় যেন কতোদিনের পরিচয়। আমার

নিজের বেলায়ও তো এমনটাই হয়েছিলো। দাশগুপ্ত-দম্পতির অভিধানে অপরিচিত শব্দটির স্থান নেই। সামাজিকতার পর্দা উড়ে যায় আন্তরিকতার দখিনা বাতাসে। ইনট্রোডাকসনের ধার ধারেন না, এগিয়ে গিয়ে নিজেরাই আলাপ করেন। মুহূর্তের মধ্যে পরকে আপন করার আর দূরকে নিকট করার মন্ত্রে এঁদের দুজনেরই সিদ্ধি এমন সহজাত যে দেখলে অবাক হতে হয়। এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ। ফেরার পথে মারগারেট বলেছিলেন, 'মেড ফর ইচ আদার।' উনি যে মিথ্যা বলেন নি, আমি আদালতে দাঁড়িয়ে তা হলফ করে বলতে পারি। সোনাবৌদি বললেন, "আপনারা ততোক্ষণ গল্প করুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।"

ডাক্তার দাশগুপ্ত যোগ করেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ একটু বোহিয়া হয়ে যাক।'

সোনাবৌদির চলার পথে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মারগারেট বললেন. "ডাক্তার দাশগুপ্ত, আপনার বিরুদ্ধে আমার একটি সিরিয়াস অভিযোগ থেকে গেলো। আপনার এই মনমোহিনী স্ত্রীর সঙ্গে আগে মিলিত হবার সুযোগ করে দিলেন না কেন? হোয়েন শ্যাল আই গেট এ্যানাদার লাইক হার?"

পাইপে তামাক ভরা বন্ধ করে ডাক্তার বললেন, "বাধা ছিলো মিসেস গ্রান্ট, বাধা ছিলো। সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। ডেজমণ্ডের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে সোনালীকে একটি বিশিষ্ট অংশ নিতে হয়েছিলো। সে-সময় আপনাদের সঙ্গে তার পরিচয় হলে, ডেজমণ্ডের পক্ষে ক্ষতির আশঙ্কা ছিলো। সে রিস্ক আমিও নিতে পারি নি। বস্তুতঃ গত ছ'মাস সোনালীকে আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে দিই নি। এক্ষুনি তো ও সেই কাঁদুনিই গাইলো সোমের কাছে।"

কি যেন বলতে গিয়ে মারগারেট হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, ডেজমণ্ডের কাঁধে হাত রেখে সোনাবৌদি চেম্বারে ঢুকেছেন। ডেজমণ্ডের হাতে সেলোফেন কাগজে জড়ানো চমৎকার একটি গ্ল্যাডিওলাই আর রজনীগন্ধার বোকে। হাসিতে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত। মারগারেট প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎ ডেজমণ্ডকে দেখে

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় ছুটে গিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তাকে। যেন হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন। কিছুক্ষণ এভাবে ধরে থাকার পর, ডেজমণ্ডকে ছেড়ে দিয়ে সোনাবৌদির দিকে তাকালেন মারগারেট। হঠাৎ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ লুকোলেন। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেব আর আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। কানে এলো মারগারেটের অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠস্বর। কাঁদতে কাঁদতে সোনাবৌদিকে বলছেন, "ডেজমণ্ডকে আমি কেবল পেটেই ধরেছি। মরে যাচ্ছিলো আমার দোষে। আপনি তাকে বাঁচালেন, দিলেন নতুন প্রাণ। আপনি ডেজমণ্ডের নতুন মা।"

সোনাবৌদি কোনো উত্তর দিলেন না। হাসিমুখে তাঁকে জড়িয়ে থাকলেন। ডাক্তার দাশগুপ্তর সারা মুখে তৃপ্তির হাসি। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মারগারেট মৃদুস্বরে থেমে থেমে বললেন, "আই ওয়াজ ডেড এ্যাণ্ড দাউ গেভ মি নিউ লাইফ। আমেন।" শেষ করে ক্রুশের চিহ্ন করলেন।

এর পর চায়ের পর্ব যখন শেষ হলো, শীতের সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে উঠেছে গাঢ় অন্ধকার। চেম্বারের জোরালো বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। বিদায়-বেলা উপস্থিত। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তার দাশগুপ্ত ডেজমণ্ডের পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বেস্ট অব লাক, ডেজমণ্ড। একদিন তোমার গীটারটা নিয়ে এসো, শুনবো। আর যখনই সময় পাবে তোমার সোনা আন্টির কাছে চলে আসবে। কোনো দ্বিধা করবে না।"

তারপর দু'পা এগিয়ে মারগারেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। কিন্তু করমর্দন না-করে, উপস্থিত সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে, মারগারেট মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে দু'হাতে ডাক্তার দাশগুপ্তর দু'পা চেপে ধরলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই রইলেন। ঘটনার এই আকস্মিক মোড় নেওয়ায়, ডাক্তার সাহেব একটু বিপন্ন মুখ-নিয়ে, পাইপ-হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোনো কথা বলতে পারলেন না। হয়তো আমার দৃষ্টিভ্রম, কিন্তু মনে হলো তাঁর ডান

হাত যেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে একটু শূন্যে তোলা। কিছুক্ষণ বাদে উঠে দাঁড়ালেন মারগারেট। মুখ তুলে ডাক্তার দাশগুপ্তর উদ্দেশ্যে শান্ত-কণ্ঠে বললেন, "কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোটো করতে পারবো না। যখন যেখানেই থাকি, বেঁচে থাকতে আপনার কথা সব সময় মনে পড়বে। অন্তরের ভক্তি আর শ্রদ্ধা ছাড়া আপনাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই।"

চিত্রার্পিতের মতো সবকিছু দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এখনো আর কি দেখা বাকী আছে!

ডাক্তার দাশগুপ্তর কাছ থেকে সরে, সোনাবৌদির সামনে এসে দাঁড়ালেন মারগারেট। তারপর সোনাবৌদিকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। গত ছ'মাসের জমাট কান্না বাঁধ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। যার চোখের সামনে এমনটা ঘটে, সে কেবল মনে মনে বলতে পারে, "এ-জল তরঙ্গ রোধিবে কে?"

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে, শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মারগারেট। নিঃশব্দে আমার ডান হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। আমি আর একটা ছোটোখাটো মেলো-ড্রামার ভয়ে কাঠ হয়ে রইলাম। ডাক্তারের কথা আলাদা। তিনি মরা মানুষ ফিরিয়ে দিয়ে মারগারেটের মনে যীশুর আসনের অংশীদার হয়েছেন। কিন্তু আমি তো এ-খেলায় কোনো জাঁদরেল খেলোয়াড় নই, বড়োজোর একজন টেল এণ্ডার। যদি এ-দৌড়ে পাকে চক্রে যোগ দিয়ে থাকি, তবে আজ দৌড়ের শেষে কী হবে আমার পরিচিতি? অলসো রান-এর তালিকায় ঠাঁই পেলেই হবে আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি চাই একটি শান্ত-সুন্দর বিদায়, যেটা হবে আজকের এই বিশেষ দিনটির ফিনালে। তা হলেই আজকের এই বিদায় মুহূর্তটি অনির্বাণ শিখার মতো আমার মনের মণিকোঠায় চিরদিন জ্বলতে থাকবে।

মারগারেট যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। আশ্চর্য আত্মসংযমের সঙ্গে যে ভাবাবেগ উত্তাল হয়ে উঠতে চাইছিলো, তা

সামলে নিলেন। মুখে দেখা দিলো সেই হাসি, যা কেবল তিনিই হাসতে পারেন, আর যা তিনি রেখে যাবেন তাঁর ছেলের ঠোঁটে। গালের টোলটুকুও বাদ গেলো না। কিছুক্ষণ চুপচাপ আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। যেন ছোটো ছেলেকে আদর করছেন। তারপর যা হলো তাকে বলা যায় ক্লাইম্যাক্স। সকলকে চমকে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, "তুমি তো জানো, সোম, আমি কলকাতার মেয়ে। বাংলা আমার মাতৃভাষা। পাছে তুমি ভুল বোঝো, তাই এতোদিন বাংলায় কথা বলিনি। আজ বিদায় নেবার আগে, যদি একবার নিজের এই বুকটা চিরে তোমাকে দেখাতে পারতাম। এর পর ঈশ্বরের কাছে সদাসর্বদা কেবল এই প্রার্থনাই জানাবো: পরজন্মে যেন কোনো বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে হয়ে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারি। আর তোমাকে যেন আমার ছোটো-ভাই হিসেবে পাই।" তারপর দু'হাতের মধ্যে আমার মুখ চেপে ধরে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে-নাড়তে আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সোম, তুই আমাকে একবার দিদি বলে ডাক, ভাই।"

দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, কাঁধের উপর গাল-মাথা রেখে বলে উঠলাম, "মারগারেট দিদি।"

গল্প শেষ করে মিতালীকে বললাম, "এ কাপ অফ বোহিয়া বিফোর ইউ লিভ?"

কিন্তু মিতালীর দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না।